

করলেঙ্কো

# অন্ধ স্বরকার



চিরায়ত
রুশ
সাহিত্য



В. КОРОЛЕНКО

# СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ
НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ
МОСКВА



ভ্লাদিমির করলেঙ্কো

# অন্ধ সুরকার

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়

মস্কো

অনুবাদ : সমর সেন

প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ পরিকল্পনা : বাসভ

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়। আমাদের ঠিকানা:

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয় ২১ জুবোভস্কি বুলভার মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন।

## ষষ্ঠ সংস্করণে

## লেখকের ভূমিকা*

কয়েকটি সংস্করণে ইতিমধ্যে প্রকাশিত কাহিনীটির সংশোধন ও পরিবর্ধন সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম, সেটা আমি জানি; তার সংক্ষিপ্ত কৈফিয়ৎ দিতে আমি বাধ্য। আমার রচনাটির মূল মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের কেন্দ্র হল মানুষের সহজাত, দেহগত আলোক পিপাসা। নায়কের ক্রমবিকাশে আধ্যাত্মিক সঙ্কট আনে এই পিপাসা, এই পিপাসাতেই সে সঙ্কটের অবসান ঘটে শেষ পর্যন্ত। কাহিনীটির লিখিত এবং মৌখিক সমালোচনায় বার বার একটি আপত্তির সম্মুখীন হয়েছি, প্রথম দৃষ্টিতে আপত্তিটিকে যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। আমার সমালোচকদের বোধে, জন্মান্ধদের আলোক পিপাসার কথা বলা যায়

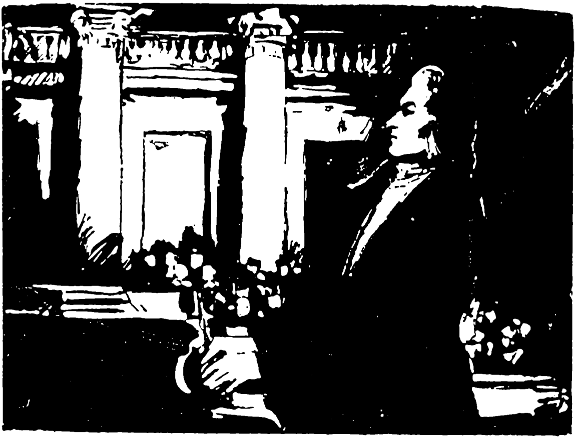
---

* ষষ্ঠ সংস্করণে অনেক পরিবর্ধন করা হয়েছে — লেখক।

না ; কারণ আলো তারা কখনো দেখেনি, সে বিষয়ে কিছু জানে না তারা, সুতরাং আলোর অভাব বোধ তাদের থাকতে পারে না। এ যুক্তি আমার কাছে বিশ্বাস্য ঠেকে না। পাখীর মত আমরা কেউ কখনো ত উড়িনি, তবু নভোবিচরণের অনুভূতি কী ভাবে বার বার আসে স্বপ্নে, সারা শৈশব আর যৌবন ভরে, সেটা আমরা সবাই জানি। তবু এ কথা স্বীকার করতে আমি বাধ্য যে মূল উপাদানটি আমি গ্রহণ করেছিলাম আনুমানিকভাবে, তার ভিত্তি হল প্রত্যক্ষ জ্ঞান নয়, বরঞ্চ কল্পনা। কাহিনীটির প্রথম কয়েকটি সংস্করণ বেরোবার পর কয়েক বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, পর্যটনে বেড়িয়েছি, সে সময়ে প্রত্যক্ষ পরিদর্শনের সুযোগ হঠাৎ মিলল। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ঘণ্টাবাদক দুটির (একজন জন্মান্ধ, অন্যজন শৈশব থেকে অন্ধ) কথা আছে; তাদের মনোভাবের বৈসাদৃশ্য; শিশুদের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য; স্বপ্ন বিষয়ে ইয়েগরের কথাবার্তা — তামবোভ যাজক-বিভাগের সারোভ মঠের ঘণ্টাঘরে সত্যি সত্যি আমি যা লক্ষ্য করেছিলাম সবকিছু আমার নোটবই-এ লিখে রাখি। আজো হয়ত সেখানে অন্ধ ঘণ্টাবাদক দুটি অভ্যাগতদের

ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উপরে নিয়ে যায়। ঘণ্টাঘরের সেই দৃশ্যটি বর্তমান বিতর্কের চূড়ান্ত মীমাংসা বলে আমি মনে করি, সেই দৃশ্যটি দেখার দিন থেকে কাহিনীটির প্রত্যেকটি নতুন সংস্করণ আমার বিবেক-দংশনকে বাড়ায়; একদা সমাপ্ত রচনায় ফিরে আসা কঠিন বলে শুধু এতদিন সে দৃশ্যটি কাহিনীতে সংযোগ করতে পারিনি। বর্তমান সংস্করণে নানা পরিবর্ধনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এই দৃশ্যটির সংযোজন। বাকিগুলোর বিষয়ে এই বলতে পারি যে একবার যখন কাহিনীতে ফিরে গেলাম, পূর্বতন চিন্তাধারায় আবার আমার মন গেল ফিরে, তখন শুধুমাত্র নতুন অংশটির যান্ত্রিক সংযোজনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। সারা গল্পে অন্যান্য পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল।

ফেব্রুয়ারী ২৫, ১৮৯৮



# প্রথম অধ্যায়

১

দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকার এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে গভীর রাত্রে নূতন শিশুর জন্ম হল। অল্পবয়স্কা মা নিদারুণ অবসাদে মগ্ন; কিন্তু শিশুর ক্ষীণ করুণ প্রথম কান্না কানে আসাতে বিছানায় অস্থিরভাবে সে ছটফট করতে লাগল। চোখ তার বোজা, কিন্তু ফিস্‌ফিস্‌ করায় ঠোঁট নড়ছে, আর বিবর্ণ মুখ, গড়ন যার এখনো শিশুসুলভ

কোমল, যেন যন্ত্রণায় আর অধৈর্য প্রতিবাদে বিকৃত হল, দুঃখের প্রথম অভিজ্ঞতায় অতি-আদরের বাচ্চার মুখ যেমন হয়।

ধাত্রী ঝুঁকে মুখের কাছে মুখ নিয়ে এল, ও ফিস্‌ফিস্‌ করে কী বলছে শোনার জন্য।

প্রায় শোনা যায় না এমন ভাবে প্রসূতি জিজ্ঞেস করল, 'কেন ওরকম করছে ও, কেন...'

ধাত্রী বুঝতে পারল না। আবার শোনা গেল শিশুর কান্না। মা'র মুখে এল তিক্ত যন্ত্রণার ভাব, চোখ দিয়ে বড়ো এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

'কেন, কেন?' আগের মত ক্ষীণকণ্ঠে সে ফিস্‌ফিস্‌ করল।

কী বলছে এবারে বুঝে ধাত্রী শান্তকণ্ঠে জবাব দিল, 'কেন কাঁদছে? প্রথমে সবাই ত কাঁদে। ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।'

কিন্তু সান্ত্বনা পেল না প্রসূতি। শিশুটি কাঁদলেই প্রতিবারে চমকে উঠছে, ক্রুদ্ধ অধৈর্যভাবে বারবার জিজ্ঞেস করছে, 'এরকমটা হয় কেন, এরকম সাংঘাতিক হয় কেন?'

শিশুর কান্নায় অসাধারণ কিছু ধাত্রী দেখতে পেল

না, বুঝতে পারল মেয়েটি প্রায় অচেতন, হয়ত নিজেই জানে না কী বলছে। বিছানা থেকে সরে এসে শিশুটিকে নিয়ে পড়ল।

প্রসূতি চুপ করে গেল। শুধু মাঝে মাঝে, ভাষায় ভঙ্গীতে প্রকাশ না পেয়ে কোন গভীর দুঃখ তার নিমীলিত চোখে বড়ো বড়ো অশ্রুবিন্দু আনছে, চোখের ভারী পাতা ভিজিয়ে শ্বেতপাথরের মত পাণ্ডুর কপোল বেয়ে আস্তে আস্তে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে।

মায়ের অন্তর কি অনুভব করেছিল নবজাতের সঙ্গে সূচনা হয়েছে কী মর্মান্তিক, ক্ষান্তিহীন বিয়োগান্ত নাটকের, যার ছায়া দোলনার উপরে উদ্যত, যা সারা জীবন, মৃত্যু না আসা পর্যন্ত, শিশুটিকে অনুসরণ করবে।

কিম্বা হয়ত সে বোধটা মায়ের বিকার মাত্র? যাই হোক, শিশুটি জন্মান্ধ হয়ে ভূমিষ্ঠ হল।

## ২

প্রথমে কেউ সেটা লক্ষ্য করেনি। নবজাত ছেলেটি পৃথিবীর দিকে চোখ মেলত আড়ষ্ট, অস্পষ্টভাবে, একটি বিশেষ বয়স পর্যন্ত শিশুরা যেমন করে তাকায় ঠিক সেই

ভাবে। দিনের পর দিন কাটল, তারপর নবজাতের ক'সপ্তাহ বয়স হল হিসেবের পালা এল। চোখের ঝাপসাভাব কাটল, আড়ষ্টতা গেল চলে, মনে হল মণিদুটি স্পষ্ট হয়েছে। খোলা জানলার কাছে দোদুল্যমান সবুজ বীচের মর্মরধ্বনি, ফলেফুলে ঘন দেশের বাগান থেকে আসত পাখীদের খুসীর কিচির মিচির, সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকত আলোর উজ্জ্বল তির্যক রেখা, কিন্তু শিশুটি আলোর দিকে মুখ ঘোরাত না। তার মা প্রকৃতিস্থ এখন, নতুন উৎকণ্ঠায় সেই প্রথমে শিশুর দিকে তাকাল, প্রথমে সেই লক্ষ্য করল তার মুখের বিচিত্র, বয়সোনুপযুক্ত গম্ভীর স্থবির ভাব।

'কেন ও এক দৃষ্টিতে ওরকমভাবে তাকিয়ে থাকে, বলো না!' আশেপাশের লোকেদের কাছে ভীরু কপোতীর মত সান্ত্বনা খুঁজে বারবার সে জিজ্ঞেস করত।

তার উৎকণ্ঠায় সাড়া না দিয়ে তারা বলত, 'কী বলতে চান আপনি? ওর বয়সে যেমনটি হয় ও ত ঠিক সেরকম।'

'কিন্তু দেখুন, কেমন যেন অদ্ভুতভাবে হাতড়ায়।'

ডাক্তার বুঝিয়ে বললেন: 'ওর বয়স এত কম যে

যা দেখে তার সঙ্গে মানিয়ে এখনো হাত পা নাড়াতে পারে না।'

'কিন্তু সব সময় সোজাসুজি সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে কেন? চোখ কখনো ফেরায় না কেন? ও কি, ও কি তাহলে অন্ধ?' মায়ের মুখে এই ভয়াবহ কথা একবার যখন উচ্চারিত হল তখন তাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা কেউ খুঁজে পেল না।

শিশুটিকে তুলে চট্ করে আলোর দিকে ঘুরিয়ে ডাক্তার তার চোখে তাকালেন। মনে হল তিনি অল্প বিচলিত হয়েছেন, এড়িয়ে যাওয়া গোছের দু একটি কিছু বলে, দু এক দিনের মধ্যে আবার আসবেন কথা দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

আহত পাখীর মত থরথর করে কেঁপে উঠে মা ফোঁপাতে ফোঁপাতে শিশুটিকে বুকে চেপে ধরল। কিন্তু শিশুর চোখে এল না কোন পরিবর্তন, আগেকার মতই গম্ভীর জড়ভাবে রইল তাকিয়ে।

কথামত দু একদিন পরে ডাক্তার এলেন, এবারে সঙ্গে চোখ পরীক্ষার যন্ত্র। মোমবাতি জ্বালিয়ে শিশুটির চোখের সামনে ধরলেন, একবার সরিয়ে নিয়ে আবার

সামনে ধরলেন সেটা। অনেকবার পরীক্ষা চলল, ডাক্তারের দৃষ্টি শিশুটির চোখের মণির উপরে বরাবর নিবদ্ধ। অবশেষে দারুণ বিচলিত হয়ে তিনি বললেন:

'অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলছি, আপনি যা বলেছিলেন তাই ঠিক। শিশুটি অন্ধ। দৃষ্টিলাভের কোন আশা নেই।'

শান্ত বিষণ্নভাবে শিশুর মা ডাক্তারের রায় শুনল।

'আমি আগেই জানতাম', বলল অনুচ্চকণ্ঠে।

## ৩

যে পরিবারে অন্ধ শিশুটির জন্ম সেটি বড়ো নয়। যাদের নাম আগে উল্লেখ করা হয়েছে তা ছাড়া ছিলেন বাপ আর 'মাক্সিমমামা'। বাড়ীর সবাই, এমন কি বাইরের অনেকে তাঁকে এই নামে ডাকত। ছেলেটির বাপ জমিদার, দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকায় হাজারো জমিদারের মত। স্বভাব তাঁর ভালো, তাঁকে এমন কি সহৃদয় বলা যায়; শ্রমিকদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতেন; কলকারখানার উপরে ছিল বিশেষ ঝোঁক, একটা না একটা কিছুর নির্মাণ কিম্বা পুনর্নির্মাণ ক্রমাগত চলত। এতে এত সময় যেত যে প্রাতরাশ, নৈশভোজন এবং ওই ধরনের ঘরোয়া কোন

উপলক্ষ্য ছাড়া অন্য সময় বাড়ীতে তাঁর গলা কদাচিৎ শোনা যেত। বাড়ীতে এসেই যথারীতি বলতেন, 'কেমন আছো, ওগো'—তারপর বসে যেতেন খেতে, খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কথা প্রায় বেরুত না, যদি বা বলতেন সেটা কোন ওকের পাল্লা কিম্বা চাকার দাঁতের মাহাত্ম্য ঘোষণা। সহজ শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা, অবশ্য সেটা এমন নয় যে ছেলের চরিত্র ও মানসবৃত্তির গঠন বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করতে পারে। কিন্তু মাক্সিমমামা—তিনি ছিলেন আলাদা ধরনের মানুষ। যে সব ঘটনার কথা বলা হচ্ছে তার প্রায় দশ বছর আগে, শুধু নিজের জমিদারীর আশেপাশে নয়, এমন কি কিয়েভ মেলা পর্যন্ত তাঁর মত সাংঘাতিক ঝগড়ুটে লোক আর নেই বলে সবাই জানত। কী করে কুলীন পরিবারের শ্রীমতী পপেল্স্কায়ার তাঁর মত সাংঘাতিক ভাই হল অবাক হয়ে সবাই ভাবত। কী ভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বলা উচিত, কীসে তিনি খুসী হন, কারো জানা ছিল না। ভদ্রজনের শিষ্টাচারের জবাব তিনি দিতেন উদ্ধত অবজ্ঞায়, কিন্তু চাষীদের এমন সব অসভ্য আচরণ সহ্য করে যেতেন যা অন্য কোন ভদ্রলোক, যতই নিরীহ হন না কেন, সহ্য করতে কখনোই

পারতেন না, মারমুখো হতেন। যাই হোক, অবশেষে ভদ্রজনেরা সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যখন কী যেন একটা ব্যাপারে অস্ট্রিয়ানদের উপরে দারুণ চটে গিয়ে তিনি ইতালীতে চলে গেলেন; আর সেখানে ঠিক নিজের মত কলহপ্রিয়, নাস্তিক একজনের সঙ্গে জুটে গেলেন, নাম তার গারিবাল্‌দি; জমিদাররা আতঙ্কে কানাঘুষো করত যে গারিবাল্‌দি নাকি শয়তানের সঙ্গে শপথ করে মিতালি পাতিয়েছে, এমন কি পোপকেও পরোয়া করে না সে। মাক্সিমের অবাধ্য অবিশ্বাসী আত্মার সদ্‌গতি কোন কালে হবে না অবশ্য, কিন্তু অন্য দিকে তাঁর অবর্তমানে কিয়েভ মেলা স্পষ্টতই অনেকটা শান্ত হয়ে গেল, আশেপাশের অনেক ভদ্রমহিলার মনে এল স্বস্তি, অন্তত নিজেদের ছেলেদের নিরাপত্তা নিয়ে তাদের বিরামহীন উৎকণ্ঠার উপশম হল।

বোঝা গেল অস্ট্রিয়ানরাও মাক্সিমমামার উপরে দারুণ চটেছে। এই সব এলাকায় পোলীয় জমিদারদের বংশপরম্পরায় প্রিয় খবরের কাগজ ‘কুরিয়ার’-এ যুদ্ধের বিবরণে প্রায়ই তাঁর নাম থাকত; তিনি নাকি গারিবাল্‌দির সবচেয়ে বেপরোয়া সহ-যোদ্ধার একজন। এবং এই ‘কুরিয়ার’ই

একদিন পাঠকদের জানাল যে যুদ্ধক্ষেত্রে মাক্সিম আর তার ঘোড়া হয় পপাত ধরণীতলে, আর তখন ক্রুদ্ধ অস্ট্রিয়ানরা অনেক দিন পরে নচ্ছার ভাল্‌হিনিয়ান্‌টিকে হাতে পাবার সুযোগ পেয়ে তাকে টুকরো টুকরো করে কিমা বানিয়ে ফেলেছে (অন্যান্য ভাল্‌হিনিয়ানদের কল্পনায় মাক্সিমমামাই মোটের উপর একমাত্র খুঁটি যার উপরে ভর করে গারিবাল্‌দি তখন পর্যন্ত টিঁকে ছিল)।

'মাক্সিম বেঘোরে মরল', ভদ্রজনেরা ভাবল। তাদের মতে, সেণ্ট পিটার তাঁর উত্তরাধিকারী, পৃথিবীতে খৃষ্টের প্রতিনিধি পোপের জন্য বিশেষ মধ্যস্থতা করাতেই মাক্সিমের পতন ঘটেছে। তারা ধরে নিল মাক্সিম মৃত।

যা হোক, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে অস্ট্রিয়ানদের তলোয়ার মাক্সিমকে অনেকটা জখম করলেও দেহ থেকে তার অজেয় আত্মাকে ভাগাতে পারেনি। গারিবাল্‌দির ঝগড়ুটে চেলারা তাদের মাননীয় বন্ধুকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যায়; আর কয়েক বছর পরে তিনি হঠাৎ বোনের বাড়ীতে উদয় হয়ে সেখানেই থেকে গেলেন।

ডুয়েল লড়ার মতো অবস্থা আর তাঁর নেই। ডান পা'টি গিয়েছে, ক্রাচ ছাড়া হাঁটতে পারেন না, আর

বাঁ হাত এত জখম যে তাতে কোনক্রমে একটা ছড়ি ধরতে পারেন, আর কিছু নয়। অনেকটা ধীর স্থিরও হয়ে গেছেন তিনি, শুধু মাঝে মাঝে ধারালো বাক্যবান চালাতেন, নির্ভুল তাঁর লক্ষ্য, আগে যেমন তাঁর তলোয়ার কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হত না। কিয়েভের মেলায় যেতেন না তিনি, সমাজে তাঁর দেখা পাওয়া যেত কদাচিৎ। অধিকাংশ সময় কাটত নিজের লাইব্রেরীতে, এমন সব বই-এর অধ্যয়নে যাদের নাম কস্মিনকালে কেউ শোনেনি, লোকেরা মোটামুটি অনুমান করে নিত যে বইগুলো নিশ্চয়ই নাস্তিকতায় ভরা। কিছু লিখতেনও মাক্সিমমামা, কিন্তু যেহেতু তাঁর কোন লেখা 'কুরিয়ার'এ ছাপা হত না সেহেতু তাঁর সাহিত্যিক কার্যকলাপে লোকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপণ করেনি।

যে সময় দেশের ছোট বাড়ীতে শিশুটি ভূমিষ্ঠ হল সে সময় মাক্সিমমামার ছোট করে ছাঁটা চুলে পাক ধরতে শুরু করেছে, হাঁটবার ক্রাচের চাপে কাঁধ এত কুঁজো যে দেহটিকে দেখায় প্রায় চৌকো। অচেনারা তাঁকে দেখে প্রায়ই ভয় পেত—তাঁর অদ্ভুত চেহারা, ভ্রূকুটিকুটিল মুখ, ক্রাচের খটখট শব্দ আর নিত্যসঙ্গী পাইপের ঘন

ধোঁয়ার মেঘ, সব মিলিয়ে ভীতিকর। শুধু ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাই জানত যে তাঁর অকেজো পঙ্গু দেহের ভিতরে আছে উষ্ণ কোমল একটি হৃদয়, এবং ছোট করে ছাঁটা ঘন শক্ত চুলে ভরা বড়ো তাঁর চৌকো মাথায় কী অক্লান্ত মানসিক পরিশ্রম চলেছে।

জীবনের এই পর্যায়ে কী চিন্তায় তিনি বিভোর সেটা কিন্তু তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও জানত না। তারা শুধু দেখত যে মাঝে মাঝে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি বসে থাকেন, তাঁকে ঘিরে তামাকের নীলচে ধোঁয়া, চোখদুটি চিন্তায় ঝাপ্‌সা, পুরু ভুরু বিরসভাবে কোঁচকানো। বিকলাঙ্গ সৈনিক যা ভাবতেন তা হল এই, জীবনের মানে সংগ্রাম, সেখানে পঙ্গুদের স্থান নেই। লড়াই থেকে চিরজীবনের জন্য বেরিয়ে এসেছেন তিনি, মালগাড়ীর বোঝা মাত্র এখন তিনি, আর কিছু নয়। তিনি যেন কোন নাইট্‌ দৈব যাঁকে ঘোড়া থেকে মাটিতে ফেলে দিয়েছে। পদদলিত কীটের মত ধূলোয় গড়াগড়ি দিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা কাপুরুষোচিত নয় কি? কাপুরুষোচিত নয় কি বিজয়ীর ঘোড়ার রেকাব আঁকড়ে জীবনের খুদকুঁড়ো ভিক্ষে করা?

মাক্সিমমামা যখন এইসব মর্মান্তিক চিন্তায় ব্যস্ত, স্বপক্ষে ও বিপক্ষে নানা যুক্তি কঠিন অবিচলিত সাহসে বিচার করছেন, তখন তাঁর নজরে পড়তে শুরু করল নতুন একটি প্রাণী, জন্মমুহূর্ত থেকে যে পঙ্গু। প্রথমে অন্ধ শিশুটিকে তিনি প্রায় দেখতেনই না। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই শিশুটির এবং তাঁর নিজের ভাগ্যের অদ্ভুত সাদৃশ্যের কথা দার্শনিকের মত আগ্রহে তিনি ভাবতে শুরু করলেন।

শিশুটির দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে একদিন চিন্তান্বিতভাবে তিনি বললেন, 'আর একটি পঙ্গু তাহলে এখানে আছে দেখছি। আমাদের দুজনকে জোড়া করলে হয়ত সত্যি-কারের কোন মানুষের সৃষ্টি হতে পারে।'

আর সেদিন থেকে প্রায়ই তিনি শিশুটিকে লক্ষ্য করতেন।

৪

ছেলেটি জন্মান্ধ। তার দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী কে? কেউ না। কারো কোন কুঅভিসন্ধি ছিল না, জীবনের রহস্যময় জটিল প্রক্রিয়ার গভীরে কোনখানে তার দুর্ভাগ্যের কারণ চাপা পড়ে আছে। তবু অন্ধ ছেলেটির দিকে

তাকালেই তার মা'র হৃদয় নিদারুণ ব্যথায় সিঁটিয়ে যেত। ছেলেটির অক্ষমতা, তার ভবিষ্যৎ নানা দুঃখের দুর্ভাবনায় অন্য যে কোন মায়ের মত সে কষ্ট পেত নিশ্চয়ই, কিন্তু এ ছাড়া তার অন্তরের গভীরে ছিল যন্ত্রণাদায়ক এই উপলব্ধি যে সন্তানের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী বাপ মায়ের কোন অন্তর্নিহিত অশুভ সম্ভাবনা। এই উপলব্ধির জন্যই সুন্দর কিন্তু অন্ধ এই ক্ষুদ্র প্রাণীটি পরিবারে প্রথম স্থান অধিকার করে, কোন আবদার করলেই সমস্ত বাড়ী সেটা মেনে চলত, অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে ছিল স্বেচ্ছাচারী রাজার মত।

নিজের দুর্ভাগ্যের দরুণ অসংযত তিক্ত ভাবপ্রবণতার আর পরিবেশের প্রভাবে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠবার সম্ভাবনা গোড়া থেকে ছেলেটির ছিল, শেষ পর্যন্ত সে কী হয়ে উঠত বলা কঠিন, যদি দৈবের বিচিত্র গতিতে, আর অস্ট্রিয়ানদের তলোয়ারের ঘায়ে বাধ্য হয়ে মাক্সিমমামা দেশে ফিরে এসে বোনের বাড়ীতে না থাকতেন।

বাড়ীতে অন্ধ ছেলেটির উপস্থিতি ক্রমশ, প্রায় তাঁর অজ্ঞাতসারেই, পঙ্গু সৈনিকটির চিন্তাধারা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিল। এখনো ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাইপ মুখে বসে

থাকেন তিনি, কিন্তু তাঁর দৃষ্টির বিরস সীমাহীন যন্ত্রণার জায়গায় এসেছে চিন্তাগভীর, কৌতূহলী পর্যবেক্ষণের ভাব। আর যতই তিনি দেখেন ততই জোরে পাইপ টানেন, আর বিরক্তিতে মোটা ভুরু কুঁচকিয়ে যায় বার-বার। অবশেষে একদিন কিছু একটা বলার সিদ্ধান্ত তিনি করলেন।

একটার পর একটা ধোঁয়ার চাকা মুখ দিয়ে বার করতে করতে তিনি বললেন, 'এই বাচ্চাটা আমার চেয়েও অনেক বেশী অসুখী হবে। না জন্মালেই ওর ভালো হত।'

তরুণী মা মাথা নিচু করল, সেলাই-এর কাপড়ে পড়ল এক ফোঁটা চোখের জল। অস্ফুট কণ্ঠে বলল:

'ওটা নিষ্ঠুরের মত আমাকে কেন মনে করিয়ে দিচ্ছ, মাক্স। আরো নিষ্ঠুর মনে হয় যখন জানি কিছুই করবার নেই আমাদের।'

'যা সত্যি তাই বলছি', মাক্সিম বললেন। 'আমার একটা হাত আর একটা পা নেই, কিন্তু চোখে দেখতে পাই। বাচ্চাটার ত দৃষ্টি নেই, আর কালে হাত পা থাকবে না ওর, ইচ্ছাশক্তিও কিছু থাকবে না!'

'কেন এটা বলছ?'

আরো কোমলভাবে তিনি বললেন, 'ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা কর, আন্না। বিনা কারণে আমি এত কর্কশভাবে কথা বলি না। বাচ্চাটার বোধশক্তি প্রখর। এখনো ওর অন্যান্য শক্তি এমন ভাবে বাড়ানোর সম্ভাবনা আছে যাতে করে অন্তত ওর দৃষ্টিহীনতার ক্ষতিপূরণ কিছুটা হতে পারে। কিন্তু তার জন্য চাই প্রয়োগ, নিয়মমত অভ্যাস। আর অভ্যাস আসে আবশ্যিকতা থেকে, শুধু আবশ্যিকতা থেকে। কিন্তু তোমাদের এই বোকার মত আদরযত্ন, সবসময় ওকে আগলে রাখা যাতে কোন প্রয়াসের আবশ্যিকতাই ও না বোঝে, এটা বাড়বার সম্ভাবনা একেবারে নষ্ট করে দেয়।'

আন্না বুদ্ধিহীনা নয়। শিশুটি একটু চেঁচালেই পাগলের মত তার কাছে ছোটার স্বাভাবিক আবেগ দমন করার শক্তি সে আয়ত্তে আনল। ভাই-এর সঙ্গে কথাবার্তার পরে কয়েক মাসের মধ্যেই ছেলেটি সহজভাবে, তাড়াতাড়ি হামাগুড়ি দিতে শিখল, শিখল কোন আওয়াজ হলেই মন দিয়ে শোনা, হাতের মুঠোয় কোন জিনিস এলেই আঙুলের চাপে সেটাকে ব্যগ্রভাবে ধরা। সেরকম ব্যগ্রভাব অন্য শিশুতে বিরল।

# ৫

তার মা'র চলাফেরা, জামাকাপড়ের খস্‌খস্‌ শব্দ, আর অন্যদের নজরে পড়ে না এমন অনেক ইসারা থেকে মাকে চিনতে সে খুব তাড়াতাড়ি শিখল। ঘরে যতই লোক থাকুক, আর যেভাবেই তারা চলাফেরা করুক না কেন, কোন ভুল না করে সে সোজা যেত মায়ের কাছে। হঠাৎ আন্না তাকে কোলে নিলে, যতই অপ্রত্যাশিতভাবে হোক না কেন, বুঝতে পারত সে তার মা। বাড়ীর অন্য কেউ নিলে তাড়াতাড়ি তার মুখে আঙুল বুলিয়ে সত্বর চিনতে পারত লোকটি কে—তার দাই না মাক্সিমমামা না তার বাবা। অচেনা কেউ নিলে তার ছোট ছোট আঙুলের গতি হত মন্থর। আস্তে আস্তে, খুঁটিয়ে অচেনা মুখটিতে সে হাত বুলত, নিজের মুখে আসত একাগ্র অনুধারনের ভাব, যেন আঙুলের ডগা তার হয়ে 'দেখছে'।

সজীব সক্রিয় স্বভাব তার। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মেজাজে অন্ধত্বের প্রভাব ক্রমশ দেখা দিতে লাগল, আস্তে আস্তে তার চলাফেরায় আবেগপ্রবণতা কমে এল। নিরিবিলিতে লুকিয়ে থাকার অভ্যাস হল, ঘণ্টার পর ঘণ্টা একলা বসে থাকত, নড়াচড়া প্রায়

না করেই, মুখে একাগ্র প্রয়াসের ভাব, যেন কিছু একটা শোনার অপেক্ষায় আছে। ঘরে সাড়াশব্দ না থাকলে, কথাবার্তা আর চলাফেরার শব্দে যখন মন দিতে হত না; তখন যেন চিন্তায় মগ্ন হয়ে যেত, বিহ্বল বিস্ময়ের একটা ভাব ছায়া ফেলত তার সুন্দর বয়সোনুপযুক্ত গম্ভীর মুখে।

মাক্সিমমামা সত্যি কথাই বলেছিলেন। ছেলেটির সংবেদনশীল সক্রিয় স্বভাব সাহায্য করল তাকে। স্পর্শ ও শ্রবণশক্তির সূক্ষ্ম গ্রহণক্ষমতায় পূর্ণ অনুভবশক্তির যতটা ফিরিয়ে আনা যায় ততটা আনার চেষ্টা যেন সে করত। তার স্পর্শশক্তি বিস্ময়কর। মাঝে মাঝে এমন কি মনে হত যে বর্ণবোধ তার কিছুটা আছে, কেননা রঙচঙে জিনিস সন্ধানী আঙুলে এলে ধরে রাখত, সেটা নড়াচড়া করার সময় মুখে আসত অস্বাভাবিক একাগ্রতা। দিনে দিনে ক্রমশ যেটা স্পষ্ট হয়ে উঠল সেটা হল তার শ্রবণশক্তির প্রখর বৃদ্ধি।

বিশেষ বিশেষ শব্দ থেকে প্রত্যেকটি ঘর সে চিনতে শিখল; চলনভঙ্গি থেকে বুঝল বাড়ীর লোকেরা কে যাচ্ছে; পঙ্গু মামার চেয়ারের ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ,

মা সেলাই করার সময় সূতোর খস্‌খসে একটানা শব্দ, ঘড়ির একঘেয়ে টিক্‌ টিক্‌, সব চিনল। মাঝে মাঝে মেঝেতে হামাগুড়ি দিতে দিতে থেমে গিয়ে শুনত অন্যদের ইন্দ্রিয় অগোচর কোন শব্দ, দেয়ালের কাগজ বেয়ে উঠছে একটা মাছি, হাত বাড়িয়ে দিত তার দিকে। মাছিটা উড়ে গেলে সেটা কোথায় গেল বুঝতে না পেরে প্রথম প্রথম অন্ধ ছেলেটির মুখে আসত ব্যথিত বিহ্বল ভাব। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য সেটা আর তাকে হতবুদ্ধি করত না, যে দিকে মাছিটা গিয়েছে সেই দিকে শুধু মুখ ঘোরাত—ওর শ্রবণশক্তি এত প্রখর তখন যে মাছিটার পাখার আওয়াজ পর্যন্ত চিনতে পারত।

গতি, শব্দ আর বর্ণমুখর বাইরের পৃথিবী তার কাছে প্রধানত আসত শব্দের মাধ্যমে, আশেপাশের জিনিস সম্বন্ধে তার সব ধারণার মূলে ছিল শব্দ। মাঝে মাঝে তার মুখে দেখা যেত শোনবার বিশেষ একটি ঢং, চিবুক একটু এগিয়ে দিয়ে পাতলা গলা দিত বাড়িয়ে। ভুরুদুটি বিশেষভাবে চঞ্চল হলেও সুন্দর চোখ জোড়া নড়ত না, আর সেই জন্য তার চেহারায় একই সঙ্গে ছিল ছেলেমানুষী কঠোরতা আর করুণ রসের ভাব।

৬

শিশুটি ভূমিষ্ঠ হবার পরের তৃতীয় শীত ঋতু শেষ হতে চলেছে। বাড়ীর বাইরে বরফ গলছে, বসন্তের স্রোতস্বিনীগুলো ইতিমধ্যেই মুখর। সমস্ত শীতকাল ছেলেটির শরীর ভালো ছিল না, বাড়ীর ভিতরেই থাকতে হয়েছিল তাকে, বাইরের খোলা হাওয়া একেবারে পায়নি। কিন্তু এখন শরীর সারতে শুরু করল।

ভিতর দিকের জানলার পাটগুলো খুলে দিতেই বসন্তের সব আনন্দ দ্বিগুণ উৎসাহে বাড়ীতে ফেটে পড়ল। উজ্জ্বল আলোয় ঘরগুলো গেল ভরে। এখনো পত্রহীন বীচেরা ঠিক জানলার ওপারে দুলছে। আর দূরে বিস্তারিত কালো রিক্ত মাঠ, এদিকে ওদিকে চাপচাপ বরফ গলছে, শুভ্র স্তূপের দাগ। অনেক জায়গায় ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে হালকা কোমল সবুজ ঘাস। এমন কি হাওয়া পর্যন্ত কোমলতর, সহজে নিশ্বাস নেওয়া যায়। সমস্ত বাড়ীতে পুনরুজ্জীবনের একটা বোধ, বসন্তকালীন প্রাণশক্তির প্রফুল্ল উদ্দাম ভাব।

ঘর ভরানো নানা দ্রুত শব্দের আকারে বসন্ত এল অন্ধ বালকটির কাছে। তার কানে আসছে বসন্তের নানা

স্রোতের খরগতি, একটি অন্যটির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটেছে, পাথরে লাফিয়ে পড়ছে, ভিজে নরম মাটি কেটে পথ করে নিচ্ছে। জানলার পাশে বীচেরা ফিস্‌ফিস করছে শুনতে পায়। তাদের ডালপালা প্রায়ই জড়িয়ে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে একটা ডাল জানলায় লাগাতে ঝনঝন আওয়াজ। ছাত থেকে গড়ানো জলবিন্দু ভোরে জমে গিয়ে সূর্যের তাপে গলছে, অসংখ্য ফোঁটায় পড়ছে, তার ক্ষিপ্র অবিরাম টুপ্‌টাপ শব্দ ছেলেটির কানে আসছে। বাড়ীতে আসছে তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট সব শব্দ, যেন গোল গোল ক্ষিপ্র পাথরের নুড়ি কানে লাগছে। আশেপাশের সব ধ্বনির মধ্যে মাঝে মাঝে বলাকার ডাক, মহাশূন্য থেকে পৃথিবীতে নেমে সে ডাক আবার আস্তে আস্তে নিঃশব্দতায় যাচ্ছে মিলিয়ে, যেন পরিষ্কার হাওয়ায় গলে যাচ্ছে।

প্রকৃতির বসন্তকালীন সজীব এই সব দিন শিশুটির মুখে আনত হতবুদ্ধি যাতনার ভাব। ঝুঁকে পড়ে যন্ত্রণায় ভুরু কুঁচকিয়ে কান পেতে রইত, তারপর যেন নানা শব্দের গোলমালে ভয় পেয়ে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে মায়ের দিকে সরে গিয়ে তার বুকের সঙ্গে মিশে যেত।

'কেন ও কষ্ট পাচ্ছে?' ভাবত মা, আশেপাশের সবাইকে জিজ্ঞেস করত।

শিশুটির এই অদ্ভুত আতঙ্কের কারণ কী জানবার চেষ্টায় মাক্সিমমামা অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, কিন্তু কিছুই পেলেন না।

শিশুটির হতবুদ্ধি আর ক্লিষ্ট জিজ্ঞাসার ভাব দেখতে দেখতে তার মা আঁচ করে বলল, 'বুঝতে পারছে না ও...'

সত্যিই শিশুটি ভীত, অস্বস্তি বোধ করছে, নতুন শব্দগুলো কী ভাবছে কখনো, কখনো বা ভাবছে কেন তার অভ্যস্ত পুরোনো শব্দগুলো হঠাৎ থেমে গেল, অদৃশ্য হল কোথায় আঁচ করতে পারছে না।

৭

বসন্তের প্রথম সংপ্লব থেমে গিয়েছে। এক একটি দিন কাটছে আর শূন্য থেকে ঝরা সূর্যের প্রখর তাপ প্রকৃতির নানা ক্রিয়াকে ক্রমশ আনছে তাদের স্বাভাবিক ছন্দে। জীবনে টান-টান ভাব এসেছে যেন। তার অগ্রগতি দ্রুত হল, থ্রটল খোলা যন্ত্রের বেগ সঞ্চয় করার মত। মাঠঘাট সবুজ, বার্চের কুঁড়ির গন্ধ হাওয়ায়।

ঠিক করা হল ছেলেটিকে মাঠ পেরিয়ে কাছেই নদীতীরে নিয়ে যাওয়া হবে।

মা ছেলের হাত ধরল, আর মাক্সিমমামা লাঠিতে ভর দিয়ে সঙ্গে চললেন। নদীর ধারে ঘাসে-ভরা একটি টিলার দিকে একসঙ্গে তারা গেল, রোদে আর হাওয়ায় সেখানকার মাটি খটখটে। টিলার উপর থেকে আশেপাশের সব জায়গা ভালোভাবে দেখা যায়।

দিনটি এত দীপ্ত যে বাইরে গিয়ে মাক্সিমমামা ও ছেলেটির মা চোখ কোঁচকাতে বাধ্য হল। রোদে মুখ গরম লাগছে, কিন্তু বসন্তের অদৃশ্য ফুরফুরে হাওয়া মুখ জুড়িয়ে আনছে তাজা ঠাণ্ডা ভাব। বাতাসে কিছু মাদকতা, তাতে কেমন যেন ঘুমে-ভরা কোমল অবসাদ আসে।

হঠাৎ মা হাতে অনুভব করল ক্ষুদে হাতের চাপ। কিন্তু বসন্তের মাতাল হাওয়ায় ছেলের অস্বস্তির লক্ষণানুভূতি আগের তুলনায় তার ক্ষীণতর, এগিয়ে চলল সে, মুখ বাড়িয়ে বসন্তের হাওয়া ব্যগ্র গভীর নিঃশ্বাসে নিয়ে। মুহূর্তের জন্য ছেলের দিকে তাকালে তার বিচিত্র ভাব নিশ্চয়ই নজরে পড়ত। ওর খোলা চোখ সোজাসুজি সূর্যের দিকে নিবদ্ধ, মূক বিস্ময়ে ঠোঁট ফাঁক হয়ে গিয়েছে।

হাঁপিয়ে ছোট ছোট দ্রুত নিঃশ্বাস নিচ্ছে সে, যেন কোন মাছকে এক ঝটকায় জল থেকে তোলা হয়েছে। মাঝে মাঝে তার মুখের অসহায় বিভ্রান্তি ভেঙ্গে আসছে ক্লিষ্ট উল্লাসের ভাব, স্নায়ুর আক্ষেপে চকিতে ভেসে গিয়ে মুহূর্তের জন্য তার মুখ দীপ্ত করে তুলছে, পর মুহূর্তেই আবার ফিরে আসছে সেই মূক বিস্ময় আর ভীত উদভ্রান্ত জিজ্ঞাসার ভাব। চোখজোড়া কিন্তু স্থির, ভাবলেশহীন, তাতে ধরা পড়ছে না কিছু।

টিলায় উঠে তারা ঘাসের উপরে বসল। ছেলেটিকে মা তুলে নিল যাতে স্বচ্ছন্দে ও বসতে পারে, আবার মায়ের পোশাক-পরিচ্ছদ সে আঁকড়ে ধরল, যেন ভয় পেয়েছে পড়ে যাবে, যেন পায়ের নিচে শক্ত মাটির বোধ তার নেই। কিন্তু এবারেও বসন্তের সৌন্দর্যে বিভোর মা তার অস্বস্তি লক্ষ্য করল না।

দুপুর তখন, নীল শূন্যে সূর্য প্রায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। নিচে বসন্তের প্রবাহে উচ্ছল নদী, চওড়া, গভীর। শীতের আস্তরণ ভেঙ্গে বেরিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে সেটাকে, কিন্তু এখনো এদিকে ওদিকে বরফের চাঁইয়ের শেষ টুকরো, ঝকঝকে নদীর বুকে শাদা শাদা ছোপ।

ঘাসে-ভরা মাঠ জলে ভেসে গিয়ে বড়ো বড়ো হ্রদের মত দেখাচ্ছে, তাদের শান্ত গভীরে প্রতিবিম্বিত টুকরো টুকরো শাদা মেঘ, নীল আকাশের ছায়া উল্টোভাবে পড়েছে সেখানে, এদিকে ওদিকে ভেসে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, নদীর উপরে বরফের চাঁইগুলোর মত। মাঝে মাঝে হাওয়ায় নদীর জল ছোট ছোট ঢেউ তুলে রোদে চিক্‌চিক্‌ করছে। নদীর ওপারে পড়ে আছে মাঠঘাট, কালো রিক্ত আর ভিজে, সেখানে ভাপ উঠছে, কম্পমান আবছা ভাপের পর্দা ভেদ করে দেখা যায়. দূরে খড়ের চালের কুঁড়েঘরের আভাস, আর আরো দূরে, বনের প্রান্তের অস্পষ্ট নীল রেখা। মনে হয় পৃথিবী নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে বিলম্বিত দীর্ঘশ্বাসে, আকাশের উদ্দেশ্যে পাঠাচ্ছে ভাপ, যেন আরতির ধূপ।

সমস্ত পৃথিবী বিরাট মন্দির যেন, প্রার্থনার জন্য প্রস্তুত আর সজ্জিত। কিন্তু অন্ধ শিশুটির কাছে শুধু অন্ধকার, বিরাট অসীম; তার চারিদিকে সেই অন্ধকারে এখন অস্বাভাবিক উত্তেজনা, সে অন্ধকার নড়ছে, হয়েছে মুখর, গুরুগুরু শব্দ করছে, কাছে আসছে, সব দিক থেকে তাকে তাগাদা দিচ্ছে নতুন অভূতপূর্ব নানা অনুভূতি,

এত ভিড় করে আসছে যে ওর ছোট্ট বুক ব্যথায় টিপ্‌টিপ্‌ করছে।

বাড়ীর বাইরে প্রথম পা ফেলেই উষ্ণ দিনের ঝাঁজ সটান মুখে লাগতেই স্বতই সে অন্ধ চোখ সূর্যের দিকে ফিরিয়েছিল, যেন বুঝতে পেরেছিল ওখানেই পৃথিবীর মর্মস্থান, ওটিকে কেন্দ্র করেই চারিদিকের সবকিছু ঘোরে। পরিষ্কার প্রসার, উপরে নীল শূন্যের চাঁদোয়া, দিগচক্রবাল, এ সবকিছুই জানল না সে, শুধু বুঝল যে স্পর্শগ্রাহ্য কিছু, কোমল সোহাগী কিছু একটা তার মুখে লাগছে আর উত্তাপ দিচ্ছে। আর তারপর হালকা ঠাণ্ডা একটা কী, সূর্যের উত্তাপের চেয়ে হালকা সেটা, নরম উষ্ণ ভাবটা সরিয়ে দিল, তাজা ঠাণ্ডা নিশ্বাস তার মুখেচোখে লাগল। বাড়ীর ঘরদোরে সহজভাবে চলতে সে শিখেছিল। সেখানে সব ফাঁকা। কিন্তু এখানে— এখানে ঢেউ-এর পর ঢেউ-এ, অবোধ্য পরম্পরায় তাকে অন্য কিছু একটা ধরছে, কখনো কোমলভাবে আদর করছে, কখনো বা জাগিয়ে তুলছে, পাগল করে দিচ্ছে। সূর্যের উত্তাপ হঠাৎ যাচ্ছে মিলিয়ে, হাওয়া লাগছে কপালে, গালে, মাথার চারিদিকে, চিবুক থেকে ঘাড়

পর্যন্ত, আর কান টনটন করছে, হাওয়ায় তার সমস্ত শরীর টনটন করছে, যেন চেষ্টা করছে তাকে তুলে অন্ধদৃষ্টির অগোচর শূন্যে নিয়ে যেতে। তার চেতনায় টান দিচ্ছে সেটা, আনছে বিস্মৃতি আর অবসাদ। মায়ের হাত আঁকড়ে ধরে আছে সে, বুক টিপ্‌টিপ্‌ করছে, হৃৎস্পন্দন প্রায় স্তব্ধ হয়ে আসছে।

ঘাসের উপরে বসিয়ে দেওয়াতে তার অনেকটা আশ্বস্ত লাগল প্রথমে। বিস্ময়ের ভাব তখনো তার সমস্ত সত্তায়, কিন্তু তার মধ্যে চারিদিকের আলাদা আলাদা শব্দ চিনতে শুরু করল সে। আগেকার মত তার উপরে আসছে কালো নরম সব ঢেউ। এমন কি মনে হল দেহ ভেদ করে তারা ঢুকছে, কেননা তাদের আসা-যাওয়ার ছন্দে শিরায় শিরায় রক্ত স্পন্দমান। কিন্তু এ সরের সঙ্গে এখন আসছে নানা শব্দ—একটা ভরতপাখীর পরিষ্কার কাঁপা ডাক, নবপত্র বার্চের মর্মরধ্বনি, নদীর অস্পষ্ট ঝপঝপাত শব্দ। একটা সোয়ালো খুব কাছে কোথায় চঞ্চলভাবে ঘুরছে আর ঘুরছে, পাতলা পাখায় ক্ষীণ আওয়াজ তার; ছোট ছোট মশার ঝাঁকের গুনগুন। আর মাঝে মাঝে থেমে থেমে, সব ছাড়িয়ে, নদীর ওপারের সমভূমি

থেকে আসছে গরু তাড়ানো কৃষাণের বিলম্বিত বিষণ্ন ডাক।

শিশুটি কিন্তু সমস্ত শব্দগুলোকে একসঙ্গে, অখণ্ডভাবে ধরতে পারল না। তাদের মিলিয়ে সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে সাজাতে সে পারছে না। তার ছোট কালো মাথায় তারা আসছে আলাদা আলাদা ভাবে, কয়েকটি ঝাপ্‌সা আর কোমল, কয়েকটি বা পরিষ্কার, উচ্চকিত, বধির করে দেওয়া। মাঝে মাঝে তারা সব আসছে একসঙ্গে, অপ্রীতিকরভাবে ভিড় করে, অবোধ্য বিশৃঙ্খলায়। আর মাঠ থেকে আসা বাতাসের শিস তখনো কানে বেজে চলেছে। শব্দের ঢেউগুলো জোরে, আরো জোরে আসছে তার উপরে, তাদের হট্টগোলে আর সমস্ত শব্দ কমে গেল, ছেলেটির মনে হল তার অজানা অন্য কোন পৃথিবী থেকে তারা আসছে, অতীত দিনের স্মৃতির মত। শব্দগুলো ক্রমশ কমে যাচ্ছে আর ছেলেটির বুক যেন চিনচিনে অবসাদে ভেঙ্গে পড়ছে। তার দিকে আসা শব্দের ঢেউ-এর ছন্দে ছেলেটির মুখ সঙ্কুচিত হচ্ছে, চোখ যাচ্ছে বুজে, খুলে যাচ্ছে, আবার বুজে যাচ্ছে। তার ভুরুতে এল অস্বস্তির ভঙ্গী। মুখাবয়বের সমস্ত কিছুতে জিজ্ঞাসার চিহ্ন, বুদ্ধি

আর কল্পনার দুরূহ প্রয়াসের ছাপ। বয়স অল্প আর এখনো দুর্বল বলে নতুন নানা অনুভূতির চাপে তার চেতনা ক্লান্ত হতে শুরু করল। চারিদিক থেকে ভিড় করে ভেসে আসা নানা অনুভূতি আর সংবেদন বুঝতে তার মন তখনো যুঝছে, যাতে তাদের মধ্যে তার চেতনার ভার-সাম্য হারিয়ে না যায়, তাদের মিলিয়ে অখণ্ড কিছু একটা করে তাদের শাসনে আনতে পারে, পারে জয় করতে। কিন্তু শিশুটির দৃষ্টিশক্তিহীন অনালোকিত বোধশক্তির পক্ষে সে কাজটা অত্যন্ত দুরূহ।

আর শব্দগুলো আসতেই লাগল, খরবেগে, একটার উপরে আর একটা এসে পড়ছে, তখনো উচচকিত সবাই তারা, অথচ কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল নেই ...। শব্দের ঢেউ ক্রমশ বর্ধমান টান-টান ভাবে আসছে, শিশুটির চারিদিকের মুখর, উচচকিত অন্ধকার থেকে এসে ফিরে যাচেছ একই অন্ধকারে, আবার আসছে নতুন ঢেউ, নতুন ধ্বনি। আসছে দ্রুতভাবে, উচচরবে, তার যন্ত্রণা বাড়িয়ে, তাকে তুলে, দোলা দিয়ে, ঘুম পাড়িয়ে। আবার থিতিয়ে যাওয়া সব বিশৃঙ্খলা ছাড়িয়ে এল মানুষের বিলম্বিত বিষণ্ণ হাঁক। তারপর সব চুপচাপ।

অস্ফুটভাবে গোঙিয়ে ছেলেটি ঘাসে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি ফিরে তাকিয়ে মা ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল। নিশ্চলভাবে ঘাসে শুয়ে আছে সে, মুখ শাদা। ছেলেটি একেবার অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে।

## ৮

এই ঘটনায় মাক্সিমমামা বিশেষ উৎকণ্ঠিত হলেন। শারীরবৃত্ত, মনোবিদ্যা আর অধ্যাপনা বিদ্যার বই অর্ডার দিয়ে আনিয়ে শিশুদের মন, বৃদ্ধি ও বিকাশের নানা রহস্য বিষয়ে বিজ্ঞান হালে যা কিছু বলতে পারে তার অধ্যয়ন স্বভাবসুলভ উৎসাহে শুরু করলেন।

নতুন অধ্যয়নে দিনে দিনে এত নিবিষ্টচিত্ত হলেন তিনি যে, আগেকার সব মর্মান্তিক ভাবনা—জীবনযুদ্ধে অযোগ্যতা, 'মালগাড়ীর বোঝা', 'পদদলিত কীট ধূলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছে'—রাতারাতি তাঁর চৌকো মাথা থেকে ঝেঁটিয়ে সাফ হয়ে গেল। তার বদলে এল চিন্তাগভীর উৎসাহ একটা, মাঝে মাঝে এমন কি রঙীন স্বপ্নে তাঁর প্রৌঢ় হৃদয় উষ্ণ হয়ে উঠত। ক্রমশ পরিষ্কারভাবে তিনি বুঝলেন যে ভাগ্নের দৃষ্টিশক্তি হরণ করলেও প্রকৃতি

অন্যান্য বিষয়ে তার প্রতি সদয়। বহির্পৃথিবীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত কিছুতে সে অসাধারণ সম্পূর্ণ, বলিষ্ঠভাবে সাড়া দিত। আর মাক্সিমমামা অনুভব করলেন যে তাঁর বিশেষ কাজ হল শিশুটির সহজাত সমস্ত গুণের বিকাশ করানো, নিজের বুদ্ধির প্রয়াসে আর প্রভাবে প্রকৃতির অন্ধ অবিচারের ক্ষতিপূরণ করা, যে লড়াই থেকে তিনি বেরিয়ে এসেছেন সেখানে নিজের শূন্য স্থানে জীবনের সংগ্রামের জন্য আর একটি সৈনিক বসানো, নতুন সে সৈনিক তাঁর ছাড়া অন্য কোন প্রভাব মেনে চলবে না।

'কে বলতে পারে কী হবে?' গারিবাল্‌দির পুরানো চেলা ভাবলেন। 'শেষ পর্যন্ত তলোয়ার আর বর্শাই অভিযানের একমাত্র অস্ত্র নয়। হয়ত একদিন, ভাগ্যের হাতে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত এই শিশুটি যে অস্ত্র আয়ত্তে আনবে তা তার মত দুর্ভাগাদের, প্রকৃতির অবিচারে প্রতারিত জনদের কাজে লাগাতে পারবে। আর তাহলে পঙ্গু সৈনিকের জীবন বিফলে যাবে না।

'প্রকৃতির সেই রহস্য', ভবিতব্যতা যার নাম, তাতে অন্ধবিশ্বাসের হাত থেকে ১৮৪০—৫০-এর এমন কি মোহমুক্ত লোকেরাও একেবারে রেহাই পাননি। তাই

আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুটি যখন অসাধারণ নানা শক্তির পরিচয় দিতে লাগল, মাক্সিমমামা ধরে নিলেন যে ওর দৃষ্টিহীনতাই প্রকৃতির সেই রহস্যের একটি লক্ষণ।

'নিয়তি আমাকে দুর্ভাগা করেছে, ভাগ্যহীনদের জন্য আমার জীবন'—পালিত সন্তানের রণধ্বজার জন্য এই উক্তিটি তাঁর পছন্দ হল।

## ৯

বসন্তে সেই প্রথম বাইরে যাবার পর ছেলেটি বিকারের ঘোরে কয়েকদিন শুয়ে থাকল। হয়ত নিঃসাড় চুপচাপ শুয়ে আছে বিছানায়, কিম্বা ছটফট আর বিড়বিড় করছে, কিম্বা হয়ত যেন কিছু শোনার জন্য কান পেতে আছে। যাই করুক না কেন, সব সময় তার মুখে সেই অদ্ভুত হতচকিত ভাব।

মা বলল, 'সত্যি, দেখে মনে হচ্ছে ও যেন কিছু একটা বোঝার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না।'

মাক্সিমমামা চিন্তাকুলভাবে মাথা নাড়লেন। তিনি বুঝলেন যে নতুন নানা অনুভূতির অতিপ্রাচুর্য ছেলেটির

কল্পনাকে ভারাক্রান্ত করাতেই ওর এই বিচিত্র অস্বস্তি, তাই হঠাৎ ও অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। ছেলেটি সেরে উঠছে, তখন ঠিক করা হল ওকে সইয়ে সইয়ে, তিলে তিলে যেন, নতুন সব জিনিস দেখাতে হবে। প্রথমে ওর ঘরের সব জানলা একেবারে বন্ধ করে রাখা হল। তারপর শরীরের বল আস্তে আস্তে ফিরে এলে মাঝে মাঝে জানলাগুলো খোলা হত, অল্পক্ষণের জন্য। পরে যখন হাঁটতে আরম্ভ করল তখন ওর মা বাড়ীর এদিকে ওদিকে নিয়ে যেত, তারপর বারান্দায়, তারপর উঠোনে, বাগানে। আর যখনই ওর মুখে ক্লেশের ভাব আসত তখনই না-বোঝা সব শব্দ কী, বুঝিয়ে বলত ওর মা।

বলত, 'ওটা বনের ওপারে রাখালের শিঙ্গার আওয়াজ। ওটা ত রবিন পাখীর ডাক, চড়ুইদের কিচিরমিচিরের মধ্যে শোনা যাচ্ছে। আর ওটা ত বক, চাকায় বসে ডাকছে* অনেক দূর দেশ থেকে এই ত সেদিন ফিরেছে

---

* উক্রেনে, পোলাণ্ডেও, লোকেরা লম্বা খুঁটির উপরে গাড়ীর পুরানো চাকা ঝুলিয়ে রাখে, যাতে সেখানে বকেরা বাসা বাঁধতে পারে।

ও, আর গত বছরে যেখানে ছিল এখন ঠিক সেখানেই বাসা বাঁধছে।'

মাথা নেড়ে মায়ের হাতে চাপ দিত শিশুটি, কৃতজ্ঞতায় ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত। আর আশেপাশের শব্দ যখন শুনত তখন ওর মুখে আসত চিন্তাশীল, অর্থগ্রহ মনোযোগের ভাব।

১০

যা কিছু তার মনে লাগে তার বিষয়ে সে প্রশ্ন করতে শুরু করলে ওর মা, বা বেশীর ভাগ সময়ে মাক্সিমমামা বলে দিতেন তার শোনা শব্দ কোন্ জীব কিম্বা জিনিস থেকে আসছে। মা'র বর্ণনা মাক্সিমমামার চেয়ে বেশী সজীব আর তীব্রভাবে, আরো প্রখরভাবে তার কল্পনায় ছাপ দিত; কিন্তু অনেক সময় কষ্ট হত, সে বর্ণনা তার বোধশক্তির পক্ষে বেশী বলে। মা'ও যন্ত্রণা পেত, অসহায় ব্যথায় আর বিষাদে তার চোখ আসত ভরে। কিন্তু নিজের ক্ষমতায় যতখানি কুলোয় ততখানি শিশুকে জিনিসের আকৃতি আর রঙ বোঝাতে চেষ্টা সে করত। একাগ্রভাবে শুনতে শুনতে পেতিয়া থাকত বসে, ভুরু

ঘনিষ্ঠ করে, ছোট ছোট রেখায় কপালে ভাঁজ পড়ছে, সাধ্যাতীত কাজের সঙ্গে তার শিশুমন যুঝছে, মা যা বলছে তার সাহায্যে নতুন সব প্রত্যয় গড়ার জন্য কল্পনা তার নিষ্ফল চেষ্টা করে চলেছে। এরকম দৃশ্য চোখে পড়লেই মাক্সিমমামা ভ্রূকুটি করতেন; আর যখন মায়ের চোখে জল এসে গিয়েছে আর বোঝবার চেষ্টা করে করে ছেলেটি বিবর্ণ, তখন তিনি বোনকে চুপ করতে বলে নিজেই কথা বলতে শুরু করতেন, যতদূর সম্ভব তিনি তার ব্যাখ্যাকে স্থান আর শব্দনির্ভর ধারণায় আবদ্ধ রাখতেন। ছেলেটির মুখ থেকে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেত ক্লেশের ভাব।

'বড়ো তাহলে, কত বড়ো?' চাকার উপরে বসে যে বকটি অলসভাবে চোঁচ দিয়ে ঠকঠক করছে তার বিষয়ে কথা হচ্ছিল।

ছেলেটি দুটো হাত ছড়িয়ে দিল, কোন জিনিস কত বড়ো জিজ্ঞাসা করার সময় ওরকম করত, খুব বেশী ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে মাক্সিমমামা তাকে থামিয়ে দিতেন। কিন্তু এবারে হাত দুটো ছড়াচ্ছে ত ছড়াচ্ছেই, তবুও মাক্সিমমামা বলছেন:

না, আরো বড়ো। অনেক বড়ো। ওটাকে যদি নামিয়ে বাড়ীর মেঝেতে রাখা হয় তাহলে ওর মাথা চেয়ারের পিঠ ছাড়িয়ে উঠবে।'

'এত বড়ো', কী যেন ভাবতে ভাবতে ছেলেটি বলল। 'কিন্তু একটা রবিন, সেটা ত এইটুকু!'—দুটো করতল প্রায় জুড়ে ফেলল সে।

'হ্যাঁ, রবিন ওরকম...। কিন্তু একটা কথা, ছোট পাখীরা যেমন সুন্দর গায় বড়োরা তা কখনো পারে না। রবিনগুলো খুব চেষ্টা করে যাতে তাদের গান সবায়ের মনে লাগে। কিন্তু বক খুব গুরুগম্ভীর পাখী। বাসায় এক পায়ে দাঁড়িয়ে চারিদিক তাকায়, যেন খিটখিটে কর্তা চাকরদের নজরে রাখছে আর যত খুসী জোরে গজগজ করছে। ওর গলাটা হেঁড়ে, অচেনারা হয়ত শুনে ফেলবে, কিন্তু ও থোড়াই কেয়ার করে।'

এ ধরনের গল্প শুনে ছেলেটি খুসীতে হাসত, মায়ের গল্প বোঝার প্রয়াসসাপেক্ষ দুঃখ ও কষ্টের কথা আর মনে থাকত না। কিন্তু তবুও মায়ের গল্পই তাকে বেশী টানত আর প্রশ্ন করত প্রথমে তাকেই, মাক্সিমমামাকে নয়।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

১

ছেলেটির পৃথিবী আরো বড়ো হল। সূক্ষ্ম শ্রবণশক্তি প্রকৃতির বিষয়ে ক্রমশ নানা জিনিস তাকে শেখাল। কিন্তু আগেকার মতই সর্বক্ষণ তার উপরে ও চারিপাশে উদ্যত গভীর অভেদ্য অন্ধকার, কালো মেঘের ভারী চাপে তার মন আচ্ছন্ন। জন্মদিন থেকেই এটা তার উপরে উদ্যত, অভ্যেস হয়ে যেত নিশ্চয়ই, নিজের দুর্ভাগ্য মেনে নিত। কিন্তু মেনে সে নিল না। তার শিশুসুলভ সত্তায় সহজাত এমন কিছু ছিল যা নিরন্তর অন্ধকার থেকে মুক্তিলাভের প্রয়াস করত। আর যে আলো সে কখনো দেখেনি তার জন্য এই অন্তর্জ্ঞানীয় অবিরত সন্ধান ক্রমশ গভীর ছাপ রেখে গেল তার মুখে, আনল একটি অনির্ধারিত যন্ত্রণাকর প্রয়াসের ভাব।

তবু তারও মাঝে মাঝে আসত নির্মেঘ আনন্দের মুহূর্ত, উজ্জ্বল, শিশু উচ্ছ্বাসের মুহূর্ত সব। তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন প্রখর অনুভূতি পৃথিবীর সম্বন্ধে নতুন উপলব্ধি আনলেই এগুলো আসত। মহান বিরাট প্রকৃতি

অন্ধ শিশুটির কাছে একেবারে বন্ধ বই-এর মত ছিল না। এই ত সেদিন নদীর উপরে খাড়া উঁচু একটি পাহাড়ে ওকে নিয়ে গিয়েছিল তারা, অনেক নিচে নদীর ঝপ্‌ঝপ্‌ শব্দ সে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনেছে, মুখে এসেছে সম্পূর্ণ নতুন ভাব; আর তারপর পায়ের নিচে থেকে পাথরের নুড়ি পাহাড়ের গা বেয়ে পড়েছে, তার শব্দে ভীরুচিত্তে মায়ের স্কার্ট আঁকড়ে ধরেছে সে। তার পরে, মনে গভীরতার ধারণার সঙ্গে সর্বদাই অঙ্গাঙ্গি হয়ে থাকত পাহাড়ের নিচে জলের কুলকুল শব্দ আর পড়ন্ত পাথরের নুড়ির সচকিত দ্রুত আওয়াজ।

কোন গান আস্তে আস্তে শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে, তার কাছে সেটা হল দূরত্বের ভাষণ। বসন্তের বজ্রধ্বনি গড়িয়ে যাচ্ছে আকাশে, গুরুগুরু শব্দে সমস্ত দিক পূর্ণ, তারপর উপসংহারে ক্রুদ্ধ হুঙ্কারে মেঘের পিছনে সেটা সরে গেল, অন্ধ ছেলেটি এই সব মুহূর্তে ভক্তি আর ভয়ে কান পেতে শুনত। তার বুক ভরে যেত, মহাকাশের মহিমা আর বিস্তারের একটি তীব্র বোধ আসত তার মনে।

এই ভাবে প্রধানত শব্দের মাধ্যমেই বহির্জগতের উপলব্ধি তার হত। অন্যান্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি শব্দ-

ধারণাগুলির শুধু পরিপোষণ করত, শব্দের মাধ্যমেই পৃথিবীর বিষয়ে তার সমস্ত ধারণা রূপ নিত।

মাঝে মাঝে সবচেয়ে গরম পড়েছে, সব শব্দ গিয়েছে থেমে, মানুষের কাজ বন্ধ, আর প্রকৃতি সেই বিশেষ নীরবতায় আচ্ছন্ন যে নীরবতায় কোন গতির বোধ থাকে না কিন্তু অনুভব করা যায় প্রাণশক্তির অবিরাম নিঃশব্দ প্রবাহ—সে সময় কখনো কখনো সম্পূর্ণ নতুন একটি ভাবে শিশুটির মুখ রূপান্তরিত হত। মনে হত যেন একাগ্রভাবে নানা শব্দ সে শুনছে, সে ছাড়া সেই সব শব্দ আর কেউ শুনতে পায় না, অন্তর থেকে, নিজের সত্তার গভীরতা থেকে তারা উঠছে, বাইরের বিপুল মৌন তাদের ডেকে আনছে। তাকে সে সময় দেখলে মনে হত যে একটা অস্পষ্ট ভাব তার অন্তরে স্বর-পরম্পরায় ধ্বনিত হচ্ছে, সেটা ঝাপ্‌সা, আকার নেয়নি তখনো।

২

পাঁচ বছরে পড়েছে সে, তখনো রোগা আর দুর্বল। বাড়ীতে সে ঘরে ঘরে ঘোরে, এমন কি দৌড়য় সম্পূর্ণ সহজভাবে। স্বচ্ছন্দভাবে হাঁটে, মোড় নেবার সময়

একেবারে ইতস্তত করে না, যা চায় তা অনায়াসেই বের করে, দেখলে কোন আগন্তুক হয়ত বুঝতে পারত না যে ওর দৃষ্টি নেই, হয়ত ধরে নিত বয়সের তুলনায় অস্বাভাবিক চিন্তাপ্রবণ শিশু ও, ওর স্বপ্নালু চোখ যেন ঝাপ্‌সা দূরে, অনেক দূরে নিবদ্ধ। বাড়ীর বাইরেটা কিন্তু তার কাছে এত সহজ ব্যাপার নয়। লাঠি নিয়ে হাঁটে সে, প্রত্যেকবার পা ফেলবার আগে সেটা দিয়ে মাটি দেখে। লাঠি না থাকলে হামাগুড়ি দিয়ে এগোয়, পথে-পাওয়া প্রত্যেকটি জিনিস আঙুল দিয়ে দ্রুতভাবে পরীক্ষা করে।

৩

গ্রীষ্মের একটি প্রশান্ত সন্ধ্যা। মাক্সিমমামা বাগানে। শিশুটির বাবা তখনো বরাবরকার মত কোন দূরের ক্ষেতে। সব চুপচাপ। সারা গ্রাম ঘুমিয়ে পড়ছে, চাকরবাকরদের ঘরেও কথাবার্তা থেমে গিয়েছে। আধ ঘণ্টা আগে শিশুটিকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে।

ঘরে শুয়ে আছে সে, আধোঘুমে। কয়েক দিন হল এই প্রশান্ত সন্ধ্যাগুলির কথা ভাবলেই তার মনে আসে নানা বিচিত্র স্মৃতি। অন্ধকার-হয়ে-আসা নীল আকাশ

সে দেখতে পারে না অবশ্য; আকাশের নক্ষত্রখচিত মখমলের পটভূমিতে দোদুল্যমান বৃক্ষচূড়ার কালো কালো রেখা, গোলাঘর আর আস্তাবলের ছাদের মোটা মোটা কার্ণাচে ক্রমশ ছায়া জড় হচ্ছে, নীল অন্ধকার পৃথিবীতে গুঁড়ি মেরে আসছে, চাঁদের আর তারার আলোর ঝকঝকে সোনা—এ সব তার দৃষ্টির বাইরে। তবুও দিনের পর দিন মন্ত্রমুগ্ধের মত সে ঘুমিয়ে পড়ত, কুহকটা কী সকালে উঠে বলতে পারত না।

কুহকটি আসত ঘুমে যখন তার সমস্ত ইন্দ্রিয় আচ্ছন্ন হয়ে আসছে, যখন জ্ঞাতসারে আর শুনছে না জানলার ধারে বীচের মর্মরধ্বনি, দূরে গাঁয়ের কুকুরের ঘেউ ঘেউ, নদীর ওপারে নাইটিংগেলের গান, মাঠে-চড়া বাচ্চা ঘোড়ার গলার ঘণ্টার বিষণ্ণ ঠুন্‌ঠুন শব্দ, যখন আল্লাদা আলাদা সমস্ত ধ্বনি মিলিয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে মনে হত। নতুন কোন মৃদু ঐকতানে মনে হত তারা আবার ফিরে এসেছে, সমস্ত শব্দ জানলা দিয়ে এসে অনেকক্ষণ তার বিছানার আশেপাশে ভাসছে, তার বুক ভরিয়ে দিচ্ছে ঝাপসা অথচ প্রীতিকর নানা কল্পনায়। সকালে

নরম কোমল মনোভাবে তার ঘুম ভাঙ্গত, মা'কে ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করত:

'কী হয়েছিল... কাল রাতে, কী হয়েছিল?...'

মা উত্তর দিতে পারত না। ভাবত ছেলেটি হয়ত স্বপ্ন দেখেছে। প্রতি সন্ধ্যায় ছেলেটিকে শুইয়ে দিয়ে, প্রাণভরে আশীর্বাদ করে, যতক্ষণ না ও ঘুমিয়ে পড়েছে মনে হত ততক্ষণ বিছানার পাশে মা দাঁড়িয়ে থাকত। অসাধারণ কিছু কখনো তার চোখে পড়ত না। তবুও সকালে, গত রাত্রের কী একটা প্রীতিকর অভিজ্ঞতার কথা ছেলেটি আবার বলত।

'এত সুন্দর সেটা, মা, এত সুন্দর! কী সেটা বলত?'

আর সেইজন্য আজ সন্ধ্যায় শিশুর ঘরে বসে সব লক্ষ্য করবে মা ঠিক করেছে, হেঁয়ালিটা বোঝার আশায়। বিছানার পাশে শান্তভাবে বসে অভ্যাসবশে বুনে চলেছে, শুনছে ছোট্ট পেতিয়ার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সমান শব্দ। কিছুক্ষণ পরেই মনে হল ও গভীর ঘুমে মগ্ন। কিন্তু হঠাৎ অন্ধকারে ফিস্‌ফিস্‌ করে কী বলছে কানে এল।

'মা, তুমি এখনো এখানে?'

'হ্যাঁ, পেতিয়া।'

'তুমি চলে যাও, ও তোমাকে দেখে ভয় পেয়েছে, তাই আসছে না। আমি ত প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তবুও ও আসছে না...'

ফিসফিস করে উচ্চারিত এই ঘুমন্ত খেদোক্তি মা'র মনে বিচিত্র একটা ভাব আনল। এত দৃঢ় বিশ্বাসে নিজের কল্পনার কথা বলছে, যেন সেটা খুব বাস্তব কিছু একটা! তবুও উঠে বিছানায় ঝুঁকে ওকে চুমু খেয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ভাবল বাগান হয়ে ঘুরে অলক্ষিতে ওর খোলা জানলার বাইরে আসবে।

বাগান হয়ে আসছে, হঠাৎ হেঁয়ালির উত্তরটা পেয়ে গেল। আস্তাবল থেকে আসছে বাঁশীর কোমল সুর, রাত্রির অস্ফুট নানা শব্দের সঙ্গে মিশছে একটি সহজ নিরলঙ্কার গ্রাম্য গীতি। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, ঘুমের ঠিক আগের অলৌকিক মুহূর্তগুলিতে শোনা এই সুর শিশুটির মনে নানা মধুর স্বপ্ন আনে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে মুগ্ধভাবে কোমল উক্রেনীয় সুরটি সে শুনল, তারপর আশ্বস্তভাবে গেল বাগানের অন্ধকার বীথিতে মাক্সিমমামার কাছে।

‘কী সুন্দর বাজায় ইওহিম!’ সে ভাবল। ‘আপাত-দৃষ্টিতে অমার্জিত ওর মত লোকের এরকম কোমল সূক্ষ্ম অনুভূতি, অবাক কাণ্ড সেটা।’

৪

সত্যিই ইওহিম ভালো বাজায়। বেহালা বাজানো খুব কঠিন, কিন্তু তাতেও সে ওস্তাদ; আর এমন দিন ছিল যখন সরাইখানায় কোন রবিবারে তার চেয়ে ভালো ‘কসাক’ নাচ কিম্বা পোলীয় ‘ক্রাকোউইয়াক’এর ফূর্তির সুর কেউ বাজাতে পারত না। সেখানে কোণে নিজের বেঞ্চিতে বসত সে, বেহালাটি ঠেকানো কামানো চিবুকে, উঁচু ভেড়ার লোমের টুপি বেশ কায়দায় হেলানো; আর যখন বেঁকানো বেহালার ছড়ি টানটান প্রতীক্ষমান তারে লাগাত তখন সরাইখানায় খুব কম লোকই চুপ করে বসে থাকতে পারত। এমন কি সেই বুড়ো কানা ইহুদীটা পর্যন্ত, ডাবল্‌-বেজে যে সঙ্গত দিত ওকে, সেও ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ত। ওর কাঁধদুটো মাঝে মাঝে হঠাৎ সঙ্কুচিত হত, কালো আঁট টুপি পরা টেকো মাথা দুলত, আর ছোট ক্ষীণ শরীরের সমস্তটা ফূর্তিচঞ্চল সুরটির তালে

তাল রাখত আর মনে হত যে বেহালার দ্রুত হালকা ট্রেবলের সঙ্গে মিলিয়ে ভারী বেজ বাজানোর প্রয়াসে ওর বেঢপ যন্ত্রটা প্রায় ফেটে পড়বে।

আর ক্রীশ্চানটির কথা ছেড়েই দিই। সরস কোন নাচের বাজনা শুনলেই ত তাল ঠুকে নাচার জন্য ও পা বাড়িয়েই আছে।

কিন্তু পাশের জমিদারীর একটি পরিচারিকা মারিয়া, তার প্রেমে পড়ল ইওহিম। আর শীগ্‌গিরই সরস বেহালাটির কোন মোহই আর তার রইল না। সত্যি সেটা চালাকচতুর মেয়েটির হৃদয় জয় করাতে সাহায্য করল না। উক্রেনীয় সহিসের গোঁফ আর গানের চাইতে একটি ভৃত্যের জার্মান ধাঁচে গোঁফদাড়ি কামানো মুখ মারিয়ার বেশী পছন্দ হল। আর যেদিন মারিয়া মনস্থির করে ফেলল সেদিন থেকে সরাইখানায় কিম্বা ছোকরাদের সান্ধ্য আড্ডায় ইওহিমের বেহালার আওয়াজ আর শোনা গেল না। আস্তাবলের দেয়ালে কাঠের গজালে ইওহিম ঝুলিয়ে রাখল একদা-প্রিয় বেহালাটা, আর যখন স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় আর অবহেলায় একে একে সব কটা তার ছিঁড়ে গেল তখন মনে হল ও পরোয়াই করে না; তারগুলো এত জোরে

আর করুণ আর্তনাদে ছিঁড়ে যেত যে অনুকম্পায় ঘোড়াগুলো পর্যন্ত চিঁহি চিঁহি করে ঘুরে বিস্ময়ে তাকাত বেহালাটার নিষ্ঠুর মালিকের দিকে।

গ্রাম হয়ে যাচ্ছিল একটি কারপেথীয় পর্বতবাসী, তার কাছে ইওহিম কাঠের একটা বাঁশী কিনল, বেহালাটির জায়গায়। হয়ত ভাবল বাঁশীটির মিঠে করুণ সুর তার তিক্ত দুর্ভাগ্যের সঙ্গে আরো বেশী খাপ খাবে, বেশী করে প্রকাশ করবে তার প্রত্যাখ্যাত হৃদয়ের গভীর বিষণ্ণতা। কিন্তু পাহাড়ে বাঁশী তার আশাভঙ্গ করল। আরো অনেক বাঁশী, প্রায় দশটা, সে বাজিয়ে দেখল। মানুষে যা পারে তাই করল, তাঁদের চাঁচল, কাটল, জলে ভিজিয়ে রোদে শুকোল, দড়ি দিয়ে বেঁধে ছাতের নিচে এমনভাবে রাখল টাঙ্গিয়ে যাতে সব দিক থেকে হাওয়া লাগে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ওর উক্রেনীয় হৃদয়ের বিষাদ পাহাড়ে বাঁশীগুলো প্রকাশ করতে অক্ষম। যখন গান গেয়ে ওঠা উচিত তখন ওরা শিস দেয়, যখন গুনগুন করাতে চায় তখন করে চিঁ চিঁ। তারা একেবারেই ওর মেজাজ মানিয়ে চলবে না। তাই শেষে ভীষণ চটেমটে ও বুঝল সারা দুনিয়ায় এমন কোন পাহাড়িয়া

নেই যে সত্যিকার ভালো বাঁশী বানাতে পারে। ঠিক করল নিজের হাতেই বাঁশী বানাবে। অনেক দিন মাঠে-ঘাটে জলায় গম্ভীর মুখে ইওহিম ঘুরল। উইলোর ঝাড় দেখলেই দাঁড়াত, ডাল বাছ্‌ত, এখানে সেখানে একটা দুটো বাছাই করে কাটত, কিন্তু কোনটাই তার মনের মত হল না। ওর ভ্রূভঙ্গী রয়েই গেল, ডালের সন্ধান ছেড়ে দিল না। কিন্তু তারপর একদিন শান্ত ছোট একটি নদীতে পেঁৗছল সে, তার অলস স্রোতে কুমুদের শাদা গুচ্ছ্‌ প্রায় নিথর, উইলোর ঘনিষ্ঠ ঝাড় স্তব্ধ অন্ধকার গভীরে স্বপ্নালসভাবে ঝুঁকে সব হাওয়া আটকিয়ে রেখেছে। উইলো ঠেলে ইওহিম গেল নদীতীরে, চারিদিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। আর হঠাৎ, সে নিজেই বলতে পারত না কেন, বুঝতে পারল এতদিন ধরে সে যা চাইছে তা এখানেই মিলবে। ওর ভ্রূকুটি গেল মিলিয়ে, বুটের ডগায় বাঁধা ছুরিটা টেনে বের করল। সরসর শব্দ করা ঝোপঝাড়ের সারির এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত সন্ধানী দৃষ্টিতে একবার দেখে ও বাছাই করে ফেলল, খাড়া তীরের একেবারে ধারে একটি ঋজু পাতলা গুঁড়ির দিকে সটান গেল। কিসের জন্য বলা মুস্কিল আঙুলের টোকা

দিয়ে দেখল ওটা দুলছে, নমনীয়ভাবে বেঁকে আবার সোজা হয়ে গেল, পাতাগুলোর সরসর শব্দ কিছুক্ষণ শুনে ইওহিম খুসীতে মাথা নাড়াল।

'পেয়েছি', অস্ফুট আনন্দিত স্বরে সে বিড়বিড় করে বলল। আর অন্য যে সব ডাল কেটেছিল নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

বাঁশীটা হল চমৎকার। উইলোর কাণ্ডটি প্রথমে সে শুকোল। তারপর গনগনে গরম তার দিয়ে ভেতরটা পুড়িয়ে ফেলল; পুড়িয়ে ছটা গোল ফুটো করা হল পাশে, আর একটা তেরচাভাবে মুখের দিকে; এক টুকরো কাঠ দিয়ে একটা দিক শক্ত করে বন্ধ করা হল, কাঠটা সরু করে লম্বালম্বিভাবে কাটা। বাইরে সাতদিন টাঙ্গানো থাকল বাঁশীটা, রোদে যাতে তেতে ওঠে আর হাওয়ায় ঠাণ্ডা হয়। তারপর সেটাকে নামিয়ে ছুরি দিয়ে সযত্নে কেটে, কাঁচ দিয়ে ঘষে মসৃণ করল, একটা মোটা পশমের কাপড় দিয়ে ভালো করে ঘষল। বাঁশীর উপর দিকটা গোল করা হল, কিন্তু নিচের দিকটায় অনেকগুলো পাশ, আর তার উপরে বেঁকানো লোহার টুকরো দিয়ে পুড়িয়ে ইওহিম পরস্পরের সঙ্গে মেলানো নানা নক্‌সা করল।

সবকিছু শেষ হয়ে গেলে দু একটি ক্ষিপ্র সুর বাজাল সে, আর বিস্ময়ের অস্ফুট শব্দ করে তাড়াতাড়ি বাঁশীটা বিছানার পাশে সন্তর্পণে রেখে দিল। বাঁশীটা কর্মমুখর দিনের বেলায় প্রথমে পরীক্ষা করতে চায়নি সে। কিন্তু সন্ধ্যা যখন এল, আস্তাবল থেকে বাইরে ছড়িয়ে পড়ল বাঁশীটার সুর, কোমল, স্বপ্নালু, কম্পমান। ইওহিমের মনের মত বাঁশী। যেন তার সত্তার এক টুকরো, এমন ভাবে ওটা সাড়া দিচ্ছে। মনে হল ওটার সুর ওর নিজের উষ্ণ ব্যথিত হৃদয় থেকে আসছে। তার অনুভূতির প্রত্যেকটি খোঁচ, তার বিষাদের প্রত্যেকটি সূক্ষ্ম খোঁচ তানে তানে এই অপরূপ বাঁশীটিতে বাজছে, নিস্তব্ধ, কান-পেতে-রওয়া সন্ধ্যায় ভেসে যাচ্ছে।

৫

ইওহিম তার বাঁশীর প্রেমে পড়ল, চলল মধুচন্দ্রিমার উৎসব। দিনের বেলায় আগেকার মতই কাজ করে সে, ঘোড়াগুলোকে ধোয়ায়, দরকার হলে সাজ পরিয়ে শ্রীমতী পপেল্‌স্কায়া কিম্বা মাক্সিমমামাকে নিয়ে চালায়; আর মাঝে মাঝে ওদিকের গ্রামের দিকে তাকালে মনটা খারাপ

হয়ে যায়, ওখানে থাকে নিষ্ঠুর মারিয়া। কিন্তু সন্ধ্যা হলেই সমস্ত পৃথিবী তার কাছে মিলিয়ে যায়, এমন কি কালোভুরু মারিয়ার স্মৃতিও হয়ে যায় ঝাপসা, যেমন করেই হোক মর্মান্তিক বাস্তবতা হারিয়ে ফেলে, তার চেহারা যেন কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে যায়, শুধু নতুন অদ্ভুত বাঁশীর সুরে ব্যাকুল স্বপ্নালু ছাপ লাগাবার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু মনে পড়ে ইওহিমের।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় আস্তাবলে বিছানায় সঙ্গীতের ভাবাবেগে শুয়ে আছে ইওহিম, সমস্ত হৃদয় ঢেলে দিচ্ছে কম্পমান সুরে। সেই পাষাণী সুন্দরীর কথা একেবারে মনে নেই, নিজের অস্তিত্বের কথাও প্রায় ভুলে গিয়েছে, এমন সময় হঠাৎ চমকে ধড়মড় করে উঠে বসল। বাঁশীর বোল যখন সবচেয়ে মিঠে, ঠিক সেই সময় ছোট্ট একটি হাত তাড়াতাড়ি হালকাভাবে প্রথমে তার মুখ, তারপর তার হাত ছুঁয়ে বাঁশীটাতে পৌঁছেছে, সেখানে থেমে ব্যগ্র ব্যস্ততায় আঙুল দিয়ে সেটাকে দেখছে। ইওহিমের ঠিক পাশেই সজীব কিছু, তার দ্রুত উত্তেজিত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস সে শুনতে পেল।

‘ভগবান রক্ষা করুন।’ ইওহিম রুদ্ধশ্বাসে বলল— ভূতপ্রেত ভাগানোর বাঁধা বুলি ওটা। আর নিশ্চিত হবার জন্য কঠোর গলায় প্রশ্ন করল, ‘তুই কে হে, স্বর্গের না নরকের জীব?’

আস্তাবলের খোলা দরজা দিয়ে আসা এক চিলতে চাঁদের আলোয় তক্ষুণি সে নিজের ভুল বুঝতে পারল। তার সাদাসিধে বিছানার পাশে ব্যগ্রভাবে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে জমিদার বাড়ীর অন্ধ ছেলেটি।

ঘণ্টাখানেক পরে পা টিপে মা ছেলের ঘরে এল বাচ্ছা পেতিয়া ঘুমোচ্ছে কি না দেখতে। বিছানা খালি। এক মুহূর্ত ভয়ানক ভয় পেল সে, কিন্তু তক্ষুণি আঁচ করল পেতিয়া কোথায় যেতে পারে। দম নেবার জন্য বাঁশী নামিয়ে রেখেছে ইওহিম, এমন সময় আস্তাবলের দোরগোড়ায় গৃহকর্ত্রীকে দেখে ভয়ানক অপ্রস্তুত হয়ে গেল। নিশ্চয়ই কিছুক্ষণ হল ওখানে দাঁড়িয়ে উনি বাঁশী শুনেছেন আর ছেলেটিকে দেখেছেন। ছেলেটি ভেড়ার লোমের বড়ো জ্যাকেট পরিহিত ইওহিমের বিছানায় বসে ব্যগ্রভাবে তখনো প্রতীক্ষা করছে থেমে-যাওয়া সুর আবার কখন শুরু হবে।

৬

সেই দিন থেকে প্রতি সন্ধ্যায় পেতিয়া আস্তাবলে যায়। দিনের বেলায় ইওহিমকে বাজাতে বলার কথা তার কখনো মনে হয় না। দিনের বেলার কর্মব্যস্ততা আর চলাফেরার সময় এই সব কোমল সুরের কথা উঠতেই পারে না। স্পষ্টতই তাই ভাবে সে। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে এলে সে অধীর অস্থির হয়ে পড়ে। চা-পান, তারপর দিনের শেষ খানা, এগুলো অতি প্রত্যাশিত সময়ের এগিয়ে আসার লক্ষণ মাত্র, এ ছাড়া তাদের কোন অর্থ নেই। আর যদিও তার এই প্রবল আকর্ষণ মায়ের খারাপ লাগত তর্কাতীত, সহজাত কোন কারণে, তবুও ঘুমের আগে দু-এক ঘণ্টার জন্য আস্তাবলে ইওহিমের বাঁশী শুনে সন্ধ্যা কাটানোর আনন্দ থেকে আদরের ছেলেকে বঞ্চিত করতে সে পারত না। এই সময়টা শিশুটির সবচেয়ে প্রিয়। সন্ধ্যাবেলার সব স্মৃতি পরের দিনও সমস্তক্ষণ শিশুটি বয়, প্রবল ঈর্ষায় মা সেটা বুঝতে পারত। আদর করলেও ছেলেটি পুরানো দিনের মত একান্তভাবে আর সাড়া দিত না। তার কোলে শুয়ে আছে যখন তখনো

ওর স্বপ্নালু চোখ দেখে বোঝা যেত যে ইওহিমের গত কালের বাজানোর কথা ভাবছে।

আর তখনই মার মনে পড়ল সঙ্গীতে নিজের উৎকর্ষতার কথা। বলতে গেলে কিয়েভে শ্রীমতী রাদেৎ-স্কায়ার বোর্ডিং স্কুল ছাড়ার পর অনেক বছর ত অতিবাহিত হয়নি। সেই স্কুলে অন্যান্য 'চারুকলার' সঙ্গে পিয়ানো বাজানো তাকে শেখানো হয়েছিল। অবশ্য খুব প্রীতিকর স্মৃতি সেটা নয়। সেদিনের কথা ভাবলেই স্পষ্টভাবে মনে পড়ে সঙ্গীত শিক্ষয়িত্রী ফ্রাউলিন ক্লাপ্‌সের ছবি, বয়স্কা অবিবাহিতা জার্মান ভদ্রমহিলা, অসম্ভব রোগা, অসম্ভব নীরস, আর সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার যেটা— অসম্ভব খিটখিটে। এই বদমেজাজী ভদ্রমহিলাটি ছাত্রীদের 'আঙুল ভেঙ্গে' নরম করার ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, এবং ছাত্রীদের সঙ্গীতের কোন কাব্যানুভূতি থাকলে সেটার হত্যাকরণে আশ্চর্য সাফল্য অর্জন করেছিলেন। ও অনুভূতিটা প্রায়শই ক্ষীণ প্রকৃতির; ফ্রাউলিন ক্লাপ্‌সের উপস্থিতিটাই ওটাকে খেদিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট, ওঁর শিক্ষাপদ্ধতির কথা না হয় নাই তোলা গেল। আর তাই স্কুল ছাড়ার

পর তরুণী আন্না মিখাইলভ্‌নার পিয়ানো বাজানো চালু রাখার কোন প্রবৃত্তি হয়নি। বিয়ে হবার পরেও কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। কিন্তু এখন এই সহজ সরল উক্রেনীয় চাষীর বাঁশীর সুর শুনে তার মনে একটা নতুন অনুভূতি—সুরের সজীব অনুভূতি—বাড়তে লাগল ঈর্ষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে; আর সেই জার্মান চিরকুমারীটির কথা মন থেকে মুছে যেতে লাগল। অবশেষে শ্রীমতী পপেল্‌স্কায়া স্বামীকে একটি পিয়ানো কিনে দিতে বলল।

'যা চাও তাই হবে মণি', আদর্শ স্বামী বললেন। 'আমার ধারণা ছিল গানবাজনা তোমার ভালো লাগে না।'

সেই দিনই সহরে পিয়ানোর অর্ডার দেওয়া হল। কিন্তু কিনে সহর থেকে আনতে আনতে অন্তত দু তিন সপ্তাহ লাগবে।

আর প্রতি সন্ধ্যায় বাঁশীর ঝঙ্কৃত তলব চলল, ছেলেটি এমন কি অনুমতির অপেক্ষা না করেই দৌড়িয়ে যেত আস্তাবলে।

আস্তাবলের নিজস্ব গন্ধ শুকনো ঘাসের আর চামড়ার জিনের তীব্র গন্ধের সঙ্গে মিশেছে। স্থিরভাবে ঘাস চিবুত ঘোড়াগুলো, মাঝে মাঝে গামলার ঘাসে নাক দেওয়াতে

খসখস শব্দ উঠত। দম নেবার জন্য বাঁশী নামিয়ে রাখলে ইওহিম সন্ধ্যাবেলার স্তব্ধতায় সুস্পষ্টভাবে ভেসে আসত বাগান থেকে বীচের মর্মরধ্বনি। চুপ করে বসে থাকত পেতিয়া, যেন মন্ত্রমুগ্ধ, আকণ্ঠ সঙ্গীত পান করছে।

কখনো বাধা দিত না পেতিয়া। কিন্তু দু এক মিনিটের বেশী বাঁশী থেমে গেলে মুগ্ধ হয়ে শোনার ভাবের বদলে আসত অদ্ভুত, ব্যগ্র উত্তেজনা। হাত বাড়িয়ে দিত বাঁশীটির দিকে, কম্পমান আঙুলে সেটা ধরে নিজের মুখে লাগাত; কিন্তু ব্যাকুলতায় এত ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ত যে প্রথমে ক্ষীণ কাঁপা স্বর ছাড়া আর কিছু বেরোত না। পরে আস্তে আস্তে সহজ যন্ত্রটিকে আয়ত্তে আনতে শুরু করল। ইওহিম ওর আঙুলগুলোকে ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিয়ে দেখাত বিভিন্ন ধ্বনি কী করে বের করতে হয়; আর যদিও তার ছোট্ট হাতে সমস্ত ফুটোর নাগাল পেত না তবুও পেতিয়া অচিরেই শিখে নিল যে ওগুলোর স্বর কোথায়। তার কাছে প্রত্যেকটি ধ্বনির নিজস্ব চেহারা আর সত্তা ছিল, জানত কোন ফুটোয় ওটা থাকে, কী ভাবে বের করতে হয় ওটাকে। আর প্রায়ই, ইওহিম যখন সহজ কোন স্বর বাজাত তখন শিশুর আঙুলগুলো

গুরুর আঙুলের সঙ্গে এক ছন্দে নড়ত। পর্দার স্বরের, তাদের ক্রমপরম্পরা আর অবস্থিতির বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা তার হল।

৭

কেটে গেল তিন সপ্তাহ, অবশেষে পিয়ানো এল। আঙিনায় দাঁড়িয়ে পেতিয়া ব্যস্ততার সব শব্দ একাগ্রভাবে শুনছে। খুব ভারী হবে এই 'আমদানী করা গানবাজনাটি' কেন না লোকে যখন ওটাকে তুলছে তখন গাড়ীটা কিঁচ কিঁচ করে উঠল আর লোকগুলোও হাঁসফাঁস করছে, তাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস সজোরে টেনে টেনে পড়ছে। তারপর তারা গেল বাড়ীর দিকে, ভারী নিয়মিত পদক্ষেপে। আর প্রতি পদক্ষেপে তাদের মাথার উপরে কিছু একটা গুনগুন করছে, গোঙাচ্ছে, অদ্ভুতভাবে টুংটাং শব্দ করছে। তারপর তারা বসবার ঘরে রাখল ওই বিচিত্র 'গানবাজনা'টিকে আর আবার সেটা আগেকার মত গভীর গুনগুন ধ্বনি তুলল, যেন দারুন চটে কাউকে ভয় দেখাচ্ছে।

সবকিছু মিলিয়ে পেতিয়ার প্রায় ভীতির মত একটা অনুভূতি হল, নবাগতের প্রতি ঝোঁক হল না মোটেই—

যদিও জড় জিনিস কিন্তু স্পষ্টতই তিরিক্ষে মেজাজের ওটা। বাগানে বেরিয়ে গেল সে। সেখান থেকে শুনতে পেল না লোকেরা বসবার ঘরে কী করে যন্ত্রটাকে বসাচ্ছে, সহর থেকে ডাকা সুরজ্ঞ কী করে চাবিগুলো দেখে তারগুলো ঠিক করছে। সবকিছু ঠিক হয়ে গেলে মা ওকে ডেকে পাঠাল।

সহজ গ্রাম্য বাঁশীকে হারিয়ে দেবার উৎসবের পালা এবার আন্না মিখাইলভ্‌নার, সে প্রস্তুত। ভিয়েনা থেকে এসেছে তার পিয়ানো, বিখ্যাত ওস্তাদের তৈরী সেটা। এবারে পেতিয়া নিশ্চয়ই আস্তাবলে ছুটে যাওয়া বন্ধ করবে। আবার মাই হবে তার সমস্ত আনন্দের উৎস। খুসীর হাসি চোখে মা দেখল মাক্সিমমামার সঙ্গে ছেলে ভীরুভাবে ঘরে এল; ইওহিমের দিকে খোশমেজাজে মা তাকাল, 'বিদেশী গানবাজনা' শোনার অনুমতি সে চেয়েছিল, এখন দোড়গোড়ায় সলজ্জভাবে দাঁড়িয়ে আছে, মেঝের দিকে তাকিয়ে, চুল কপালে ঝুলছে। মাক্সিম আর ছেলে পিয়ানো শোনার জন্য বসেছে, যন্ত্রটির চাবিগুলোতে হঠাৎ মার হাত নেমে এল।

ফ্রাউলিন ক্লাপ্‌সের তত্ত্বাবধানে শ্রীমতী রাদেৎস্কায়ার

বোর্ডিং স্কুলে এই সুরটি সে চমৎকারভাবে রপ্ত করেছিল। খুব জোরালো আর রীতিমত জটিল রচনাটি, বাদকের আঙুল অত্যন্ত মোলায়েম না হলে চলবে না। স্কুল ছাড়ার আগে প্রকাশ্য পরীক্ষায় এই জটিল সুরটি বাজিয়ে আন্না মিখাইলভ্‌না প্রচুর প্রশংসা অর্জন করেছিল — আরো প্রশংসা পেয়েছিল তার শিক্ষয়িত্রী। আর নিশ্চিত না হলেও অনেকে সন্দেহ করেছিল যে ওটি বাজাতে যে পোনেরো মিনিট লেগেছিল সেই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই শান্তপ্রকৃতি শ্রী পপেলস্কিকে জয় করে ও। আজ তরুণীটি সেটা বাজাল অন্য ধরনের বিজয়লাভের আশায়, গ্রাম্য বাঁশীর মোহমুগ্ধ তার ছেলের ছোট্ট হৃদয়ে নিজের পুরানো জায়গা ফিরে পাবার প্রত্যাশায়।

এবারে কিন্তু সে নিরাশ হল। ভিয়েনা থেকে আনা পিয়ানোটি এক টুকরো উক্রেনীয় উইলোর সঙ্গে পারল না যুঝতে। সত্যি বটে, পিয়ানোটির অনেক গুণ: দামী কাঠ, সেরা তার, ভিয়েনিজ নির্মাতার অপূর্ব শিল্পকৌশল, সুরের জোরালো বিস্তার তাতে সম্ভবপর। কিন্তু উক্রেনীয় উইলোরও মিত্রের অভাব ছিল না: ওটি আছে নিজের পরিবেশে, চারিদিকে তার নিজের উক্রেনের আবহাওয়া।

ইওহিম ওটা ছুরি দিয়ে কেটেছিল, ভিতরটা পুড়িয়েছিল গনগনে গরম তারে, তারো আগে ওটা ছোট্ট একটি নদীর ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুলত, সে নদীটি শিশুটির চেনা আর প্রিয়। একই আলো হাওয়ায় উইলো আর শিশুটি দুজনেই বেড়ে উঠেছিল ততদিন, যতদিন না নদীর খাড়া পারে উক্রেনীয় বাঁশীবাদকের তীক্ষ্ণ নজরে ওটা পড়ে। তা ছাড়া সহজ গ্রাম্য বাঁশীটিকে হারানো বিদেশী যন্ত্রটির পক্ষে আরো কঠিন, কেননা আস্তে আস্তে ঘুম আসছে এমন অলস মুহূর্তে সন্ধ্যার রহস্যময় অস্ফুট সব শব্দ, বীচের নিদ্রালস মর্মরধ্বনি ভেদ করে বাঁশীটি প্রথমে অন্ধ শিশুকে গান শোনায়, উক্রেনের প্রকৃতি-সঙ্গত দেয় তাকে।

শ্রীমতী পপেল্‌স্কায়া ইওহিমের প্রতিযোগী হতে পারেনি। এটা সত্যি যে তার পাতলা আঙুলগুলো ইওহিমের চেয়ে তাড়াতাড়ি চলত, বেশী মোলায়েমও তারা, বাজাত আরো জটিল আর রঙীন সুর। কঠিন যন্ত্রটি ছাত্রীর সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনার জন্য ফ্রাউলিন ক্লাপ্‌স কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। কিন্তু সঙ্গীতের প্রতি টান ইওহিমের সহজাত, সে ভালোবেসে পেয়েছিল দুঃখ,

প্রেমে আর বেদনায় প্রকৃতির কাছে চেয়েছিল সান্ত্বনা। প্রকৃতিই তাকে সহজ সুর সব শেখায় : বনের অস্ফুট শব্দ, ঘাসে ভরা স্তেপের কোমল ফিস্‌ফিস্‌, আর শৈশবে দোলনায় দুলতে দুলতে শোনা পুরানো অসীম মধুর সব গান।

সত্যিই সাদাসিধে উক্রেনীয় বাঁশীটিকে হারানো ভিয়েনিজ পিয়ানোর পক্ষে খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। এক মিনিট বাজাতে না বাজাতেই মাক্সিমমামা সজোরে মেঝেতে তাঁর ক্রাচ ঠুকলেন, আর ফিরে তাকিয়ে আন্না মিখাইলভ্‌না দেখল তার শিশুর বিবর্ণ মুখে এসেছে ঠিক সেই ভাব, বসন্তে প্রথম বাইরে যাবার সেই স্মরণীয় দিনে ঘাসে পড়ে যাবার সময় যে ভাবটি এসেছিল।

করুণার সঙ্গে শিশুর দিকে তাকাল ইওহিম, আর জার্মান গানবাজনাটির দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, বেঢপ বুট মেঝেতে খটখটিয়ে লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

## ৮

নিজের ব্যর্থতায়, লজ্জায় মা অনেক অশ্রুমোচন করল। ‘মাননীয়া শ্রীমতী’ পপেল্‌স্কায়া, যাকে ‘উঁচু সমাজ’

উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করেছিল, তার কিনা এমন শোচনীয় পরাজয় হল। আর কার কাছে? ওই চাষাড়ে সহিস ইওহিম, আর তার ভোঁতা বাঁশীটার কাছে। তার ভাগ্যহীন কনসার্টের পরে ইওহিমের চোখে যে অবজ্ঞার আভাস দেখেছিল সেটা ভাবতেই রাগে তার মুখ টকটকে লাল হয়ে যেত। ওই 'নচ্ছার চাষা'টাকে সর্বান্তঃকরণে সে ঘৃণা করত।

তবুও প্রতি সন্ধ্যায় শিশুটি ছুটে আস্তাবলে চলে গেলে নিজের জানলা খুলে সে শুনত, প্রথম প্রথম অবজ্ঞাভরে রাগে, বাঁশীর সুর শুনে এই 'বুদ্ধিহীন পিঁ পিঁ'র হাস্যকর দিকটা ধরবার তালে থাকত। কিন্তু তারপর আস্তে আস্তে অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাস্যকর পিঁ পিঁতে তার মন বসতে শুরু করল, ব্যাকুল স্বপ্নভরা সুরগুলি ব্যগ্রভাবে শুনত সে। মাঝে মাঝে ব্যগ্রতাটা নিজের কাছে ধরা পড়লে ভাবত কীসের জন্য সুরগুলির এই আকর্ষণীশক্তি, তাদের রহস্যময় মোহের কারণটা কী। কালক্রমে প্রশ্নটির উত্তর মিলল, উত্তর মিলল গ্রীষ্মসন্ধ্যার নীলিমায়, গোধূলির আবছা সব ছায়ায়, প্রকৃতি আর বাঁশীর সুরের বিস্ময়কর ঐকতানে।

সম্পূর্ণ পরাজয় মেনে, মুগ্ধ হয়ে সে ভাবল, হ্যাঁ, এই সঙ্গীতের একেবারে নিজস্ব কিছু একটা আছে, আছে অনুভূতির আন্তরিক গভীরতা, কবিত্ব আর মোহ, যেটা শুধু তোতা-পাখীর মত মুখস্থ করে আয়ত্তে আনা যায় না।'

সত্যি, খুব সত্যি এটা। এই কবিত্বের রহস্যের উৎস হল বহুদিন-বিগত অতীতের সঙ্গে প্রকৃতির অদ্ভুত যোগসূত্র, অতীতের সাক্ষী হচ্ছে প্রকৃতি, প্রকৃতি অমর, মানুষের হৃদয়ের জন্য গান গাওয়া কখনো বন্ধ করে না সে। আর ইওহিম, কর্কশ, কড়া-পরা হাত, বেঢপ বুট-পরা একটা চাষা, অন্তরে বহন করত এই আশ্চর্য ঐকতান, প্রকৃতির এই আন্তরিক অনুভূতি।

আর এই গেঁয়ো সহিসের কাছে মনে মনে শ্রীমতী পপেল্স্কায়ার অভিজাত গর্ব নতি স্বীকার করল। ওর মোটা জামাকাপড়ের, ওকে ঘিরে আলকাতরার গন্ধের কথা সে ভুলে যেত, ওর বাঁশীর কোমল সুরে কিছুই মনে থাকত না, শুধু মনে পড়ত ওর সহৃদয় মুখ, ওর নম্র ধূসর চোখ, ওর ঝোলা গোঁফে আধোঢাকা হাসির লাজুক পরিহাস ভঙ্গী। অবশ্য মাঝে মাঝে রাগে আবার তার মুখ লাল হয়ে উঠত, এটা অনুভব না করে পারত

না যে ছেলেটির মন ফিরে পাবার লড়াইতে সে নিজে এই চাষীটির সমপর্য্যায়ে, তারই মাটিতে নেমেছিল, আর জিত হয়েছিল চাষীটির।

কিন্তু দিনের পর দিন মাথার উপরে গাছের পাতা নড়ে, আকাশের গভীর নীলে তারার আলো জ্বালে সন্ধ্যা, পৃথিবীর উপরে ছড়ায় হালকা, নীল-কালো সব ছায়া; আর দিনের পর দিন ইওহিমের সব সুর অল্পবয়স্কা মা'র অন্তরে ঢালে তাদের উষ্ণ বিষাদ। ক্রমশ তাদের শক্তির কাছে সে আত্মসমর্পণ করল, ক্রমশ বুঝল তাদের সহজ সরল অকৃত্রিম কাব্যের রহস্যটি।

৯

এটা সত্যি যে ইওহিমের শক্তির উৎস তার আবেগের অকৃত্রিমতা আর গভীরতা। আর মা—সে কি এধরনের আবেগের অংশীদার নয়? তবে কেন তার হৃদয় এত জ্বলে, তার হৃৎস্পন্দন এত অস্থির? কেন সে চোখের জল সামলাতে পারে না?

সত্যিকার অনুভূতি নয় কি সেটা—ভাগ্যহীন অন্ধ শিশুর জন্য যে উদ্দাম ভালোবাসা তার হৃদয় পূর্ণ করে

রেখেছে? তবুও শিশুটি ত তাকে ছেড়ে দৌড়য় ইওহিমের কাছে, আর ইওহিম তাকে যে আনন্দ দেয় সেরকম আনন্দ দেবার কোন উপায় সে জানে না।

তার পিয়ানো বাজানো শুনে ছেলেটির মুখে যে যাতনার ভাব এসেছিল সেটা মনে হলেই চোখে আসে উষ্ণ অশ্রুবিন্দু, আর মাঝে মাঝে কান্নায় বুক ভরে যায়, কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসে, চাপতে প্রায় পারে না।

বেচারা মা! সন্তানের দৃষ্টিহীনতা নিজের ব্যাধির মত হয়ে উঠেছিল, সে ব্যাধির কোন চিকিৎসা নেই। এটাই তার অত্যধিক, প্রায় অসুস্থ হৃদয়প্রবণতার জন্য দায়ী; ছেলেটি কষ্ট পাচ্ছে তার কোন লক্ষণ দেখলেই সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে এটাই তার দুর্ভাগা, আহত হৃদয়কে সহস্র সহস্র অদৃশ্য সূত্রে ছিন্নভিন্ন করত। আর এটার জন্যই চাষী বাঁশীবাদকের সঙ্গে তার বিচিত্র এই প্রতিযোগিতা — যেটা সাধারণত শুধু বিরক্তির কারণ হতে পারত — নিষ্ঠুর যাতনার আতিশয্যে ভোগায় তাকে।

দিন কাটতে লাগল, কিন্তু ওর যন্ত্রণার উপশম হল না। কিন্তু প্রত্যেক দিনই আনত স্পষ্টত লাভসূচক কিছু একটা। ক্রমশই সে বোধ করতে লাগল যে নিজের

অন্তরে সুর আর কাব্যের প্রতি সেই একই অনুভূতির জন্ম হচ্ছে, ইওহিমের বাজনায় যে অনুভূতি তাকে মুগ্ধ করে। আর এই নতুন অনুভূতির সঙ্গে এল নতুন আশা। কোন কোন সন্ধ্যায় হঠাৎ দৃঢ় বিশ্বাসে ত্বরায় বসত পিয়ানো'এ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হত যে যন্ত্রটির মুখর শব্দে কোমল বাঁশীটির সুর ডুবিয়ে দেবে। কিন্তু প্রতিবার ভীতি আর লজ্জার একটি বোধ তার প্রয়াসে বাধা দিত, আত্মবিশ্বাসকে পরিণত করত দ্বিধায়। মনে পড়ত ছেলের মুখে যন্ত্রণার সেই ভাব আর চাষীটার অবজ্ঞার দৃষ্টি— আর অন্ধকার ড্রয়িং-রুমে বসে লজ্জায় তার মুখ গরম হয়ে উঠত, পিয়ানোর চাবির উপরে ভীরু আকাঙ্খায় হাতদুটো শুধু সঞ্চালিত হত, চাবিগুলো স্পর্শ করতে সাহস হত না।

তবুও দিনের পর দিন অন্তরে নতুন একটি শক্তির বোধ তার বাড়ছে। আর শিশু যখন সন্ধ্যার আগে বেড়াতে যেত, কিম্বা বাগানের কোন দূর জায়গায় আপন মনে খেলত তখন বাজিয়ে দেখত। প্রথম উদ্যম কটি মনের মত হল না। যা অনুভব করল বাজালে সে শক্তি আসছে না। শব্দগুলোর সঙ্গে তার মেজাজের কোন মিল নেই মনে

হত। যা হোক, আস্তে আস্তে ক্রমশ বর্ধিষ্ণু শক্তিতে আর স্বাচ্ছন্দে মেজাজের রূপ দিতে সে পারল। চাষীটির শিক্ষাদান বৃথায় যায়নি; আর মায়ের তীব্র ভালোবাসা, তার ছেলের চিত্ত কীসে একেবারে জয় করে নিয়েছে তার সূক্ষ্ম বোধ, নানা সুরকে অবিলম্বে আয়ত্তে আনতে তাকে সাহায্য করল। এখন তার আঙুল মুখর জটিল সব 'রচনা' বাজায় না, পিয়ানোর চাবির সারি থেকে ভেসে আসে কোমল নানা সুর, করুণ উক্রেনীয় পুরানো গান, অন্ধকার ঘরগুলো ভরে যায়, তাদের করুণ টুংটাং শব্দ স্পন্দিত হয় মায়ের বুকে।

তারপর প্রকাশ্য লড়াই-এ নামার সাহস তার হল। জমিদারের বাড়ি আর ইওহিমের আস্তাবলে প্রতি সন্ধ্যায় চলল বিচিত্র প্রতিযোগিতা। ছায়াভরা খড়ের চালের আস্তাবল থেকে বাঁশীর মোলায়েম সুর ভেসে আসতে শুরু করলেই বাড়ির খোলা জানলা থেকে জবাব দিত নতুন, ভরাট, উচচকিত নানা ধ্বনি; চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় বীচের মধ্য দিয়ে দেখা যেত জানলাগুলো জ্বলজ্বল করছে।

প্রথমে শিশু আর ইওহিম কেউই 'কালোয়াতী' সঙ্গীতে কান দিত না, এত গভীর তাদের বিরাগ। ইওহিম বাঁশী বাজানো বন্ধ করলেই ভুরু কুঁচকিয়ে অধৈর্য-ভাবে শিশুটি বলত: 'হ্যাঁ, বাজাও তো, বাজাও!'

কিন্তু দু একদিন পর থেকেই ইওহিম বার বার থেমে যেতে লাগল। বার বার বাঁশী নামিয়ে ক্রমশ গভীর উৎসাহে শুনতে শুরু করল। ছেলেটিও কান দিতে আরম্ভ করল, বন্ধুকে আর বাজাবার তাগাদা দেয় না। তারপর একদিন ইওহিম ভেবেচিন্তে বলল:

'শোনো, শোনো, চমৎকার বাজাচ্ছে, তাই নয়?'

মুগ্ধ হয়ে শুনতে শুনতে ছেলেটিকে কোলে করে বাগান হয়ে ড্রয়িং-রুমের খোলা জানলার কাছে নিয়ে গেল ইওহিম।

সে ভেবেছিল 'মাননীয়া শ্রীমতী' নিজের আনন্দের জন্যই বাজাচ্ছে, আরো যে শ্রোতা আছে সেটা তার নজরে আসবে না। কিন্তু আন্না মিখাইলভ্‌নাও মাঝে মাঝে থেমে প্রতিদ্বন্দ্বী ইওহিমের বাঁশী শুনছিল, বাঁশীটা থেমে গিয়েছে লক্ষ্য করল। বুঝতে পারল এত দিনে তার জয় হয়েছে, আনন্দে হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হল।

জয় হয়েছে, ইওহিমের উপর লেশমাত্র রাগ আর রইল না। সে সুখী, বুঝতে পারল ইওহিমই সেই সুখের কারণ, ওই শিখিয়েছে কী করে শিশুকে ফিরে পাওয়া যায়। আর এখন, যদি নানা নতুন ধারণার ঐশ্বর্য ছেলেটিকে দিতে পারে তাহলে তাদের দুজনারই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত তাদের ওস্তাদ এই চাষী বাঁশীবাদকের কাছে।

১০

আড় ভেঙ্গে গেল। পরদিন কুণ্ঠিতভাবে কিন্তু সকৌতূহলে ছেলেটি সাহস করে ড্রয়িং-রুমে এল; অদ্ভুত সেই আগন্তুকটিকে তার বেজায় সরব আর খিট্‌খিটে মনে হয়েছিল, সেটা ওখানে আসন গাড়ার পর ড্রয়িং-রুমে সে আর ঢোকেনি। কাল সন্ধ্যায় নবাগতের গান তার বিরাগ দূর করে চিত্তজয় করেছে। পুরানো ভয়ের শুধু আভাসটুকু মুখে, পিয়ানোর দিকে গেল সে, দু এক পা দূরে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল। ঘরে আর কেউ ছিল না। পাশের ঘরে সোফায় বসে সেলাই করতে করতে ছেলেটির সংবেদনশীল মুখভাবের প্রতিটি পরিবর্তন, তার প্রতিটি চলন তারিফ করতে করতে মা রুদ্ধশ্বাসে দেখছে।

যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকে হাত বাড়িয়ে ছেলেটি পিয়ানোর ঝকঝকে গায়ে একবার হাত দিয়েই তক্ষুণি সঙ্কোচে সরে গেল। আর একবার চেষ্টা করল, আবার একবার, তারপর কাজে এসে যন্ত্রটিকে সাবধানে পরীক্ষা করতে লাগল, ওটার চারিদিকে ঘুরল, মেঝেতে হেঁট হল পায়াগুলো ছোঁবার জন্যে। অবশেষে পিয়ানোর চাবিতে আঙুল লাগল।

ক্ষীণ দ্বিধান্বিত সুর হাওয়ায় কাঁপছে। শব্দ মিলিয়ে গেল, মায়ের কানে আর কিছু যাচ্ছে না, তবুও অনেকক্ষণ ছেলেটি কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর একাগ্র প্রত্যাশার ভঙ্গীতে আর একটি চাবিতে চাপ দিল। তারপর চাবির সারিতে ক্ষিপ্রভাবে তার হাত চলল, উচ্চতম গ্রামে নতুন একটি সুর বেজে উঠল। প্রত্যেকটি ধ্বনি বেজে উঠছে, ক্ষীণ হয়ে কাঁপছে, মিলিয়ে যাচ্ছে, তারপর আবার অন্য চাবিতে হাত দিচ্ছে, শুনতে শুনতে তার মুখে আসছে শুধু গভীর আগ্রহ নয়, আনন্দের ভাবও। সঙ্গীতের উপাদানে, ভাবী সুরের আলাদা আলাদা উপকরণে শিল্পীসুলভ সূক্ষ্ম সংবেদনা তার, প্রতিটি ধ্বনির প্রকৃতি আনন্দের উদ্রেক করছে মনে হল।

কিন্তু প্রত্যেকটি ধ্বনির প্রকৃতিতে শব্দ ছাড়াও অন্যান্য বিশিষ্ট রূপ সে যেন অনুভব করছে। উচ্চ গ্রামে কোন স্পষ্ট, আনন্দপূর্ণ ধ্বনি তার আঙুলের চাপে উৎসৃত হলেই যেন লঘু শব্দটির ঊর্ধ্বগতির অনুসরণ করে আনন্দোজ্জ্বল তার মুখ উপরের দিকে উঠছে। বেজ নোট বাজালেই তার গভীর স্পন্দন ধরার জন্য মাথা নিচের দিকে হেলে পড়ছে, যেন ভাবছে এই গম্ভীর গুরুগুরু ধ্বনি নিচে, আরো নিচে গড়িয়ে যাবেই, মেঝের উপর দিয়ে গিয়ে বাড়ীর দূর সব আনাচেকানাচে অদৃশ্য হবে।

১১

সঙ্গীত নিয়ে এই সব পরীক্ষা মাক্সিমমামার প্রায় অসহ্য লাগত। ভাবলে আশ্চর্য লাগে, কিন্তু সঙ্গীতের প্রতি ছেলেটির এই স্পষ্ট ঝোঁক তিনি সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে পারেননি। এক দিক দিয়ে অবশ্য সঙ্গীতের প্রতি এই গভীর অনুরাগ নিঃসন্দেহে স্বাভাবিক প্রতিভার লক্ষণ, শিশুর অধিগম্য ভবিষ্যতের ইঙ্গিত সেটা। কিন্তু অন্য দিক দিয়ে সেরকম ভবিষ্যতের কথা

ভাবলেই বৃদ্ধ সৈনিকের মনে আসত অকারণ হতাশার ভাব।

'অবশ্য সঙ্গীতের অসীম শক্তি অস্বীকার করা যায় না', তিনি চিন্তা করলেন। 'সঙ্গীতে সাধারণের চিত্তজয় করা যায়। অন্ধ সুরকারের সঙ্গীত অনেক সৌখীন মহিলা আর লপেটা বাবু ভিড় করে শুনবে। ওদের বাজিয়ে শোনাবে হরেক রকমের... এই যেমন ওয়ালজ্ আর নকটার্ণ (সত্যি বলতে, সঙ্গীতের ব্যাপারে 'ওয়ালজ্' আর 'নক্টার্ণ' ছাড়া মাক্সিমমামার জ্ঞানের দৌড় আর ছিল না বললেই চলে), আর ওরা লেস লাগানো রুমালে চোখের জল মুছবে। গোল্লায় যাক সব। যা তিনি এতদিন আশা করে এসেছেন, এটা মোটেই তার মত নয়। কিন্তু— কী করা যায়? ছেলেটি অন্ধ। যেটা সবচেয়ে ভালো পারবে সেটাই করুক ও। সেটা শুধু যদি সঙ্গীত ছাড়া আর কিছুই না হয়, তাহলে অন্তত গানে মন দিক। সূক্ষ্ম শ্রবণশক্তিতে অর্থহীন সুড়সুড়ি, তার চেয়ে গানের প্রভাব গভীরতর। গানে গল্প বলে, লোকের মনে জোগায় চিন্তা আর হৃদয়ে সাহস।'

একদিন সন্ধ্যাবেলায় পেতিয়ার সঙ্গে আস্তাবলে গিয়ে

মাক্সিম বললেন, 'ওহে ইওহিম, শোনো, অন্তত একবার তোমার ওই বাঁশীটাকে ছাড়তে পারো না? ওটা মাঠে রাখাল বালকদের বা রাস্তার ছোঁড়াদের মানায়, কিন্তু তোমার ত বাপু সত্যিই বয়স হয়েছে, ওই বোকা মারিয়াটা তোমাকে যতই বোকা বানিয়ে থাক না কেন! ছি, লজ্জা হওয়া উচিত তোমার, একটা মেয়ে নাক সিঁটিয়েছে আর মনমরা হয়ে খাঁচার পাখীর মত বাঁশীতে ফুঁ দিয়ে চেঁচিয়ে মরছ!'

শ্রীযুক্ত মাক্সিমের অকারণ রাগ দেখে অন্ধকারে ইওহিম অল্প হাসল রোষান্বিত সারা বক্তৃতাটি শুনল কিছু না বলে, শুধু রাখাল বালকের উল্লেখে মৃদু প্রতিবাদ না করে পারল না।

'ওটা কিন্তু ঠিক নয়, কর্তাবাবু', সে বলল, 'সারা উক্রেনে এরকম বাঁশী আর কোথাও পাবেন না। রাখাল বালক! সিটি দেবার মত কল ওরা শুধু বানাতে পারে, আর কিছু নয়। এরকম একটা বাঁশী... শুনুন না একবার!'

আঙুল রাখার সমস্ত ফুটো বন্ধ করে অকটেভে দুটো টান বাজাল সে, স্পষ্ট, পূর্ণ ধ্বনি, তার মুখ খুসীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মাক্সিম থুতু ফেললেন।

'ছাই! হায় ভগবান! লোকটার বুদ্ধিশুদ্ধি যা একটু ছিল সব গেছে দেখছি! তোমার বাঁশীতে আমার কী এসে যায়? সব সমান—বাঁশী আর মেয়ে আর তোমার ওই মারিয়াটাও। গাইতে জানো ত গাও, পুরানো দিনের ভালো একটা গান।'

মাক্সিম ইয়াৎসেঙ্কো নিজে উক্রেনের লোক, চাষী আর বাড়ীর চাকরবাকরের সঙ্গে তার ব্যবহার ছিল সহজ, কোন ভড়ং ছিল না তাতে। প্রায়ই ধমকাতেন তাদের বটে, কিন্তু খারাপভাবে নয়। তাই তারা তাঁকে সমীহ করে চলত, কিন্তু সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত না, মোটেই।

'গান, বটে?' ইওহিম জবাব দিল। 'আর গানই নয় বা কেন? এক কালে গাইতাম, আর অন্যদের তুলনায় খুব খারাপ গাইতাম না। কিন্তু সে সব চাষাদের গান, আপনার ভালো লাগতে নাও পারে।' শেষের কথাটি বলার ধরনে ছিল শ্লেষের আভাস।

'বাজে বোকো না', বললেন মাক্সিম। 'ভালো গান একটা, তার সঙ্গে তোমার ওই পিঁ পিঁর যেন কোন তুলনা হয়। গাইতে যদি পার ত ভালো কথা। তাহলে

পেতিয়া, ইওহিম গাক্, আমরা শুনি। তবে একটা কথা তুমি বুঝতে পারবে কি না জানি না।'

'গানটা কী চাষীর ভাষায় হবে?' পেতিয়া জিজ্ঞেস করল। 'ও ভাষা আমি জানি।'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন মাক্সিমমামা। তাঁর স্বভাব অনেকটা রোমাণ্টিক, কসাক গৌরবের পুরানো দিনগুলি ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন একদা তিনি দেখতেন।

'ওগুলো চাষীদের গান নয়, বাছা', শিশুকে তিনি বললেন। 'বলিষ্ঠ স্বাধীন লোকেদের গান ওগুলো। সারা স্তেপে, দ্‌নেপ্র্‌, দানিয়ুব আর কৃষ্ণ সাগরের তীর বেয়ে তোমার মা'র পূর্বপুরুষেরা এই সব গান গাইতেন। একদিন সব তুমি বুঝতে পারবে। আমাকে এখন যেটা ভাবিয়ে তুলেছে', তিনি ভেবেচিন্তে বললেন, 'আমাকে এখন যেটা ভাবিয়ে তুলেছে সেটা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস।'

সত্যি, তাঁর আশঙ্কা যে অন্য বিষয়ে শিশুটির বোধের অভাব ঘটতে পারে। তিনি ভাবলেন পুরানো বীররসাত্মক গানের জ্বলজ্বলে সব ছবি মর্ম স্পর্শ করতে পারে শুধু দৃষ্টিনির্ভর সংস্কার মাধ্যমেই; আর এর অভাবে ছেলেটির দৃষ্টিহীন কল্পনা হয়ত লোক সঙ্গীতের উজ্জ্বল ভাষার

নাগাল পাবে না। কিন্তু মাক্সিমমামা একটি জিনিস ভুলে গিয়েছিলেন। প্রাচীন বায়ান্, উক্রেনীয় কব্জার আর বান্দুরিস্ত*—তারা অধিকাংশই কি দৃষ্টিহীন ছিল না? এটা সত্যি যে দৃষ্টিহীনতার দুর্ভাগ্যেরই জন্য ভিক্ষার উপায় হিসেবে বীণা কিম্বা বানদুরা অবলম্বন করতে তারা বাধ্য হত। কিন্তু এই ভবঘুরে গায়কদের সবাই শুধু ভিখারী ছিল না, শুধু অন্নের জন্যই কর্কশ কণ্ঠে গান গেয়ে ঘুরে বেড়াত না। তা ছাড়া, বৃদ্ধ বয়সেই যে সবাই অন্ধ হত, তা নয়। দৃষ্টিহীনতা দৃশ্য জগতকে অভেদ্য একটি পর্দার আড়াল করে মুছে দেয়, সে পর্দা অবশ্যই মনকে গভীরভাবে ভারাক্রান্ত করে, তার দুঃসহ বোঝা বুদ্ধির ব্যাঘাত ঘটায়। কিন্তু এমন সব জিনিস আছে যারা আসে বংশপরম্পরায়, অনেক জিনিস আসে দৃষ্টি ছাড়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। আর অন্ধকার হলেও, অন্ধের মন এদের নিয়ে গড়ে তোলে নিজস্ব সজীব একটি জগত, হয়ত ছায়াচ্ছন্ন সেটি, আকাঙ্খায় পূর্ণ আর বিষণ্ণ, তবু অস্পষ্ট কাব্যের অভাব নেই তাতে।

---

*বায়ান্, কব্জার, বান্দুরিস্ত—ভবঘুরে চারণ।

১২

খড়ের গাদায় বসলেন মাক্সিম, তাঁর সঙ্গে পেতিয়া। বেঞ্চে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল ইওহিম (এই ভঙ্গীটিই তার শিল্পী মেজাজের অনুকূল সবচেয়ে), আর মুহূর্তকাল ভেবে নিয়ে গাইতে আরম্ভ করল। দৈবাৎ কিম্বা সহজাত অনুভূতি, যে কোন কারণেই গানটি পছন্দ করে থাকুক না কেন সে, বাছাই-এর প্রশংসা করতে হয়। অনেক, অনেক দিন আগেকার ছবি গানটিতে:

অনেক, অনেক উঁচুতে
পাহাড়ের গায়ে নুয়েছে ধানকাটুরেরা,
পাকা ধান কাটছে...

উচিতভাবে গাওয়া হলে এই অদ্ভুত লোকগান একবার শুনলে আর কখনো ভোলা যায় না; অনেক, অনেক দিন আগেকার গান, উঁচু সুরে বাঁধা, মন্থর, আর ইতিহাসের নানা স্মৃতিতে বিষণ্ন। গানে কোন ঘটনার, কোন যুদ্ধ বা রক্তপাতের, কোন বীর কীর্তির উল্লেখ নেই। নেই প্রিয়তমার কাছে কোন কসাকের বিদায়গ্রহণের দৃশ্য, কোন দুঃসাহসী হামলার কাহিনী, অথবা দানিয়ুব

ধরে, কিম্বা নৌকোয় সমুদ্রের উত্তাল নীলে যাত্রার কথা। কোন উক্রেনীয় স্মৃতিতে মুহূর্তের জন্য জাগ্রত একটি ক্ষণস্থায়ী ছবি, ঐতিহাসিক অতীতের স্বপ্নের ভাঙ্গা টুকরো, আকাঙ্খায় ভরা কল্পনা একটি—এটা ছাড়া আর কিছু নেই। বর্তমানের দিনগত পাপক্ষয়ের মধ্যে হঠাৎ উঠেছে সেটা—ঝাপসা, কুয়াশাচ্ছন্ন, বিগত দিনের স্মৃতির স্বকীয় বিষণ্নতায় ভরা। সে দিন বিগত বটে, কিন্তু চিহ্ন রেখে গিয়েছে; সে অতীত মরেনি, যেখানে উঁচু, গম্ভীর সব ঢিবিতে কসাক বীরদের গোর দেওয়া হয়েছে, মধ্যরাত্রে যেখানে অদ্ভুত আলো ঘোরে আর শোনা যায় গভীর কান্না, সেখানে সে অতীত এখনো বেঁচে আছে। বেঁচে আছে উপকথায়, বেঁচে আছে ক্রমশই বিরল এই লোকগানটিতে:

অনেক, অনেক উঁচুতে পাহাড়ের গায়ে নুয়েছে
ধানকাটুরেরা, পাকা ধান কাটছে,
আর নিচে, অনেক নিচে, সবুজ পাহাড়ের পায়ে
ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে কসাকেরা
ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে কসাকেরা।

সবুজ পাহাড়ের গায়ে ধান কাটা হচ্ছে। নিচে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে কসাকেরা।

মাক্সিম ইয়াৎসেঙ্কো চারিপাশের পৃথিবীর কথা ভুলে গেলেন। গানের কথার সঙ্গে বিষণ্ন সুরটি এত অদ্ভুতভাবে মানিয়ে গিয়েছে যে দৃশ্যটি স্পষ্টভাবে চোখের সামনে এল: পাহাড়ের গায়ে সন্ধ্যার বিশুদ্ধ আলোয় শান্তিপূর্ণ সব ক্ষেত, ধান-কাটিয়েদের মৌন, আনত দেহ; আর নিচে ঘোড়সওয়াররা, তারাও মৌন, সার বেঁধে অগ্রসর, উপত্যকায় সন্ধ্যার ঘণীভূত ছায়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে।

সবায়ের আগে দরশেঙ্কো নিজে, ওদের নিয়ে যাচ্ছে,
নিজের কসাক সৈন্যদের নিয়ে যাচ্ছে,
নির্ভীক, সুষ্ঠুভাবে নিয়ে যাচ্ছে।

দীর্ঘ-বিলম্বিত সুরগুলি মুখর হয়ে কাঁপছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে, আবার বাজছে, অতীত ইতিহাসের নতুন, আরো নতুন লোকেদের নিয়ে আসছে অন্ধকার থেকে।

১৩

গান শোনার সময় ছেলেটিকে বিষণ্ন, চিন্তান্বিত দেখাচ্ছে। যখন পাহাড়ের গায়ে ফসল কাটার কথা এল তখন তার মনে হল সে নিজে দাঁড়িয়ে আছে নদীর ধার থেকে খাড়া ওঠা একটি উঁচু চেনা পাহাড়ে। নদীটিকে সে চিনত জলের ঝপঝপাত শব্দে, ঢেউগুলো প্রায় শোনা যায় না এমন ভাবে পাথরের গায়ে পড়ছে। আর ফসলের কথাও সে জানত। কাস্তের আর কাটা ধানের শিষের খসখস করে পড়ার শব্দ তার কানে এল।

কিন্তু যখন নিচে কী ঘটছে তার বর্ণনা শুরু হল, তখন অন্ধ শিশুটির কল্পনা তাকে পাহাড়ের চূড়া থেকে সটান উপত্যকায় নিয়ে গেল।

কাস্তের শব্দ মিলিয়ে গেল, কিন্তু ছেলেটি বুঝল যে ধান-কাটিয়েরা তখনো আছে ওপরে ওইখানে, পাহাড়ের গায়ে। তখনো তারা ওখানে, কিন্তু ও শুনতে পারছে না: কেননা ওরা অনেক উঁচুতে, পাইনগুলোর মত উঁচুতে, চেনা পাহাড়ের নিচে যে পাইনগুলোর খসখস শব্দ সে শুনতে পায়। আর এখানে নিচে, নদীর ধারে উঠল ঘোড়ার খুরের দ্রুত, সমান খটখট আওয়াজ।

অনেক, অনেক ঘোড়া, তাদের খুরের শব্দ নিচে, অন্ধকারে গুরুগুরু আওয়াজে এক হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে কসাকেরা।

আর কসাকেরা—হ্যাঁ, তাদের কথাও তার জানা ছিল। মাঝে মাঝে জমিদার বাড়ীতে বুড়ো ফেদ্‌কো আসত, সবাই তাকে 'বুড়ো কসাক' বলে ডাকে। অনেক বার অন্ধ শিশুটিকে তার হাঁটুতে বসিয়ে ফেদ্‌কো মাথায় থরথরে হাত বুলিয়েছে। আর পেতিয়া যখন চেনবার জন্য তার মুখে হাত দিয়ে দেখত, যেমন সবাই-এর সঙ্গে করে, তখন তার সূক্ষ্ম আঙুলে টের পেত গভীর বলি রেখা, লম্বা ঝোলা গোঁফ, আর বার্ধক্যসুলভ অশ্রুজলে ভেজা তোবড়ানো গাল। গান শুনতে শুনতে কল্পনা করল পাহাড়ের নিচের কসাকেরা ওই ধরনের লোকই হবে। ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছে তারা, ফেদ্‌কোর মত কুঁজো, বুড়ো আর লম্বা গোঁফওয়ালা শব্দহীন নিরাকার ছায়া সব অন্ধকারে এগোচ্ছে, কাঁদছে ফেদ্‌কোর মত, পাহাড়ের গা আর উপত্যকা আচ্ছন্ন-করা এই কান্নার গানের জন্যই হয়ত কাঁদছে: 'বেপরোয়া কসাক ছোকরা' সৈনিকের তামাকের পাইপের জন্য তরুণী বউ ছেড়ে চলেছে

যুদ্ধের দুর্যোগে, তার কথা আছে ইওহিমের করুণ গানে।

একবার ছেলেটির দিকে তাকিয়েই মাক্সিম নিঃসংশয় হলেন যে অন্ধ হলেও ওর সংবেদনশীল স্বভাব পরিপূর্ণ-ভাবে গানটির কাব্যে সাড়া দিচ্ছে।

# তৃতীয় অধ্যায়

## ১

মাক্সিমের নির্দেশ মত, ছেলেটি যাতে নিজে সবকিছু করতে পারে সেইভাবে তাকে ছেড়ে দেওয়া হল। তার ফল হল চমৎকার। বাড়ীর ভিতরে তাকে দেখে একে-বারেই অসহায় মনে হত না। বেশ স্বচ্ছন্দ তার ঘোরাফেরা, নিজের ঘর ছিম্‌ছাম্ আর জামাকাপড় খেলনা সব গুছিয়ে রাখত। যতখানি পারে ততখানি শারীরিক উদ্যমের ব্যবস্থাও মাক্সিম চালু করলেন। নিয়মিত ব্যয়ামের বন্দোবস্ত হল; আর যখন ছেলেটির পাঁচ বছর বয়স তখন তাকে মাক্সিম শান্তশিষ্ট নিরীহ ছোট্ট একটা ঘোড়া দিলেন। কী করে অন্ধ পেতিয়া ঘোড়ায় চড়বে সেটা প্রথমে মায়ের

মাথায় ঢোকেনি। একেবারে পাগলামী, সে ভাইকে বলল। কিন্তু মাক্সিম তার বুঝিয়ে বলার সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করলেন, আর দু তিন মাসের মধ্যে ইওহিমের সঙ্গে বেশ সহজভাবে ঘোড়ায় চেপে বেড়াতে শুরু করল পেতিয়া, শুধু যেখানে হঠাৎ বাঁক সেখানে ইওহিমের সাহায্য লাগত।

দৃষ্টিহীনতার জন্য তার শারীরিক উন্নতি যাতে ব্যাহত না হয় সে ব্যবস্থা এইভাবে করা হল, আর তার চরিত্রের উপরে দৃষ্টিহীনতার প্রভাব যথাসম্ভব কমানো হল। বয়সের অনুপাতে সে বেশ লম্বা, সুঠাম গঠন, রঙ স্বল্প পাণ্ডুর, চেহারা সূক্ষ্ম আর ভাবব্যঞ্জক। কালো চুলের জন্য তাকে আরো পাণ্ডুর দেখায়, আর বড়ো, কালো, প্রায় স্থির চোখজোড়া মুখে বিশিষ্ট একটি ভাব এনেছে যেটা প্রথম দৃষ্টিতেই লোকের চোখে পড়ে, তাদের ভাবায়। কপাল বরাবর ছোট একটি ভাঁজ; মাথা একটু হেলিয়ে এগিয়ে দেবার অভ্যাস; মাঝে মাঝে সুন্দর মুখে অন্ধকার-করা বিষাদের একটি ছাপ — এইগুলো হল তার দৃষ্টিহীনতার বাহ্য প্রকাশ। চেনাশোনা জায়গায় তার যাতায়াত স্বচ্ছন্দ দ্বিধাহীন। তবুও সহজেই বোঝা যেত যে ওর

স্বাভাবিক সজীবতা বাধাগ্রস্ত; আর মাঝে মাঝে তীব্র স্নায়ুবিক্ষোভে সে সজীবতা ফেটে পড়ত।

২

অন্ধ ছেলেটির জীবনে এখন প্রধান অবিসম্বাদিত ভূমিকা হল শব্দ-ধারণার, তার ধ্যান-ধারণা প্রধানত শব্দের মাধ্যমে দানা বাঁধে, তার মানসিক ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্র হল শব্দ। মোহময় সুর শুনে গানের কথা মনে থাকে, কথাগুলো সুরের বিষণ্ণতায়, কিম্বা আনন্দে কিম্বা স্বপ্নালুতায় ভাষা নেয় তার কাছে। আগের চেয়ে আগ্রহভরে প্রকৃতির নানা ধ্বনি শোনার জন্য কান পেতে রাখে সে। আর আশৈশব শোনা সুরগুলির সঙ্গে নিজের ছায়াচ্ছন্ন অনুভূতি মিশিয়ে মাঝে মাঝে সঙ্গীতে সে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে, স্বচ্ছন্দ নানা উপস্থিত-মত রচনায়, তার কোনটা তার নিজস্ব আর কোনটাই বা তার বিশেষ-জানা লোকগীত থেকে নেওয়া সেটা বাছাই করা শক্ত। এই দুটি উপাদান তার অন্তরে এত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে ও নিজেই নিজের বাজানোয় ওদের তফাৎ করতে পারত না। ওর মা পিয়ানো বাজাতে

শেখাচ্ছে, যা শেখাত চটপট রপ্ত করে নিত ও, কিন্তু ইওহিমের বাঁশীর মোহ ভুলে গেল না। পিয়ানোর আওয়াজ আরো সমৃদ্ধ, পূর্ণ আর জোরালো। কিন্তু ওটা বাড়ীতে আবদ্ধ, পক্ষান্তরে বাঁশীটাকে যেখানে খুসী নিয়ে যাওয়া যায়, আর ওর সুর স্তেপের মৃদু নিঃশ্বাসের সঙ্গে এমনভাবে একাকার হয়ে যায় যে পেতিয়া নিজেই সব সময় জানত না যে কিসে ঝাপসা নতুন সব ভাবে তার মন ভরিয়ে দিচ্ছে, বহুদূর থেকে আসা হাওয়া, না যে সুর সে নিজেই বাজাচ্ছে সেটা। তীব্র সঙ্গীতানুরাগ তার মানসিক বিকাশের মর্মস্থল হয়ে দাঁড়াল, জীবনে আনল আগ্রহ আর বৈচিত্র। সেটার সুযোগ নিয়ে মাক্সিম দেশের ইতিহাসের গল্প ছেলেটির কাছে করতেন, শব্দ দিয়ে গাঁথা সে গল্প। কোন গান ভালো লাগলে গানের বীরদের ও তাদের জীবনীর কথা, আর তার মাধ্যমে দেশের কথা, সে জেনে নিত। এরা আবার সাহিত্যে তার উৎসাহ জাগাল। যখন আট বছর বয়স ওর তখন মাক্সিম নিয়মিত পড়াশোনার প্রথম ব্যবস্থা করলেন। অন্ধদের শিক্ষাপদ্ধতির বিষয়ে অনেক পড়াশুনো মাক্সিম করেছিলেন, এবং ছেলেটি পড়াশোনায় খুব

আনন্দ পেত। জীবনে নতুন একটি উপাদান আনল সেটি, একটি স্পষ্ট ঋজু ভঙ্গী, যেটি সঙ্গীতের অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট অনুভূতিতে ভারসাম্যতা আনায় কাজ দিল।

এই করে নানা কাজে দিনগুলো বাঁধা, নানা নতুন অনুভূতির কোন অভাব নেই। যে কোন শিশুর মত পেতিয়ার জীবনও ভরাট দেখাতে পারত, এমন কি নিজের দৃষ্টিহীনতার কথা ও উপলব্ধি করে না বলে মনে হত।

তবুও ওর স্বভাবে বিচিত্র, বয়সোনুপযুক্ত বিষণ্নতা ছিল একটা, মাঝে মাঝে সেটা প্রকাশ পেত। মাক্সিমের মতে খেলার সঙ্গীর অভাবে এটা হয়, আর সে অভাব মেটাতে যা পারা যায় তাই তিনি করলেন।

গ্রামের বাচ্চাদের জমিদার-বাড়ীতে এসে খেলা করতে বলা হল। কিন্তু তাদের লজ্জা করত, বাধো-বাধো লাগত। অনভ্যস্ত পরিবেশে আর পেতিয়ার দৃষ্টিহীনতায় তাদের অস্বস্তি হত। ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকত তারা, কোনক্রমে সাহস সঞ্চয় করে ভীতভাবে এ-ওর সঙ্গে ফিস্‌ফিস্‌ করত, অন্ধ পেতিয়ার দিকে তাকাত সন্ত্রস্তভাবে।

বাড়ীর বাইরে, বাগানে কিম্বা মাঠেঘাটে তারা অস্বস্তি কিছুটা কাটিয়ে খেলা করত বটে. কিন্তু কেন জানি না পেতিয়া সব সময়ই ওদের খেলাধূলো থেকে বাদ পড়ত। হৈ হুল্লোড় শুনত শুধু সে, অনির্দিষ্ট বিষণ্ণতায়।

কখনো কখনো ছেলেদের জড় করে গল্প বলত ইওহিম। নানা ধরনের মজার মজার লোককাহিনী জানত ইওহিম। উক্রেনীয় লোককথার যত বোকা ভূত আর সেয়ানা ডাইনীর সঙ্গে শৈশব থেকে গ্রামের ছেলেরা পরিচিত, তারা গল্প করে উঠত, খুসীর গল্পে আর হাসিতে সময় কেটে যেত। গভীর আগ্রহে মন দিয়ে সব শুনত পেতিয়া, কিন্তু হাসত কদাচিৎ। হাসি তামাসার অনেক খানিই বুঝতে পারত না সে—তাতে অবাক হবার কিছু নেই; কেননা ও ত দেখতে পেত না ইওহিমের চোখের দীপ্তি, ওর মুখের ভাঁজে ভাঁজে মুখর হাসি, দেখতে পেত না কীভাবে ও লম্বা ঝোলা গোঁফ কোঁচকাচ্ছে।

৩

যে সব ঘটনার কথা বলছি তার অল্প কিছু দিন আগে পাশের একটি ছোট জমিদারীতে মালিকানা* বদল হয়েছিল। আগের ঝগড়ুটে জোতদারের সঙ্গে গরুতে লণ্ডভণ্ড করে দেওয়া কোন ক্ষেত নিয়ে এমন কি নিরীহ শ্রীপপেলস্কিকেও মামলা করতে হয়েছিল, তার বদলে জমিদারীতে এল প্রৌঢ় দম্পতি একটি, শ্রীইয়াস্কুল্স্কি আর তার স্ত্রী। দুজনকে জুড়ে বয়সের হিসেব করলে হবে একশ বছর, কিন্তু ওদের বিয়ে হয়েছিল মাত্র কয়েক বছর আগে। শ্রীইয়াস্কুল্স্কি সরকার হিসেবে অন্য লোকের সম্পত্তির তদারক করেছে অনেক দিন, দীর্ঘদিন ব্যাপী পরিশ্রম আর কষ্টের পরে জমিদারী ভাড়া নেবার মত

---

*দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রচলিত একটি খাজনা রীতি অনুযায়ী জোতদারের ('মালিকানা' বলা হত তাকে) স্থান অনেকটা নায়েবের মত ছিল। মালিককে নির্ধারিত টাকা সে দিত, সেটা দেওয়া হয়ে গেলে জমিদারী থেকে কতটা আয় করবে সেটা নির্ভর করত তার ক্ষমতা আর উদ্যমের উপরে।

পয়সা করতে পারে; আর ততদিন শ্রীমতী আগ্নেশ্‌কা ছিল কাউণ্টেস্‌ পতৎস্কায়ার সঙ্গে, অনেকটা বিনা মাইনের সেবিকা হিসেবে। সেই জন্য, অবশেষে শুভ মুহূর্ত আসাতে তারা দুজনে যখন প্রার্থনার বেদীর সামনে দাঁড়াল, তখন ফিট্‌ফাট্‌ বরের চুল আর গোঁফ কাঁচাপাকা হয়ে গিয়েছে, আর কনের লাজরক্ত মুখের উপরে কুঞ্চিত কেশগুচ্ছে পাক ধরেছে।

কিন্তু পাক-ধরা চুল তাদের দাম্পত্য সুখের অন্তরায় ঘটায়নি; তাদের প্রৌঢ় প্রেমের ফলে মাত্র একটি মেয়ে হয়, অন্ধ শিশুটির প্রায় সমবয়সী সে। বুড়ো বয়সে মাথা গোঁজবার মত, অন্তত সাময়িকভাবে নিজের বলতে পারে এমন বাড়ীর দখলে এসে বুড়ো বুড়ী তাতে গুছিয়ে বসে সহজ ও শান্তভাবে দিন কাটাতে লাগল, সে শান্ত নিভৃত জীবনযাত্রা পুরানো দিনে পরের কঠোর বেগার খাটার ক্ষতিপূরণ হয়ত করতে পারে। তাদের প্রথম উদ্যমের ফলাফল খুব ভালো হয়নি, ছোটখাটো নিজেদের জমিদারীতে আবার তাদের খাটতে হল। কিন্তু এখানেও নিজেদের মনের মত থাকতে কালবিলম্ব তারা একেবারেই করেনি। ঘরের কোণে আইভি দিয়ে ঘেরা আইকনগুলোর

সঙ্গে রাখা উইলোর ডাল আর 'ঝড় পিদিম', পাশে হামেশাই গাছ্গাছ্ড়ার ওষুধ মজুত, তা দিয়ে স্বামীর কিম্বা গ্রামের কারোর অসুখ হলে চিকিৎসা চলত। গাছ্গাছ্ড়ার বিশেষ একটি গন্ধে সারা বাড়ী ভরপূর; ছোট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শান্ত বাড়ীটির, কিম্বা সেখান-কার বাসিন্দে বৃদ্ধ দম্পতির, তাদের শান্ত, আজকালের পক্ষে অদ্ভুত জীবনযাত্রার কথা ভাবলেই কোন হঠাৎ-অভ্যাগতের কাছেও সে গন্ধ আবার ফিরে আসত।

আর বুড়ো বুড়ীর সঙ্গে থাকত তাদের একমাত্র সন্তান—ছোট্ট একটি মেয়ে, আকাশ-নীল চোখ তার, পাণ্ডুর দীর্ঘ চুল বিনুনী করে পিঠে ঝোলানো; তার মুখে চোখে সর্বাঙ্গে অসাধারণ ধীরস্থির ভাব, একবার দেখলেই যেটা তৎক্ষণাৎ সবায়ের মনে লাগে। যেন বাপ-মার প্রবীন প্রেমের প্রশান্তি সন্তানে বর্তেছে, প্রকাশ পেয়েছে তার শিশু-অসুলভ গাম্ভীর্যে, শান্ত নম্র চলনে, নীল চোখের গভীরে সদা জাগ্রত একটি চিন্তার ভাবে। আগন্তুকদের সামনে ছোট মেয়েটি কখনো ভীরু কিম্বা লাজুক ব্যবহার করত না, অন্য বাচ্চাদের এড়িয়ে চলত

না, তাদের খেলাধূলোয় নিজেই যোগ দিত। তবুও তার চালচলনে সর্বদাই থাকত সহৃদয় অনুকম্পার মত একটা ভাব, যেন এধরনের খেলাধূলোর দরকার তার নিজের নেই। আর এটা সত্যি যে একেবারে একলা থাকলেও তার আনন্দের কোন ব্যাঘাত হত না—একলা মাঠেঘাটে ঘুরত, ফুল তুলত কিম্বা পুতুলের সঙ্গে কথা বলত, সবকিছুই এমন ধীরস্থিরভাবে যে মাঝে মাঝে মনে হত ও ঠিক শিশু নয়, ক্ষুদে মহিলা বিশেষ।

৪

নদীতীরে টিলাতে একলা ছোট পেতিয়া। সূর্য অস্তগামী, সন্ধ্যা নিঃসাড়। গ্রাম থেকে ফিরে-আসা গরুগুলোর দূর ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। বাঁশী বাজাচ্ছিল পেতিয়া, এখন সেটা পাশে রেখে ঘাসে চিৎ হয়ে শুয়ে গ্রীষ্ম সন্ধ্যার মিঠে অবসাদে স্বপ্নালসভাবে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে। প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে, হঠাৎ নিচে লঘু পদধ্বনিতে নিঃস্তব্ধতা ভেঙ্গে গেল। শব্দে বিরক্ত হয়ে কনুই-এ ভর দিয়ে সে শুনতে লাগল। টিলার নিচে এসে পদশব্দ থামল। অচেনা পায়ের শব্দ।

শিশুকণ্ঠে কে জিজ্ঞেস করল, 'এই ছেলেটি, এখানে এইমাত্র কে বাঁশী বাজাচ্ছিল জানো?'

তার শান্তিভঙ্গ হওয়াটা পেতিয়া মোটেই পছন্দ করে না, জবাব দিল, অমায়িকভাবে নয় অবশ্য, 'আমি বাজাচ্ছিলাম...'

নিচে ছোট মেয়েটি বিস্ময়সূচক শব্দ করল।

'চমৎকার বাজাও ত!' সরলভাবে তারিফ করে বলল মেয়ের গলা।

কোন সাড়া দিল না পেতিয়া। কিন্তু অনিমন্ত্রিত অতিথিটি দাঁড়িয়েই রইল।

'আপনি চলে যাচ্ছেন না কেন?' তার চলে যাওয়ার শব্দের জন্য বিফলে প্রতীক্ষা করে অবশেষে পেতিয়া জিজ্ঞেস করল।

'চলে যেতে বলছ কেন?' মেয়েটি জবাবে বলল পরিষ্কার গলায়, তাতে সরল বিস্ময়ের ছাপ।

ওর শান্ত স্বর অন্ধ ছেলেটির কানে ভালোই লাগল, কিন্তু আগেকার মত বিরসভাবেই ও ঘোষণা করল:

'আমি যেখানে আছি সেখানে অন্য লোকের আসা পছন্দ করি না...।'

ছোট মেয়েটি হেসে উঠল।

'শোনো কথা একবার', বলল সে। 'হায় ভগবান। সারা দুনিয়াটা বুঝি তোমার, তাই যাকে ইচ্ছে হাঁটতে মানা করতে পারো?'

'মা সব্বাইকে বলে দিয়েছেন এখানে আমাকে কেউ যেন বিরক্ত না করে।'

'মা?' আস্তে আস্তে মেয়েটি বলল। 'কিন্তু আমার মা ত এখানে নদীর কাছে আমাকে আসতে বলেন...।'

ও যা করতে বলছে তার এত নাছোরবান্দা বিরোধিতা পেতিয়া আগে ক্বচিৎ দেখেছে। বাস্তবিকপক্ষে, সবাই যে-ভাবে ওর ইচ্ছে মেনে চলত তাতে ওর স্বভাবটা একটু বিগড়ে গিয়েছিল। আর এখন উত্তেজিত ক্রোধের ছায়া তার মুখে পড়ল। ঘাসের উপরে উঠে বসে উত্তেজিতভাবে বারবার চেঁচিয়ে বলতে লাগল: 'চলে যান আপনি, চলে যান!'

পরে কী হত বলা শক্ত; কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে শোনা গেল ইওহিমের গলা, পেতিয়াকে চা খেতে ডাকছে, আর ছেলেটি ছুটে চলে গেল।

'কী বাজে ছেলেটা!' আন্তরিক রাগে উচচারিত কথাগুলো তার কানে গেল।

৫

টিলাতে পরের দিন আবার এসে ঝগড়ার কথাটা পেতিয়ার মনে হল, বিরক্তির ভাব তার লেশমাত্র নেই। এমন কি ও আবার এলে পেতিয়ার ভালোই লাগত— ছোট্ট ওই মেয়েটা, যার গলা এত শান্ত আর মিষ্টি। শিশুর গলা এরকম আগে কখনো শোনেনি সে। তার চেনা বাচ্চারা ত হামেশাই চেঁচায়, জোরে হাসে, ঝগড়া করে কিম্বা কাঁদে। ও মেয়েটির মত এত মিষ্টিভাবে কথা ওরা কেউ কখনো বলে না। মেয়েটির সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করেছে বলে পেতিয়ার দুঃখ হল। ধরে নিল আর কখনো ও আসবে না।

সত্যিই এল না সে পুরো তিন দিন। চতুর্থ দিনে কিন্তু আবার পেতিয়া শুনল নিচে নদীতীরে ওর পায়ের শব্দ। কী একটা পোলীয় গান গুনগুন করতে করতে আস্তে আস্তে হাঁটছে। তীরে ওর পায়ের চাপে পাথরের নুড়ির করকর আওয়াজ।

টিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছে, পেতিয়া ডেকে বলল, 'ও, আবার আপনি বুঝি।'

উত্তর দিল না ছোট মেয়েটি। পাথরের নুড়ির করকর শব্দ বেজেই চলল। না থেমে এগিয়ে গেল সে, গুনগুন করে গাইছে যেরকম জোর-করা উদাসীনতায় তাতে পেতিয়া আঁচ করল সেদিনের অপমান এখনো ভোলেনি।

যাই হোক, টিলাটা পেরিয়ে একটু গিয়েই সে থামল। দু এক মুহূর্ত আর কোন শব্দ নেই, কিছু তোলা ফুল নিয়ে নাড়াচাড়া করছে মেয়েটি। ওর হঠাৎ থেমে যাওয়ায়, চুপ করে থাকায় অবজ্ঞার চেষ্টাকৃত ভাব, উত্তরের আশা করতে করতে পেতিয়া বুঝতে পারল।

সব ফুলগুলো সাজানো হল, তারপর উপরে তাকিয়ে গাম্ভীর্যপূর্ণভাবে মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, 'দেখতে পারছেন না, আমি?'

সহজ প্রশ্নটিতে অন্ধ পেতিয়ার বুক মুচড়িয়ে উঠল। চুপ করে রইল সে। শুধু মাটিতে ভর দেওয়া তার হাতদুটো হঠাৎ আক্ষেপে ঘাস চেপে ধরল।

কিন্তু আড় ভেঙ্গেছে।

'এত সুন্দর বাঁশী বাজাতে তোমাকে কে শিখিয়েছে?' না সরে, ফুল নাড়াচাড়া করতে করতে মেয়েটি জিজ্ঞেস করল।

'ইওহিম', জবাব এল।

'সুন্দর বাজাও তুমি! তবে, তুমি এত চটে যাও কেন?'

'আমি... আপনার ওপর চটিনি আমি', মৃদুস্বরে পেতিয়া বলল।

'বেশ, তাহলে আমিও রাগ করিনি। খেলবে?'

'খেলতে পারি না আমি', মাথা নিচু করে পেতিয়া বলল।

'খেলতে পারো না, কেন?'

'পারি না, সেই জন্য।'

'কিন্তু সত্যি, কেন?'

'কারণ', আবার পেতিয়া বলল অস্ফুট কণ্ঠে, মাথা তার আরো নিচু হয়ে গেল।

এর আগে নিজের দৃষ্টিহীনতার কথা এত সরাসরি কখনো তাকে বলতে হয়নি; মেয়েটির সরলতায়, সহজ অথচ নাছোরবান্দাভাবে তার প্রশ্ন করার ঢংএ আবার পেতিয়ার বুক মুচড়িয়ে উঠল।

মেয়েটি টিলেতে চড়ল।

তার পাশে ঘাসে বসে অনুকম্পার সুরে বলল, 'দারুণ

মজার ছেলে তুমি, আমাকে এখনো চেনো না বলে হয়ত। আলাপ হলে আর ভয় পাবে না। আমি ত কখনো ভয় পাই না, কাউকেও না।'

ওর পরিষ্কার সহজ কণ্ঠস্বর মিলিয়ে যেতে ডাঁটা আর পাতার খসখস শব্দ পেতিয়ার কানে এল। কোলে ফুলগুলো ঢেলেছে মেয়েটি।

'ফুল তুলছিলেন বুঝি?' ও জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় পেলেন?'

'ওইখানে', পিছনে মাথা ঘুরিয়ে মেয়েটি বলল।

'মাঠে?'

'না, ওইখানে।'

'বনে তাহলে। ওগুলো কী ফুল?'

'তুমি চেনো না বুঝি। কী অদ্ভুত ছেলে রে বাবা, সত্যি কী অদ্ভুত।'

একটা ফুল নিল পেতিয়া, আরো একটা। দ্রুত, হালকাভাবে পাতা আর ফুলের উপরে আঙুল বোলাল।

'এটা বাটারকাপ', বলল পেতিয়া, 'এটা ভায়োলেট।'

আর ঠিক এইভাবে অচেনা মেয়েটিকে জানার ইচ্ছে পেতিয়ার হল। ওর কাঁধে অল্প ভর দিয়ে, হাত দিয়ে

ওর চুল, ওর চোখ, ওর মুখের রেখা দেখল, মুখের অচেনা গঠন খুঁটিয়ে দেখার জন্য মাঝে মাঝে থামল।

এত তাড়াতাড়ি আর অকস্মাৎ ব্যাপারটা ঘটল যে প্রথমে বিস্ময়ে প্রতিবাদ করতে পারল না মেয়েটি। পেতিয়ার দিকে নির্বাক তাকিয়ে বসে রইল সে, বড়ো বড়ো চোখে প্রায় আতঙ্কের ছাপ। এই প্রথম ও লক্ষ্য করল যে ছেলেটির মধ্যে বেশ অদ্ভুত কী একটা আছে। ওর পাণ্ডুর কোমল মুখ যন্ত্রণাকর একাগ্রতায় ক্লিষ্ট, ওর স্থির দৃষ্টির সঙ্গে সেটা কেমন যেন খাপ খায় না। চোখ জোড়া তাকিয়ে আছে অন্য দিকে, নিজে যা করছে সেদিকে মোটেই না, অস্তগামী সূর্যের আলো অত্যন্ত বিচিত্রভাবে চোখে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। মুহূর্তের জন্য সব ব্যাপারটা মেয়েটির কাছে ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন মনে হল।

তারপর এক ঝটকায় নিজের কাঁধ ছাড়িয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল সে, চোখে তার জল, ক্রুদ্ধভাবে বলল, 'আমাকে এমন ভয় দেখাচ্ছো কেন, পাজী ছেলে কোথাকার, তোমার কী করেছি... কেন?...'

হতবুদ্ধি পেতিয়া বসে পড়ল। ওর মাথা হেঁট হয়ে গেল, লজ্জা আর বিরাগে ভরা অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে

ব্যথায় ওর হৃদয় ভরে গেল। পঙ্গুদের যে অবমাননা প্রায়ই ঘটে তার প্রথম অভিজ্ঞতা এটা পেতিয়ার: অভিজ্ঞতাটা এই যে, তার বিকলাঙ্গতা শুধু করুণার নয়, ভীতিরও উদ্রেক করতে পারে। যে তিক্ত ভাবে তার চিত্ত ভারাক্রান্ত স্পষ্টভাবে সেটার বিশ্লেষণ করতে সে পারল না অবশ্য; কিন্তু অনুভূতিটা স্পষ্ট নয়, পরিষ্কার সেটা বুঝতে পারছে না বলে যন্ত্রণার বিন্দুমাত্র লাঘব হল না।

তীব্র যন্ত্রণার আবেগে তার কণ্ঠরোধ হয়ে এল, ঘাসে শুয়ে পড়ে সে কেঁদে উঠল। কান্নার বেগ ক্রমশ বাড়ছে, ওর সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে, আরো কাঁপছে সহজাত গর্বে কান্না চাপার প্রাণপণ চেষ্টার দরুণ।

টিলা থেকে নিচে পালিয়ে গিয়েছিল মেয়েটি, কিন্তু ওর কান্না শুনে অবাক হয়ে ফিরে তাকাল। ঘাসে নতুন পরিচিত ছেলেটি উপুড় হয়ে শুয়ে ভীষণ কাঁদছে দেখে মেয়েটির দুঃখ হল। আস্তে আস্তে ফিরে গিয়ে ক্রন্দনরত ছেলেটির উপরে ঝুঁকে কোমল কণ্ঠে বলল:

‘শোনো, কাঁদছ কেন? ভাবছ সবাইকে বলে দেব? আচ্ছা বেশ, বলব না, কাউকে না। থামো এবার, কেঁদো না।’

অনুকম্পামাখা কথাগুলোয়, আদরের সুরে পেতিয়ার কান্না নতুন করে বেড়ে গেল। ওর পাশে নিচু হয়ে বসে একটু ইতস্তত করে মেয়েটি দু এক বার আস্তে আস্তে মাথায় হাত বোলাল। পরে শাসন করার পর বাচ্চাকে যেরকম মোলায়েমভাবে বারবার মা ভোলাবার চেষ্টা করে সে রকম-ভাবে পেতিয়ার মাথা তুলে ধরে মেয়েটি রুমাল দিয়ে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিতে লাগল।

বয়স্থাদের মত অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, 'এবার থামো, আর কেঁদো না, অনেক হয়েছে! আমার রাগ আর নেই, মোটেই নেই। বুঝতে পারছি আমাকে ভয় দেখাবার জন্য তুমি দুঃখিত।'

'তোমাকে ভয় দেখাতে আমি চাইনি', ফোঁপানি চাপার চেষ্টায় গভীর নিঃশ্বাস টেনে পেতিয়া বলল।

'বেশ, বেশ। আমার আর রাগ নেই। এরকম আর কখনো তুমি করবে না, আমি জানি তুমি আর করবে না।' ওর কাঁধ ধরে টানল মেয়েটি যাতে উঠে ও পাশে বসে।

ওর হাতের টান মেনে উঠল পেতিয়া। আগেকার মত সূর্যাস্তের দিকে মুখ করে বসেছে; আর সূর্যাস্তের রক্তবর্ণ আলোয় উদ্ভাসিত ওর দিকে তাকিয়ে আবার

মেয়েটির মনে হল যে অদ্ভুত কিছু একটা মুখে আছে। চোখের পাতা এখনো জলে ভিজে, কিন্তু পাতার পিছনে মণিদুটো আগেকার মতো অনড়। মাঝে মাঝে খিঁচুনিতে এখনো মুখ বিকৃত, তবু সঙ্গে সঙ্গে সেখানে কী গভীর, শিশু অসুলভ ভারী বিষাদের ছাপ।

'কিন্তু যাই বল না, ভয়ানক অদ্ভুত লোক তুমি', ভাবতে ভাবতে মেয়েটি বলল, কথার সুরে সহানুভূতি।

'অদ্ভুত নই আমি', জবাবে পেতিয়া বলল, যন্ত্রণায় ওর মুখ বিকৃত, 'আমি অদ্ভুত নই, আমি... আমি অন্ধ।'

'অ... ন্ধ?' উচ্চকণ্ঠে মেয়েটি বলল, গলা কেঁপে গেল, যেন তার বয়স্থাসুলভ ছোট্ট বুকে পেতিয়ার অস্ফুট উচ্চারিত মর্মান্তিক কথাটি দারুণ আঘাত হেনেছে, সে আঘাতের দাগ কোন সান্ত্বনার বুলিতে কখনো মুছবে না। 'অ... ন্ধ?' আবার বলল সে। গলা তার একেবারে ভেঙ্গে গেল, আর করুণার যে অদম্য আবেগ তার সমস্ত শরীর আচ্ছন্ন করেছে তার হাত থেকে যেন মুক্তি পেতে চেয়ে, হঠাৎ অন্ধ ছেলেটির গলা জড়িয়ে মুখে মুখ রাখল।

মর্মান্তিক আবিষ্কারের ধাক্কায় এই ক্ষুদে মহিলাটির স্বাভাবিক ধীরস্থির গম্ভীরভাব একেবারে উবে গেল, আহত, যন্ত্রণায় অসহায় শিশু হয়ে গেল সে। আর এবার সে-ই তীব্র শোকার্ত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

৬

কয়েক মুহূর্ত কাটল নিরবতায়।

কান্না থামাল মেয়েটি, শুধু মাঝে মাঝে চাপতে না পেরে ফুঁপিয়ে উঠছে। ঝাপসা অশ্রুজলে তাকিয়ে রইল অস্তগামী সূর্যের দিকে। মনে হল আস্তে আস্তে দিগন্তের কালো রেখার ওপারে ডুবে যেতে যেতে রক্তাভায় উজ্জ্বল শূন্যে সূর্য ঘুরছে আর ঘুরছে। জ্বলন্ত কিনারে তার আবার সোণা ঝলকাল, গনগনে আগুনের শেষ কয়েকটি ফুলকি বেরিয়ে এল আর হঠাৎ অন্ধকার দূর বনটি টেরাবাঁকা নীল রেখায় সামনে এল ভেসে।

নদী থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। আসন্ন সন্ধ্যার প্রশান্তি অন্ধ পেতিয়ার মুখে প্রতিবিম্বিত। মাথা নিচু করে বসে আছে সে, অনুকম্পার উষ্ণ প্রবাহে তাকে অবাক দেখাচ্ছে।

নিজের দুর্বলতার কারণ বোঝাতে গিয়ে অবশেষে মেয়েটি বলল, 'আমার এত খারাপ লাগছে তোমার জন্য।' তখনো কান্না চাপার চেষ্টা সে করছে।

গলা স্বাভাবিক যখন হল তখন অন্য কোন সামান্য বিষয়ে কথা ঘোরাবার চেষ্টা সে করল, যাতে দুজনেরই কোন মানসিক বিক্ষোভ না হয়।

'সূর্য অস্ত গিয়েছে', ভেবেচিন্তে বলল সে।

'সূর্য দেখতে কেমন আমি জানি না', বিষাদের স্বুরে পেতিয়া বলল। 'আমি শুধু, শুধু সূর্যকে অনুভব করতে পারি।'

'সূর্য কী জানো না?'

'কেমন জানি না।'

'কিন্তু... আচ্ছা, তোমার মা কেমন তাও জানো না তুমি?'

'মাকে জানি। অনেক দূর থেকেও ওঁর পায়ের শব্দ চিনতে পারি।'

'ঠিক বলেছো। চোখ বন্ধ করে আমিও মাকে চিনতে পারি সব সময়।'

কথাবার্তা অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

'জানো', একটু উৎফুল্লভাবে পেতিয়া বলল, 'সূর্যকে

আমি অনুভব করতে পারি যাই বল না কেন, অস্ত গেলে বুঝতে পারি।'

'কী করে বোঝ?'

'এই ধর... ওটা ... কী করে বুঝি তোমায় ঠিক বলতে পারছি না।'

বোধ হয় ওর ব্যাখ্যায় পুরোপুরি সন্তুষ্ট হয়ে মেয়েটি বলল, 'তাই বুঝি।'

দু এক মুহূর্ত দুজনেই চুপ করে রইল। পেতিয়াই প্রথমে কথা বলল। ঘোষণা করল সে, 'পড়তে পারি আমি। আর শীগ্‌গিরই কালিকলম দিয়ে লিখতে শিখব।'

'কিন্তু কেমন করে...' শুরু করে মেয়েটি হঠাৎ থেমে গেল, মনে হল ব্যাপারটা আলোচনা করা ঠিক উচিত হবে না। কী জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিল পেতিয়া বুঝতে পারল।

বলল, 'বিশেষ ধরনের একটা বই আমি পড়ি, আঙুল দিয়ে।'

'আঙুল দিয়ে? আমি ত কখনো সেটা পারব না! সত্যি বলতে এমনিতেই আমার পড়া খুব খারাপ, চোখ দিয়ে পড়লেও। বাবা বলেন লেখাপড়া শেখা মেয়েদের পক্ষে মুস্কিল।'

'আমি ফরাসীও পড়তে পারি।'

'ফরাসী? আঙুল দিয়ে? তুমি ত খুব চালাক', আন্তরিক প্রশংসায় মেয়েটি বলল। 'কিন্তু শোনো, আমার ভয় করছে তোমার ঠাণ্ডা লাগবে। নদী থেকে বেজায় জোলো কুয়াশা আসছে।'

'আর তোমার কী হবে?'

'আমার ভয় করছে না, কুয়াশায় আমার কিছু এসে যাবে না।'

'তাহলে আমারও ভয় করছে না। মেয়েদের যদি ঠাণ্ডা না লাগে তাহলে ছেলেদেরই বা কেন লাগবে? মাক্সিমমামা বলেন পুরুষের কিছুতে কখনো ভয় পাওয়া উচিত নয়, শীত, ক্ষিধে, ঝড়বৃষ্টি কিছুতে নয়।'

'মাক্সিমমামা? ক্রাচে ভর দিয়ে যিনি হাঁটেন? বীভৎস দেখতে তিনি!'

'মোটেই না, ওঁর যথেষ্ট দয়ামায়া আছে।'

'কিন্তু দেখতে বীভৎস উনি', আরো জোর দিয়ে, দৃঢ়তর বিশ্বাসের সঙ্গে মেয়েটি বলল, 'তুমি ওঁকে চোখে দেখতে পাও না, তাই জান না।'

'আমি না জানলে আর কে জানবে? উনি আমাকে পড়ান।'

'চাবকান তোমাকে?'

'কক্ষণো নয়। এমন কি বকেন না কক্ষণো।'

'তাহলে ত ভালো। অন্ধ ছেলেকে লোকে মারবে কেন? মারলে পাপ হয়।'

'উনি কিন্তু কাউকেই চাবকান না', বলল পেতিয়া, একটু অন্যমনস্কভাবে। ইওহিম আসছে, তার পায়ের শব্দ ওর সূক্ষ্ম শ্রবণশক্তিতে ধরা পড়েছে।

পর মুহূর্তেই জমিদার-বাড়ী আর নদীর মাঝখানে একটা অল্পোচ্চ জায়গায় দেখা গেল সহিসের দীর্ঘ দেহ, সন্ধ্যার স্তব্ধতা ভেঙ্গে শোনা গেল তার উচ্চ কণ্ঠের ডাক:

'পে... তি... য়া!'

উঠে পড়তে পড়তে মেয়েটি বলল, 'তোমাকে ডাকছে'।

'জানি, কিন্তু বাড়ী ফিরতে ইচ্ছে করছে না।'

'কিন্তু যেতে ত হবেই। কাল আবার এসে তোমার সঙ্গে দেখা করব। বাড়ীর লোকেরা এখন তোমার জন্য বসে আছে। তাছাড়া আমাকেও বাড়ী ফিরতে হবে।'

## ৭

কথা ঠিক রাখল মেয়েটি, এত আগে এল যে পেতিয়া ভাবতেই পারেনি। পরের দিন সকালে মাক্সিমমামার সঙ্গে পড়াশুনো করছে, হঠাৎ মাথা তুলে এক মুহূর্ত কী শুনল, তারপর উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞেস করল, 'আমি একটু বাইরে যাবো কি। বাচ্চা মেয়েটা এসেছে।'

'কোন বাচ্চা মেয়েটা?' অবাক হয়ে মাক্সিম জানতে চাইলেন, পেতিয়ার পিছু পিছু তিনি দরজার দিকে গেলেন।

সত্যিসত্যি আগের দিনের বাচ্চা মেয়েটি গেট দিয়ে উঠোনে ঢুকছে। ঠিক সে সময় আন্না মিখাইলভ্না উঠোন হয়ে যাচ্ছিল, কোন রকম ইতস্তত না করে মেয়েটি সোজা তার কাছে এল।

'কী চাও তুমি, বাছা?' কোন কাজে তার কাছে মেয়েটিকে পাঠানো হয়েছে ভেবে আন্না মিখাইলভ্না জিজ্ঞেস করল।

কিন্তু খুব গম্ভীরভাবে ক্ষুদে মহিলাটি তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'অন্ধ ছেলেটি আপনারই, না?'

'হ্যাঁ, বাছা, আমারই', জবাবে বলল আন্না মিখাই-লভ্‌না, আগন্তুকের নিঃসঙ্কোচ হাবভাবে, তার নীল চোখের স্পষ্ট চাউনিতে সে মুগ্ধ হয়েছিল।

'তাহলে ঠিকই। মা ওর সঙ্গে দেখা করতে মত দিয়েছেন। দেখা করতে পারি কি?'

ঠিক সেই মুহূর্তে দৌড়িয়ে পেতিয়া নিজেই এসে পড়ল, বারান্দায় দেখা গেল মাক্সিমকে।

অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা করে পেতিয়া বলল, 'যে বাচ্চা মেয়েটির কথা তোমায় বলেছিলাম এই সে, মা, কিন্তু একটা কথা, আমি ত এখন পড়াশুনো করছি।'

'তোমার মামা মত দেবেন, অন্তত এই বার', মা বলল, 'ওঁকে জিজ্ঞেস করব না কি?'

কিন্তু ক্ষুদে মহিলাটির বেশ ঘরোয়া ভাব তখন, আঙিনা দিয়ে মন্থরভাবে মাক্সিম ক্রাচে ভর দিয়ে তাদের কাছে আসছেন, ইতিমধ্যেই তাঁর দিকে এগিয়ে চলেছে সে, আর করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে পিঠ-চাপড়ানো তারিফ করার ভঙ্গীতে বলল: 'অন্ধ বাচ্চা ছেলেটিকে বেত না মেরে ভালোই করেন আপনি। ও আমাকে বলেছে।'

'সত্যি বলছেন না কি, দেবী?' পরিহাস করে অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলেন মাক্সিম, মেয়েটির ছোট্ট হাত নিজের বড় হাতে চেপে। 'আপনার মত সুন্দরী মহিলার প্রশংসা যে পেয়েছি তার জন্য আমি আমার ছাত্রের কাছে অসীম কৃতজ্ঞ।'

মেয়েটির ছোট্ট হাতে হাত বুলোতে বুলোতে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন তিনি। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল মেয়েটি, ওর অকুণ্ঠিত স্পষ্ট দৃষ্টি নারীবিদ্বেষীটির চিত্ত অচিরে জয় করে ফেলল।

মুখে বিচিত্র হাসির রেশ, বোনের দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'দেখছ আন্না, আমাদের পেতিয়া বন্ধুবান্ধব জোটাতে নিজেই শুরু করেছে। আর তোমাকে স্বীকার করতেই হবে যে... অন্ধ হলেও খাসা পছন্দ ওর, তাই না?'

'মাক্স, তুমি কী বলতে চাইছ?' কঠোরভাবে অল্পবয়সী মা জিজ্ঞেস করল, মুখ তার লাল হয়ে গিয়েছে।

'কিছুই না, ঠাট্টা করছিলাম', তাড়াতাড়ি বললেন মাক্সিম, বুঝতে পারলেন যে তাঁর বেফাঁস কথা আঁতে ঘা দিয়েছে, নানা অনাগত সমস্যার বিষয়ে মায়ের অন্তরের

গভীরে যে দুর্ভাবনা চাপা আছে সেটাকে প্রকাশ্য করেছে।

আন্না মিখাইলভ্‌নার মুখ আরো লাল হয়ে উঠল। হেঁট হয়ে হঠাৎ গভীর স্নেহে মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরল সে। তার ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গন সত্ত্বেও মেয়েটি আগেকার মতই স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, সামান্য আশ্চর্য হয়েছে সে, এই যা।

৮

এইভাবে দুটি জমিদারীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সূত্রপাত হল। বাচ্চা মেয়েটি, এভেলিনা তার নাম, প্রতিদিন কিছুটা সময় পেতিয়াদের ওখানে কাটাত; আর কিছু দিন পরেই মাক্সিমমামার কাছে পড়াশুনো শুরু করল। প্রথমে তার বাবা শ্রীইয়াস্কুলস্কি এতে মোটেই খুসী হয়নি। প্রথমত, তার মতে, বাড়ীর খাইখরচের আর ধোপার হিসেব ঠিক রাখতে পারলেই মেয়েদের যথেষ্ট শিক্ষিত বলা চলে। দ্বিতীয়ত, গোঁড়া ক্যাথলিক সে, তার মনে হত অস্ট্রিয়ানদের সঙ্গে লড়াই করাটা শ্রী-মাক্সিমের উচিত হয়নি, বিশেষ করে 'আমাদের পিতা

পোপ' যখন স্পষ্টভাবে সেটা বারণ করেছিলেন। শেষ কথাটি হল, সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত ঈশ্বর একজন আছেন, আর ভলতেয়র এবং তার মতানুবলম্বী সবাই নরকের টগবগে আগুনে জ্বলবেই—এ ভবিতব্যতা যে শ্রীমাক্সিমও এড়াতে পারবেন না অনেকে তাই মনে করত। আলাপ পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হলে ইয়াস্কুলস্কিকে অবশ্য মানতেই হল যে অত্যন্ত কলহপটু অবিশ্বাসী এই লোকটা বেশ, বিদ্যাবুদ্ধিও তার কম নয়; অবশেষে আপোষে রাজী হল ইয়াস্কুলস্কি।

তবুও অন্তরের গভীরে তার কেমন যেন অস্বস্তি রয়ে গেল। তাই জমিদার-বাড়ীতে মেয়েকে প্রথম পাঠের জন্য এনে গম্ভীরভাবে বহ্বারম্ভে ওর পড়াশুনোর প্রবর্তন না করে সে পারল না—প্রবর্তন-বাক্যগুলি অবশ্য যতটা মাক্সিমের উদ্দেশ্যে ততটা শিশুর জন্য নয়।

'তাহলে, এভেলিনা', মেয়ের পিঠে হাত রেখে, কিন্তু তার শিক্ষকের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে সে শুরু করল, 'সর্বদাই মনে রাখবে আকাশে আমাদের ঈশ্বরের কথা এবং রোমে তাঁর পরমপবিত্র পোপের কথা। এটা বলছি আমি, ভালেন্তিন ইয়াস্কুলস্কি, আর আমার কথা সর্বদাই

বিশ্বাস করবে, কেননা আমি তোমার পিতা। সেটা প্রিমো।'

এ সময়ে মাক্সিমের দিকে যে দৃষ্টি নিক্ষেপ ইয়াস্কুলস্কি করল বিশেষ তাৎপর্য ছিল তার। লাতিন ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হল দেখানো যে পাণ্ডিত্য তার অজানা নয়, আর সহজে ঠকানো যাবে না তাকে।

'সেকাণ্ড', বলতে লাগল সে, 'আমি অভিজাত বংশের লোক, আমাদের বংশের গৌরবময় কুলজী-চিহ্নগুলোর উপরে আছে নীল জমিতে আঁকা পবিত্র একটি ক্রুশ। ইয়াস্কুলস্কিরা সবাই বীরপুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁদের অনেকে আবার হাতিয়ার ছেড়ে প্রার্থনা পুস্তক হাতে ধরেন, ধর্ম বিষয়ে কখনো তাঁরা অজ্ঞ ছিলেন না, সুতরাং আমাকে বিশ্বাস করা তোমার কর্তব্য। এ ছাড়া আর সব বিষয়ে, orbis terrarum, অর্থাৎ পার্থিব সমস্ত ব্যাপারে মাক্সিম ইয়াৎসেঙ্কো মহাশয়ের কথা শুনে চলবে, তাঁর যোগ্য ছাত্রী হবে।'

হেসে এই বাক্যগুলির জবাবে মাক্সিম বললেন, 'কিছু ভাববেন না, ভালেন্তিন মহাশয়। গারিবাল্‌দির জন্য লড়াই করতে বাচ্চা মেয়েদের আমি দলে টানি না।'

## ৯

একসঙ্গে পড়াশুনো করায় দুটি শিশুরই লাভ হল। পেতিয়া এগিয়ে ছিল অবশ্য, কিন্তু সেটা প্রতিযোগিতামূলক একটি ভাবের অন্তরায় হল না। তাছাড়া এভেলিনাকে পড়াতে পেতিয়া অনেক সময় সাহায্য করত; আর এভেলিনাও নানা উপায় বের করত যাতে করে অন্ধ শিশুর পক্ষে আপাতকঠিন অনেক জিনিস পেতিয়া বুঝতে পারে। আর এভেলিনার উপস্থিতি পড়াশুনোয় নতুন একটা উৎসাহ পেতিয়াকে যোগাল, আনল একটি প্রীতিকর সজীবতা, তাতে তার মানসিক চর্চার সক্রিয়তা বাড়ল।

সব দিক দিয়েই ওদের বন্ধুত্ব ভাগ্যের আশীর্বাদের মত। একেবারে একলা থাকতে পেতিয়া আর চেষ্টা করত না। নতুন সাহচর্য পেয়েছে সে, বড়োরা যতই তাকে ভালোবাসুক না কেন সেরকম সাহচর্য কখনো তাকে দিতে পারত না, সান্নিধ্য পেয়েছে একজনের যার অস্তিত্ব এমন কি তার মাঝে মাঝে আসা স্তব্ধ মানসিক সংহতির মুহূর্তগুলিতেও প্রীতি দিত তাকে। দুটি শিশু সব সময়েই

একসঙ্গে ঘোরে, কখনো পেতিয়ার টিলাতে বেড়াতে যায়, কখনো বা নদীতীরে। পেতিয়া বাঁশী বাজালে শিশুসুলভ উচ্ছ্বাসে এভেলিনা শুনত। বাঁশীটা রেখে দিলে কথা বলতে শুরু করত এভেলিনা, চারিধারের সমস্ত কিছু সম্বন্ধে শিশুর নানা ভাবের কথা। অন্ধ সঙ্গীটি সব বুঝতে পারে এমন ধরনের ভাষায় অবশ্য তার দেখা সমস্ত কিছু এভেলিনা প্রকাশ করতে পারত না। কিন্তু ওর সহজ বর্ণনাভঙ্গী, ওর কথা বলার সুর, যা কিছু বলছে তার সার আর বিশেষ স্বাদটুকু পর্যন্ত হৃদয়ঙ্গম করায় পেতিয়ার সহায়তা করত। হয়ত বলছে রাত্রির অন্ধকারের কথা, জোলো ঠাণ্ডা অন্ধকারে পৃথিবী কীভাবে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে তার কথা, ওর গলার গভীর রহস্যময় সুরে অন্ধকারকে পেতিয়া যেন শুনতে পেত। ছোট্ট গম্ভীর মুখ আকাশের দিকে ফিরিয়ে হয়ত ও বলল, 'কেমন একটা মেঘ ওখানে, ওই যে ওইখানে, প্রকাণ্ড কালো একটা মেঘ এদিকে আসছে!' আর ও যেন অনুভব করত মেঘের হিম স্পর্শ, এভেলিনার কণ্ঠস্বরে শুনতে পেত মহাশূন্যে গুড়ি দিয়ে অগ্রসর সেই ভয়াবহ জানোয়ারটার গুরুগুরু ধ্বনি।

# চতুর্থ অধ্যায়

১

দুঃখ আর করুণা নিত্যসহচর যে প্রেমের তার কঠোর তপস্যার জন্যই যেন জন্মেছে এমন কয়েকজন আছে; মনে হয় দুর্ভাগাদের সাহায্য করা তাদের কাছে জৈব প্রয়োজনীয়তা, জীবনের মূল কথা। প্রকৃতি তাদের দেয় একটি শান্ত সমাহিত ভাব, সেটা না থাকলে এই ধরনের প্রাত্যহিক অনাটকীয় বীরত্ব সম্ভব হত না। তাদের সমস্ত আবেগ, উচ্চাশা আর অভীপ্সা প্রকৃতির গুণে কোমলতর, স্বার্থকেন্দ্রিক সমস্ত আশা আর কামনা তাদের চারিত্রের প্রধান ধর্মের কাছে মাথা নত করে। আশেপাশের লোকেদের মাঝে মাঝে মনে হয় এরা নির্জীব, ভাবাবেগবিহীন, প্রয়োজনাতিরিক্ত এদের সংযম। পার্থিব জীবনের প্রগলভ উষ্ণ ডাকে সাড়া না দিয়ে কর্তব্যের দুর্গম পথে অবিচলিতভাবে এগিয়ে চলে এরা, প্রবল ব্যক্তিগত সুখের সড়কেও এরা সমান অবিচলিত থাকতে পারে, এদের মনে হয় নির্লিপ্ত আর মহান, তুষারাবৃত

পর্বতচূড়ার মত। যা কিছু পার্থিব আর ঘৃণ্য, জঞ্জালের মত পড়ে থাকে তাদের পায়ের নিচে। রাজহাঁস যেমন ডানা থেকে ময়লা ঝেড়ে ফেলে তেমন এদের তুষার-শুভ্র পোষাকেও কুৎসা আর নিন্দার দাগ লেগে থাকে না।

প্রকৃতি কিম্বা শিক্ষাগুণ এ ধরনের লোক ঘনঘন সৃষ্টি করে না। বাছাই করা কয়েকজনকে মাত্র প্রকৃতির অবদান এটা, সহজাত গুণ কিম্বা প্রতিভার মত। এর লক্ষণ অল্প বয়সেই ধরা পড়ে, পেতিয়ার ছোট্ট বন্ধুর মধ্যে এর মধ্যেই সেটা দেখা দিয়েছে। অল্পদিনের মধ্যেই পেতিয়ার মা বুঝতে পারল যে শৈশবের এই বন্ধুত্ব তার অন্ধ ছেলের কত কাজে লাগবে। মাক্সিমও সেটা বুঝে ভাবলেন যে ছেলেটির যা কিছু অভাব সেটা এখন মিটে যাওয়াতে ওর মানসিক বিকাশের ধারা হবে মসৃণ, অব্যাহত, হয়ত কোন বিঘ্ন কখনো ঘটবে না।

কিন্তু সেটা ভুল ধারণা, ভয়ানক ভুল ধারণা সেটা।

২

পেতিয়ার বয়স যখন কম তখন কয়েক বছর মাক্সিম ভেবেছিলেন যে ওর মানসজীবনের চালনা সম্পূর্ণভাবে

তাঁর হাতে। অবশ্য ওর মানসিক বৃদ্ধির সবকিছুর মূলে হয়ত শিক্ষকের প্রত্যক্ষ প্রভাব সেই, তবু কোন নতুন ঘটনা কিম্বা আধ্যাত্মিক লাভ যে তাঁর নজর আর প্রভাব এড়াবে না সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু পেতিয়ার বয়ঃসন্ধির সময় যখন এল তখন দেখা গেল শিক্ষকের সব উচ্চস্বপ্ন অলীক। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই নতুন কিছু না কিছু ঘটত, মাঝে মাঝে চমক লাগাত তারা, আর অন্ধ ছেলেটির নতুন সব ধ্যানধারণার উৎস যে কোথায় মাক্সিম তার খেই পেতেন না। ছেলেটির সত্তার গভীরে অজানা কী একটা শক্তি সক্রিয়, স্বাধীন আধ্যাত্মিক বিকাশের অপ্রত্যাশিত নানা লক্ষণ প্রকাশ করছে সেটা। তাঁর অধ্যাপনা বিদ্যাবিধিতে বাধা দিচ্ছে এরা, এদের রহস্যময় গতিবিধির কাছে মাক্সিম ভক্তিভরে মাথা না নুইয়ে পারলেন না। মনে হল ছেলেটিকে নতুন নানা ধারণা আর প্রত্যয় যোগাবার জন্য প্রকৃতির হাতে আছে কোন উদ্দীপক, দৈব প্রকাশের কোন উপায়; এসব ধারণা সম্ভবত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে অন্ধ পেতিয়া অর্জন করতে পারত না। সব দেখেশুনে জীবনের মূল ধারার সীমাহীন অনবিচ্ছিন্ন পরম্পরার কথা মাক্সিম

উপলব্ধি করলেন — নানা ব্যক্তিজীবনের পরম্পরায় সহস্র খুঁটিনাটিতে সে ধারা বয়ে চলেছে।

মাক্সিম যখন বুঝলেন ছেলেটির মানসজীবনের ভার সম্পূর্ণভাবে তাঁর হাতে নেই, তাঁর ইচ্ছাশক্তি, তাঁর প্রভাবমুক্ত অন্য কিছু একটি তাঁর ছাত্রের জীবনে সক্রিয়, তখন প্রথমে তিনি ভয় পেলেন। ছেলেটির ভবিষ্যৎ ভেবে তিনি ভয় পেলেন, ভয় পেলেন যে এমন সব কামনা আর স্পৃহা ওর জীবনে হয়ত আসবে যাতে ছেলেটির দুঃখকষ্টের আর অতৃপ্ত আকাঙ্খার সীমা থাকবে না। আর ছেলেটির অবগতির নতুন সব উৎস কী খুঁজতে লাগলেন মাক্সিম, তাঁর আশা পেতিয়ার ভালোর জন্য তাদের মুখ বন্ধ করে দিতে পারবেন।

পেতিয়ার অদ্ভুত সব হঠাৎ-আলোর ঝলকানি মা'র চোখেও পড়ল। একদিন সকালে ত পেতিয়া দৌড়িয়ে তার কাছে এল, এত উত্তেজিত তাকে খুব কমই দেখা গিয়েছে।

'মা, মা', চেঁচিয়ে বলল সে, 'একটা স্বপ্ন দেখেছি।'

'কী দেখেছ, বাছা?' মা জিজ্ঞেস করল, বিষণ্ন সন্দেহের একটা সুর সে চাপতে পারল না।

'আমি দেখলাম... তোমাকে দেখলাম, আর মাক্সিম-মামাকে। আর ... আর... সবকিছু দেখলাম। স্বপ্নটা এত সুন্দর, মা, এত সুন্দর।'

'তাই নাকি? আর কী দেখেছ, পেতিয়া?'

'মনে পড়ছে না।'

'আমাকে মনে পড়ছে?'

'না', ইতস্তত করে পেতিয়া বলল, 'না, মনে করতে পারছি না, কিছুই না।'

মুহূর্তকাল কোন কথা নেই।

'কিন্তু, যাই হোক, দেখেছিলাম, সত্যি দেখেছিলাম', পেতিয়া বলল।

ওর মুখ অন্ধকার হয়ে এল, দৃষ্টিহীন চোখে চকচক করছে এক ফোঁটা জল...।

এরকম ঘটনা কয়েকবার ঘটল। আর ঘটবার পরে প্রতিবার ক্রমশ তার অশান্তি আর অস্থিরতা বেড়ে চলল।

৩

ড্রয়িং-রুম থেকে অদ্ভুত শব্দ ভেসে আসছে একদিন, আঙ্গিনা দিয়ে যেতে যেতে মাক্সিম শুনলেন, পেতিয়ার

সঙ্গীত শিক্ষার সময় তখন। অদ্ভুত শেখা বটে! মাত্র দুটি ধ্বনি। প্রথমটি উচ্চ গ্রামের সবচেয়ে জোরালো ধ্বনি, বাজালেই কাঁপছে বারবার, তারপর দ্রুতভাবে ঘুরেফিরে সেটাকে বাজানো, হচ্ছে তারপর হঠাৎ নিচু গুরুগুরু বেজের ধ্বনি—সেটাও বাজছে বারবার। এই বিচিত্র বাজনার অর্থ কী? তাড়াতাড়ি ঘুরে মাক্সিম ওদিকে গেলেন, এক মুহূর্ত পরে ড্রয়িং-রুমের দরজা খুলে যে দৃশ্যটি দেখলেন তাতে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়লেন।

ন'বছরের পেতিয়া মায়ের পায়ের কাছে ছোট একটা টুলে বসে। ওর পাশে গলা বাড়িয়ে অস্থিরভাবে এদিক ওদিকে মুখ ফেরাচ্ছে একটা বাচ্চা বক, পোষ মানিয়ে ইওহিম সেটা পেতিয়াকে দিয়েছিল। পেতিয়া নিজের হাতে ওকে খাওয়ায়, পাখীটা সব সময় ওর পিছু পিছু ঘোরে। এখন এক হাতে ওটাকে ধরে আছে সে, অন্য হাতে ওর পালকে গলায় পিঠে পাখায় আস্তে আস্তে আদর করছে। পেতিয়ার মুখে একাগ্র মনোযোগের চিহ্ন। আর পিয়ানোর সামনে বসে ওর মা—উত্তেজনায় রক্তিম মুখ, চোখ বিষাদাচ্ছন্ন—একটি চাবিতে বারবার দ্রুতভাবে আঘাত করছে আর বেরিয়ে আসছে সেই অবিরাম কম্পমান

সর্বোচ্চ গ্রামের ধ্বনি। বাজাতে বাজাতে পায়ের কাছে বসা ছেলের মুখ একাগ্রভাবে দেখছে, সে দৃষ্টিতে ব্যথার ছাপ। আর যখন বকটাকে আদর করতে করতে পেতিয়ার হাত এল ডানার সেই ধারে যেখানে পালকের তীব্র শাদা সমান তীব্র কালোয় হঠাৎ শেষ হয়েছে, তখন মার হাত ঝড়ের মত পিয়ানোর সমস্ত চাবির উপর দিয়ে চলে গেল, নিচু বেজের ধ্বনি গুরুগুরু শব্দে ঘরের মধ্যে উঠল।

দুজনেই এত নিবিষ্টচিত্ত যে মাক্সিমকে কেউ দেখতে পায়নি। অবশেষে বিস্ময়বিহ্বলতা কাটিয়ে মাক্সিম বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন:

'আন্না! এর মানে কী?'

ভাই-এর সন্ধানী চোখে চোখ পড়াতে আন্না মাথা নিচু করল, মাস্টারের কাছে দুষ্টুমী হাতেনাতে ধরা পড়লে বাচ্চা মেয়েরা যেমন করে।

বিব্রতভাবে আন্না বোঝাবার চেষ্টা করল, 'মানে, পেতিয়া বলছে ওর মনে হচ্ছে যে বকটার পালকের রঙে কিছু তফাৎ আছে, কিন্তু তফাৎটা কী সেটা ঠিক বুঝতে পারে না। ও নিজেই কথাটা বলেছে, সত্যিই

বলেছে, আর আমার মনে হয় সত্যিই ও এটা অনুভব করে ...।'

'অনুভব না হয় করে, কিন্তু তাতে কী হবে?'

'কিছুই না, তবে ... আমি ভাবলাম যে দুটো ধ্বনির তফাৎ দেখালে রঙের তফাৎ অন্তত কিছুটা বুঝতে ওর সুবিধে হবে। চোটো না মাক্সিম, আমার সত্যিই মনে হয় দুটোর মধ্যে খুব সাদৃশ্য আছে।'

এই নতুন ধারণায় মাক্সিম এত বিস্মিত হলেন যে প্রথমে কিছু বলতে পারলেন না। আন্নাকে তার পরীক্ষামূলক বাজনা আবার বাজাতে বলে ছেলেটির মুখের কৃচ্ছ্রভাব কোন কথা না বলে দেখলেন, মাথা নাড়ালেন।

পেতিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে মাক্সিম বোনকে বললেন, 'আন্না, যা বলছি বোঝার চেষ্টা কর। যে সব প্রশ্নের জবাব কখনো ওকে খুসী ক'রে, সম্পূর্ণভাবে খুসী ক'রে কখনোই দিতে পারবে না সেই সব প্রশ্ন ওর মাথায় না জাগানোই ভালো।'

'কিন্তু কথাটা ও নিজেই বলেছিল, সত্যিই বলেছিল', বলল আন্না মিখাইলভনা।

'তাতে কিছু এসে যায় না। নিজের দৃষ্টিহীনতা

মেনে নেওয়া ছাড়া ওর গত্যন্তর নেই। আর আলো ইত্যাদির মত জিনিস যাতে ও ভুলে যায় তার চেষ্টা করা আমাদের উচিত। নিষ্ফল প্রশ্ন করায় বাইরের যে সব জিনিস, তা রুধতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি। আর যদি এ ধরনের সব উত্তেজনা-জোগানো জিনিস থেকে ওকে আমরা মুক্ত করতে পারি তাহলে নিজের সংবেদনের অভাব কখনো ও অনুভব করবে না — ঠিক যেমন পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে বলে আমরা ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের জন্য হা-হুতাশ করি না।'

'কিন্তু সেটা করি আমরা', মৃদুকণ্ঠে আন্না মিখাই-লভনা বলল।

'আন্না।'

'করি আমরা', জোর দিয়ে সে বলল। 'অসম্ভবকে প্রায়ই চাই আমরা ...।'

তবুও, ভাই-এর উপদেশ সে মেনে নিল। কিন্তু এবারে ভুল হল মাক্সিমের। প্রকৃতি নিজেই যে শিশুটির মনে অনেক আবেগের চারা বসিয়েছে, বাইরের সমস্ত উদ্দীপকের আঁটঘাট বন্ধ করার আগ্রহে সে কথাটির হদিস তিনি করেননি।

৪

কে একজন বলেছিলেন, ‘চোখ হচ্ছে অন্তরাত্মার প্রতিচ্ছবি।’ জানলার সঙ্গে চোখের তুলনা করা বোধহয় আরো সঠিক হবে, সে জানলা দিয়ে মানুষের প্রকৃতি বাইরের পৃথিবীর রঙেরসে ভরা উজ্জ্বল জীবন্ত সব ছাপ গ্রহণ করে। দৃষ্টিগ্রাহ্য সংবেদনের উপরে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের কতটা নির্ভর করে কে বলতে পারে সেটা?

একটি মানুষের মধ্যে দিয়ে নানা জীবনের অন্তহীন পরম্পরা অতল অতীত থেকে চলেছে অসীম সুদূর ভবিষ্যতে, মানুষ সে পরম্পরায় যোগসূত্র মাত্র। এরকম একটি যোগসূত্রের বেলায়, একটি অন্ধ শিশুর বেলায় নিষ্ঠুর নিয়তি মনের জানলা বন্ধ করে দিল। সমস্ত জীবন তাকে কাটাতে হবে অন্ধকারে। কিন্তু এর মানে কি এই, যে সব তারে মন দৃষ্টিগ্রাহ্য অনুভূতিতে সাড়া দেয় সে সব তার অন্তরে একেবারে ছিঁড়ে গিয়েছে, সারানো যাবে না তাদের কখনো? না, সত্যি নয় সেটা। তার অন্ধকার জীবনেও অন্তরের আলোক গ্রহণক্ষমতা বেঁচে

থাকবে, চলবে পুরুষ পরম্পরায়। অন্ধ পেতিয়ার মন স্বাভাবিক মানুষের মতই, মানুষের সাধারণ নানা বৃত্তিতে বঞ্চিত সে নয়। আর যেহেতু প্রত্যেকটি বৃত্তিতে অন্তর্নিহিত থাকে সংসাধনের বাসনা, সে হেতু তার অন্ধকার অন্তঃকরণেও আছে অদম্য আলোক তৃষ্ণা।

তার সত্তার অতল কোন গভীরে ছিল উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া নানা শক্তি, পরখ করা হয়নি তাদের 'সম্ভাবনা'র ছায়াচ্ছন্ন লোকে তারা তখনো নিষ্ক্রিয়, আলোর প্রথম রেখায় সত্বর সাড়া দেবার জন্য উন্মুখ তারা। জানলাগুলো কিন্তু বন্ধই রয়ে গেল। শিশুটির ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত ছিল। আলো কখনোই দেখবে না সে! সমস্ত জীবন কাটাতে হবে অন্ধকারে!...

আর সেই অন্ধকার নানা ছায়ামূর্তিতে চঞ্চল।

দুঃখ দারিদ্র্যে জীবন কাটাতে হলে হয়ত দুঃখকষ্টের বাহ্যিক উৎসতেই তার সমস্ত ভাবনাচিন্তা নিযুক্ত থাকত। কিন্তু পরিবারের লোকেরা তাকে এমনভাবে রাখত যেন গায়ে আঁচড়টি না লাগে, শান্তিতে বিনা ঝামেলায় থাকতে পারে যাতে তার ব্যবস্থা করেছিল। আর এখন তার হৃদয়ের প্রশান্তিই অন্তর্নিহিত অনটনটা বেশী করে জাগিয়ে

তুলল। চারিদিকের স্তব্ধ অন্ধকার ভেদ করে তার মনে জাগল একটি অস্ফুট কিন্তু অবিরাম অভাববোধ, সে অভাব ক্রমাগত নিজেকে মেটাতে চাইছে, চাইছে রূপ দিতে তার সত্তার গভীরে নিষ্ক্রিয়, অপ্রয়োজিত নানা শক্তিকে।

আর এর থেকে এল নানা অদ্ভুত অস্পষ্ট প্রত্যাশা আর আবেগ, শৈশবে আকাশে ওড়বার যে ইচ্ছা আমরা প্রত্যেকেই অনুভব করি, যার সঙ্গে জড়িত থাকে শৈশবসুলভ নানা অদ্ভুত স্বপ্ন, অনেকটা তার মত।

আবার এদের থেকে এল নানা সহজাত মানসিক প্রচেষ্টার আবেগ, অন্ধ ছেলেটির মুখে জিজ্ঞাসার ক্লিষ্ট ছাপে তারা প্রকাশ পেল। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া অথচ অপ্রয়োজিত, দৃষ্টিগ্রাহ্য অনুভূতির 'সম্ভাবনা' ছেলেটির মনে আনল বিচিত্র সব ছায়ামূর্তি—নিজেই জানে না সে—কী একটা পাবার অন্ধকার নিরাকার অস্পষ্ট যন্ত্রণাদায়ক প্রয়াস।

ব্যক্তিগত 'ব্যতিক্রমের' বিরুদ্ধে প্রকৃতির অন্ধ প্রতিবাদ সেটা, যে বিশ্বজনীন নিয়ম পেতিয়ার বেলায় খাটেনি তার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস সেটা।

৫

আর সেই জন্য বাইরের উদ্দীপনা সব দাবিয়ে রাখতে মাক্সিম যতই চেষ্টা করুন না কেন, ভিতরের চাপ, অতৃপ্ত আকাঙ্খার চাপ তিনি কখনো দমন করতে পারবেন না। বড়ো জোর তাঁর সাবধানতার ফলে পেতিয়ার এই অভাববোধের স্ফুরণ পিছিয়ে যাবে, অন্ধ শিশুর যন্ত্রণা অল্প বয়সেই মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে না। শেষ পর্যন্ত পেতিয়ার অভিশপ্ত নিয়তিকে কিন্তু ঠেকানো যাবে না। দৃষ্টিহীনতার যা কিছু কঠোর পরিণাম ভুগতেই হবে তাকে।

আর নিয়তি পেতিয়ার উপরে উদ্যত, জগদ্দল বৈশাখী মেঘ যেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর সহজাত সজীবতাতে ভাটা পড়ল; আর অস্পষ্ট কিন্তু বিরামহীন বিষণ্নতায় ওর অন্তঃকরণ মুখর হয়ে উঠল, চারিত্রে পড়ল তার ছাপ। নতুন তীব্র যে কোন অনুভূতিতে তার প্রথম শৈশবের সেই উচচকণ্ঠ হাসি বিরল হয়ে এল। জীবনের হাসি ঠাট্টা আর ফূর্তি খুব কম তার কাছে ধরা পড়ে, কিন্তু দক্ষিণের এই দেশে প্রকৃতিতে আর লোকের গানে যে ছায়াচ্ছন্ন ব্যাকুল বিষণ্নতার সুর বাজে, অদ্ভুতভাবে

ধরতে পারত সেটা পেতিয়া। 'বাইরের খোলা মাঠে কবরগুলো হাওয়ার সাথে সাথে ফিস্‌ফিস্‌ করছে' কেমন, গানটি শুনলেই তার চোখ জলে ভরে যেত, ভাল লাগত বাইরের মাঠে নিজে গিয়ে সেই ফিস্‌ফিসানি শোনা। নিরালা থাকার আগ্রহ ক্রমশ বেড়ে চলল, পড়াশুনো শেষ হয়ে গেলে একলাই ঘুরে বেড়াত, পারলে বাড়ীর কেউই তার নিঃসঙ্গতায় বাধা দিত না। হয়ত স্তেপের উঁচু জায়গায় প্রাচীন কোন গোরস্থানে কিম্বা নদীর ধারে সেই টিলাতে, কিম্বা তার বহু-চেনা সেই উঁচু পাহাড়ে চলে যেত সে, বসে বসে কান পেতে শুনত পাতার মর্মর, ঘাসের শির শির, স্তেপের উপরে হাওয়ায় অস্ফুট দীর্ঘশ্বাস হয়ত, আর কোন শব্দ নেই। তার মনের গভীরতম ভাবের সঙ্গে এই সব শব্দ বিশেষ একটি ধারায় মিশে যেত। প্রকৃতিকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা যতটুকু ছিল তাই দিয়ে সে বাইরের এই সব জায়গায় প্রকৃতিকে সব চেয়ে ভালো করে বুঝত, বুঝত সম্পূর্ণভাবে, গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত। এখানে অসমাধেয় নানা সমস্যার ভারে প্রকৃতি তাকে বিব্রত করত না। এখানে হাওয়া তার অন্তরের গভীরে বিনা বাধায় ছড়িয়ে পড়ছে, ঘাস যেন

কোমল সান্ত্বনার স্বরে ফিস্‌ফিস্‌ করছে; আর যখন চারিদিকের কোমল ঐকতানের সঙ্গে তার নবীন হৃদয় এক সুরে বাঁধা, আমেজ লাগছে প্রকৃতির উষ্ণ সোহাগে, তখন পেতিয়া অনুভব করত তার অন্তরে কী যেন জেগে উঠছে, ভাসিয়ে দিচ্ছে তার সমস্ত সত্তাকে। ঠাণ্ডা ভিজে ঘাসে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকত তখন, চোখ দিয়ে জল পড়ত, কোমল সে অশ্রু, তিক্ত নয়। কিম্বা হয়ত মাঝে মাঝে বাঁশী বাজাত, তার মনোভাবের আর স্তেপের প্রশান্ত সংহতির সঙ্গে মেলানো নানা ব্যাকুল সুরে ভুলে যেত সমস্ত পৃথিবীর কথা।

কোন মানুষের শব্দ তার আবেশ হঠাৎ ভেঙ্গে দিলে শ্রুতিকটু বেসুরো পর্দার মত লাগত। আর সেটা স্বাভাবিক। এই সব মুহূর্তে আত্মার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় যারা শুধু তাদের সঙ্গেই সাযুজ্য হতে পারে; আর এরকম সমবয়সী বন্ধু পেতিয়ার একটিই ছিল—কাছের জমিদার-বাড়ীর ছোট সেই মেয়েটি, চুল যার সোনালী।

ওদের বন্ধুত্ব বেড়েই চলল। সম্পূর্ণভাবে দেওয়া-নেওয়ার ভাব ছিল সে বন্ধুত্বে। নিজের প্রশান্তি, জীবনের আনন্দের শান্ত উপভোগশক্তি এভেলিনা তার সহচরকে

দিল। চারিদিকে ছড়ানো যে জীবন তার নতুন সূক্ষ্ম নানা সুর বুঝতে অন্ধ পেতিয়াকে সাহায্য করল সে। আর পেতিয়া—পেতিয়া তাকে দিল নিজের বিষাদ। যেন পেতিয়ার দুঃখের প্রথম উপলব্ধি এই ছোট্ট মহিলাটির বুকে গভীর নিষ্ঠুর দাগ কেটেছে—ক্ষতস্থান থেকে ছোরা সরিয়ে নিলে রক্ত ঝরে সে মারা যাবে। নদীর ধারে টিলাতে প্রথম আলাপের দিনে তীব্র অনুকম্পায় সে ব্যথিত হয়েছিল, তার পর থেকে পেতিয়ার সাহচর্য ওর কাছে ক্রমশ অপরিহার্য হয়ে উঠল। একসঙ্গে থাকত না যখন তখন সে ব্যথা আবার জেগে উঠত, বেদনায় ভরে যেত তার মন, তাড়াতাড়ি যেত বন্ধুর কাছে, তাকে দেখাশোনা করে নিজের যন্ত্রণা ভুলতে চাইত।

৬

হেমন্তের একটি উষ্ণ সন্ধ্যায় দুটি পরিবার বাড়ীর সামনে বসে আছে, এ বিষয়ে ও বিষয়ে কথা চলছে, মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে জ্বলজ্বলে তারা-ছড়ানো গভীর নীল আকাশের দিকে। মায়ের পাশে পেতিয়া যথারীতি বসে, তার পাশে এভেলিনা।

মুহূর্তের জন্য কথায় বিরতি এল। সাড়াশব্দহীন সন্ধ্যা। মাঝে মাঝে শুধু পাতারা হঠাৎ খসখস ফিসফিস করে কী যেন বলছে, তারপর সব চুপচাপ।

স্তব্ধ সেই মুহূর্তে আকাশের গভীর-নীল শূন্যতায় ঝকঝকে একটি তারা খসে পড়ল, জ্বলন্ত বাঁকা রেখায় আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে গেল ছুটে, পিছনে রেখে গেল দীপ্তির আভাস, তারাটি অদৃশ্য হবার বেশ কিছুক্ষণ পরে দীপ্তিটি আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। কোন কথা না বলে ওরা তাকিয়ে রইল। পেতিয়ার হাতে আন্না মিখাইলভ্‌নার হাত রাখা ছিল, হঠাৎ ও যে চমকে কেঁপে উঠল সেটা মা বুঝতে পারল।

'ওটা, ওটা কী?' মায়ের দিকে ফিরে উত্তেজিতভাবে পেতিয়া জিজ্ঞেস করল।

'একটা তারা খসে পড়ল, বাছা।'

'হাঁ, তারা', ভেবেচিন্তে সে বলল। 'ঠিক বুঝেছিলাম যে ওটা একটি তারা।'

'কী করে বুঝলে, পেতিয়া?' মায়ের গলায় সন্দেহের বিষণ্ন আভাস।

'কিন্তু ও যা বলছে সত্যি', বলল এভেলিনা। 'যেমন করেই হোক অনেক কিছু জানতে পারে ও।'

প্রতিদিন বাইরের পৃথিবী সম্বন্ধে ওর সংবেদনশীলতা বেড়ে চলেছে, বয়ঃসন্ধির কঠিন সময় যে দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে তার লক্ষণ এটা। কিন্তু তখনো পেতিয়ার বিকাশে অস্থিরতা ছিল না। মনে হতে পারত নিজের ভাগ্যের কাছে সে আত্মসমর্পণ করেছে; আর বিচিত্র স্থির সেই বিষণ্ণতা, যেটা ওর অভ্যাসিক হয়ে গিয়েছিল, যেটা কখনো ওকে ছেড়ে যেত না, বিশেষভাবে বাড়তও না কখনো, সেটাও কিছুটা কমে গিয়েছে মনে হত। কিন্তু সাময়িক বিরতি মাত্র সেটা: প্রকৃতি জিরোবার সময় দেয় আমাদের, ইচ্ছা করেই যেন, যাতে আসন্ন ঝড়ঝঞ্জার মুখোমুখি হবার শক্তি ও সামর্থ্য নবীন জীবন সঞ্চয় করতে পারে। এরকম বিরতির সময়ে অলক্ষিতে নতুন নানা সমস্যা ঘনীভূত হয়ে ক্রমশ পরিণতি লাভ করে। একবার ছুঁলেই তখন হৃদয়ের সমস্ত প্রশান্তি আমূল বিপর্যস্ত হয়। ঝড়ের হঠাৎ ঝাপটায় সমুদ্রের মত।

# পঞ্চম অধ্যায়

১

আরো কয়েক বছর কেটে গেল।

জমিদার-বাড়ীতে কিছুই বদলায়নি। বাগানে এখনো বীচের শব্দ, শুধু তাদের পত্রগুচ্ছ ঘন, আরো গভীর মনে হয়। আগের মতই শাদা বাড়ীটায় স্নিগ্ধ অভ্যর্থনার ছাপ লেগে আছে, শুধু দেয়ালগুলো একটু বসে গিয়েছে, একটু যেন অসমান। আস্তাবলের খড়ের দেওয়ালে সেই পুরানো ভ্রূকুটি, আর ইওহিম, এখনো আইবুড়ো, আগেকার মত ঘোড়া দেখে। সন্ধ্যাবেলায় আস্তাবলে এখনো বাঁশী বাজে; শুধু ছেলেটি হয় বাঁশী নয় পিয়ানো বাজায়, ইওহিম এখন শুনতেই ভালোবাসে।

মাক্সিমের চুল আরো পেকে গিয়েছে। পপেল্স্কিদের আর কোন ছেলেমেয়ে হয়নি, আগেকার মতই অন্ধ শিশুটিকে কেন্দ্র করে জমিদার-বাড়ীর জীবন চলেছে। ওর জন্য সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে ওরা নিজেদের আবদ্ধ রেখেছে, শান্ত নিরিবিলিতে থাকে তারা, শুধু ওদিকের জমিদারীর

মালিকের ছোট বাড়ীর সঙ্গে যোগসূত্র আছে, ওদের জীবনযাত্রাও এদের মতই শান্ত। এইভাবে পেতিয়া বড়ো হয়ে উঠেছে কাঁচের ঘরে রাখা চারার মত, বাইরের পৃথিবীর কোন আঁচ যেন গায়ে না লাগে।

আগেকার মতই সে আছে একটি বিশাল তমসালোকের কেন্দ্রে, উপরে, চারিপাশে, চারিদিকে শুধু সীমাহীন অন্ধকার; আর সে অন্ধকারে ওর সংবেদনশীল প্রকৃতি নতুন অনুভূতির জন্য উন্মুখ, টান-টান তার যেন শব্দে সাড়া দিয়ে ঝঙ্কারের জন্য অস্থির। আর এই টান-টান প্রত্যাশা বিশেষ ছাপ ফেলল তার মনোভাবে। এক মুহূর্ত, আর একটি মুহূর্ত শুধু, এর পরেই কিছু একটা আসবে মনে হয়, আর অন্ধকার অদৃশ্য হাত বাড়িয়ে তার অন্তরের কোন তার স্পর্শ করবে, দীর্ঘ ক্লান্তিকর ঘুমে তখনো আচ্ছন্ন সেই তার, বেজে ওঠার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষমাণ।

কিন্তু মায়ামমতাপূর্ণ বৈচিত্র্যহীন জমিদার-বাড়ীর চেনা অন্ধকার পেতিয়ার প্রতীক্ষমাণ ইন্দ্রিয়ে শুধু আনে পুরানো বাগানে গাছের অলস মর্মর ধ্বনি, হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয় তার মনকে। সুদূর পৃথিবীর বিষয়ে

সে কিছুটা জানে শুধু গান আর বই আর ইতিহাসের মাধ্যমে। বাগানের বিষণ্ন অস্ফুট ধ্বনি আর বাড়ীর নিরালা শান্তির মাঝে ওই বহুদূর বাইরের জীবনের নানা বিক্ষোভের কথা কিছুটা কখনো কখনো তার কানে আসে, যা শোনে স্বপ্নাচ্ছন্ন কুয়াশায় তা ভাবতে চেষ্টা করে, কোন গান, মহাকাব্য কিম্বা রূপকথা শুনলে ও যেমন করত।

বেশ ভালোভাবেই সব চলছে, আপাতদৃষ্টিতে। ছেলেকে দেখে মায়ের মনে হত ওর মন যেন উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, স্বপ্নালু আধো-ঘুমে মগ্ন, কৃত্রিম হতে পারে, কিন্তু প্রশান্তি ত বটে। আর সে চাইত না যে এই প্রশান্তি ভেঙে যায়। ভাঙতে পারে যা কিছু তার বিষয়ে ভয় ছিল মায়ের।

এভেলিনাও বেড়ে উঠেছে, সকলের অজান্তে যেন। মন্ত্রমুগ্ধ এই স্তব্ধতার দিকে চেয়ে মাঝে মাঝে তার স্বচ্ছ চোখে আসত কেমন যেন সংশয়ের ছাপ, ভবিষ্যতের গহ্বরে কী লুকোনো আছে তার বিষয়ে জিজ্ঞাসার ভাব; কিন্তু অধৈর্যের চিহ্নমাত্র তাতে কখনো প্রকাশ পেত না। এ কয়েক বছরে শ্রীপপেলস্কি তাঁর জমিদারীকে আদর্শ সম্পদ করে তুলেছিলেন; তাঁর অন্ধ ছেলের ভবিষ্যৎ

নিয়ে অবশ্য তিনি মাথা ঘামাতেন না। তিনি মন না দিলেও ও সবকিছু ত যেমন করেই হোক চলে যাচ্ছে। যে ধরনের মানুষ মাক্সিম তাতে শুধু তাঁরই এই স্তব্ধতা অসহনীয় মনে হত, যদিও তিনি জানতেন যে এটা অস্থায়ী পর্ব মাত্র ছাত্রের জন্য তাঁর যে সব পরিকল্পনা তার মধ্যে এটা অনাহূতের মত প্রবেশ করেছে। নিজেকে তিনি বোঝাতেন যে সময় দিতে হবে কিশোর চঞ্চল মনকে থিতিয়ে যাবার, জীবনের রূঢ় সংস্পর্শ সহ্য করার শক্তি সঞ্চয় করার।

এই মন্ত্রমুগ্ধ গণ্ডির বাইরের জীবনে কিন্তু সর্বক্ষণ আলোড়ন, আন্দোলন আর বিক্ষোভ চলেছে। আর এমন সময় এল যখন অন্ধ পেতিয়ার বৃদ্ধ গুরু বোধ করলেন যে এবারে এই গণ্ডি ভেঙে দেওয়া চলতে পারে, কাঁচের ঘরের দরজা খুলে দেওয়া হোক, বাইরের তাজা হাওয়া আসুক ঘরে।

২

শুরুতে তিনি এক পুরানো বন্ধুকে ডেকে আনলেন, প্রায় সত্তর ভার্স্ট দূরের একটি জমিদারীতে বন্ধুটির বাস।

আগে মাঝে মাঝে বুড়ো স্তাভ্‌রুচেঙ্কোর সঙ্গে মাক্সিম দেখো করতেন; এবার যখন খবর পেলেন যে কয়েকটি ছেলেছোকরা ওখানে উঠেছে তখন চিঠি লিখে সবাইকে নিমন্ত্রণ করলেন। সবাই সানন্দে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল—স্তাভরুচেঙ্কো খুসী কেননা মাক্সিমের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব বহু দিনের—আর ছেলেছোকরারা খুসী হল কেননা কিছু দিন আগে মাক্সিম ইয়াৎসেঙ্কোর নামডাক ছিল, তাঁর নামের সঙ্গে চিরাচরিত ইতিকথা জড়িত। ছেলেছোকরাদের মধ্যে দুজন স্তাভরুচেঙ্কোর ছেলে, ছোটটি তখনকার রেওয়াজ অনুসারে ভাষাতত্ত্বের ছাত্র কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয়ে; বড়োটি সুরকার, সেণ্ট-পিটার্সবুর্গে কনসারভেটরির ছাত্র। তৃতীয় যুবাটি ক্যাডেট, প্রতিবেশী জমিদারের ছেলে।

স্তাভরুচেঙ্কোর চুল সব পেকে গেলেও তিনি বেশ শক্ত-সমর্থ মানুষ। কসাক কায়দায় লম্বা ঝোলা গোঁফ তিনি রেখেছিলেন, ওঁর বিরাট কসাক পাতলুনটা ধরে-রাখা বেল্টে থাকে পাইপ আর তামাকের থলি; উক্রেনীয় ছাড়া আর কোন ভাষায় কথা বলতেন না তিনি; আর যখন লম্বা শাদা উক্রেনীয় কোট আর বুটী-করা উক্রেনীয় সার্ট পরিহিত দুই ছেলের মাঝখানে তিনি দাঁড়াতেন তখন

তাঁকে অনেকটা গোগলের তারাস্ বুল্‌বার মত দেখাত। অবশ্য বুল্‌বার রোমাণ্টিসিজমের ছিটেফোঁটা তাঁর চারিত্রে ছিল না। জমিদার তিনি, কাজের লোক, সাংসারিক জ্ঞান তাঁর টনটনে। ভূমিদাসপ্রথার সঙ্গে জড়িত সামন্ততন্ত্রের সবকিছু ব্যাপারে তিনি বরাবর কাজকর্ম বেশ ভালোভাবে চালিয়ে গিয়েছিলেন; আর ভূমিদাসমুক্তির পরে যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছে তার সঙ্গে এখন দিব্যি মানিয়ে নিয়েছেন নিজেকে। জমিদার সুলভ বিচক্ষণতায় কি ষাণদের চিনতেন তিনি—তাঁর গ্রামের সমস্ত কৃষক, তাদের গোয়ালে কটা গরু আর পকেটে কটা রুবল—সব তাঁর নখদর্পণে।

কিন্তু যদিও ছেলেদের সঙ্গে হাতাহাতি হয়নি কখনো, তবুও তাদের সঙ্গে স্থান আর কাল যাই হোক না কেন, প্রায়ই ঝগড়া হত, প্রবল ঝগড়া। যেখানেই, যে সঙ্গেই থাকুক না কেন, ছোট্ট একটা কথায় শুরু হয়ে যেত ওদের অন্তহীন বাগ্‌বিতণ্ডা। ছেলেদের 'আদর্শবাদী নবাব-জাদা' বলে ঠাট্টা করে বেশীর ভাগ সময়ে বুড়োই বিতণ্ডার সূত্রপাত করতেন। ছেলেদের মেজাজ তক্ষুণি যেত বিগড়ে, বুড়োর মেজাজও সপ্তমে চড়ত; আর ফলে দারুণ

গণ্ডগোলের সৃষ্টি হত, দু'পক্ষ যেসব অভিমত প্রকাশ করত মোটেই মধুর নয় সেগুলো।

'বাপ ছেলের' সুপ্রচলিত বিভেদের নিদর্শন এটা, অবশ্য সাধারণত যে অর্থে কথাটি ব্যবহৃত হয় তার চেয়ে অনেক কম জোরালো-ভাবে। তখনকার যুবকেরা পড়তে যেত গ্রামের বাইরে, শুধু ছুটির সময় কিছু দিন গ্রামের চেহারা তারা দেখত, আর তাই চাষীদের বিষয়ে বাপেদের টনটনে বাস্তব জ্ঞান তাদের ছিল না, বাপেরা ত বছরের পর বছর জমিদারীতেই কাটাতেন। যখন 'জনপ্রেমের' জোয়ার আমাদের সমাজে এল তখন নবীন স্তাভরুচেঙ্কোরা মাধ্যমিক স্কুলের পড়াশুনো প্রায় শেষ করে এনেছে, তারাও 'জনগণ'কে জানতে শুরু করেছে, অবশ্য বই-এর মাধ্যমে। কিছু দিন পরে দ্বিতীয় স্তরে উত্তীর্ণ হল তারা — লোকশিল্পে প্রতিবিম্বিত 'জনগণের মানস'এর প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের স্তর সেটা। সে সময় লম্বা শাদা উক্রেনীয় কোট আর বুটী-করা সার্ট চাপিয়ে 'জনগণের মধ্যে যাওয়া'টা দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের বিত্তসম্পন্ন সব পরিবারের ছেলেদের মধ্যে বহুপ্রচলিত রেওয়াজ ছিল। জনগণের জীবনধারণের অর্থনৈতিক দিকটা অবশ্য বিশেষ

করে এই সব যুবকদের মনোযোগ আকর্ষণ করত না। গ্রামে গ্রামে ঘুরে লোকসঙ্গীতের কথা আর সুর রেকর্ড করা নিয়ে ব্যস্ত থাকত তারা, উপকথা নোট করে নিত, লোক-কথায় অতীতের বর্ণনায় লিখিত ইতিহাসের প্রতিবিম্ব কতটা পড়েছে তুলনা করে দেখত — এক কথায়, রোমাণ্টিক জাতীয়তাবাদের কাব্যিভরা রঙীন কাঁচের মাধ্যমে তারা চাষীদের দেখত। অবশ্য শেষোক্ত দুর্বলতার দিকে বয়স্কদেরও বেশ ঝোঁক ছিল। তা সত্ত্বেও বুড়োদের আর ছোকরাদের দেখে মনে হত তারা কখনো একমত হবে না।

হয়ত তাঁর ছাত্রছেলে বক্তৃতার ঢং-এ কথা বলে চলেছে, মুখ তার লাল, চোখ জ্বলছে, স্তাভরুচেঙ্কো কনুই দিয়ে মাক্সিমের পাঁজরায় চতুর খোঁচা দিয়ে বললেন, 'শোনো একবার! ছোটলোকের বেটা, ঠিক বই-এর মত বকছে। ওর ঘাড়ে সত্যি একটা মাথা আছে হয়ত লোকে ভাববে। কিন্তু শোনো পণ্ডিতমশাই, একবার বলো ত আমার নেচিপর কেমন তোমাকে ঠকিয়েছিল?'

বৃদ্ধ গোঁফ কুঁচকিয়ে উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়ে নেচিপর আর নিজের দুই ছেলের গল্প বলতেন, বলার ঢং-এ আসল উক্রেনীয় পরিহাসের আমেজ। ছেলেরা লাল হয়ে উঠত, কিন্তু

জবাব দিতে তারা কখনো পিছু পা হত না। তারা বলত, হতে পারে নেচিপর কিম্বা ফেদ্‌কো নামের কোন ব্যক্তি-বিশেষকে কিম্বা কোন বিশেষ গ্রামকে তারা চেনে না, কিন্তু তারা সাধারণভাবে, সমগ্রভাবে সমস্ত জনগণকে জানতে চাইছে। তারা জীবনকে দেখে খুব উঁচু দৃষ্টিভঙ্গীতে, সে দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া কোন সিদ্ধান্তে কিম্বা মোটামুটি সাধারণ-সূত্রে আসা যায় না। বহুদূরব্যাপী পরিপ্রেক্ষিত এক নজরে ধরা পড়ে তাদের কাছে, কিন্তু একঘেয়ে গতানু-গতিকতায় অভ্যস্ত কয়েকজন বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন বয়স্ক আছেন যাঁরা গাছ দেখতে এত উদগ্রীব যে বনের খেই হারিয়ে ফেলেন।

ছেলেরা এত পাণ্ডিত্যপূর্ণভাবে তর্ক করছে, বৃদ্ধ অসন্তুষ্ট হতেন না।

গর্বিতভাবে চারিদিকে চেয়ে তিনি বলতেন, 'ওরা যে পড়াশুনো করেছে সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে।' তারপর ছেলেদের দিকে আবার ফিরে বলতেন, 'যা খুসী বলতে পারো, কিন্তু আমার ফেদ্‌কো তোমাদের দুজনকে বাছুরের মত নাকে দড়ি দিয়ে যেখানে ইচ্ছে নিয়ে যেতে পারে, ঠিক পারে!... অথচ আমি ওই শয়তান ফেদ্‌কো

বেটাকে ধরে ইচ্ছে করলে তামাকের থলেতে গুঁজে পকেটে রাখতে পারি। আর তা থেকে বোঝা যায় আমার মত ঘোড়েলের তুলনায় তোমরা দুজনে নেহাৎ শিশু।'

৩

এই ধরনের একটি বিতর্ক সবেমাত্র শেষ হয়েছে। বয়স্করা বাড়ীর ভিতরে চলে গিয়েছেন, খোলা জানলা দিয়ে শোনা যাচ্ছে স্তাভরুচেন্কোর গলা, হাস্যকর কোন ঘটনার কথা বলছেন তিনি, শ্রোতারা না হেসে পারছে না।

তরুণেরা বাগানেই বসে রইল। লোমের টুপি হেলিয়ে ঘাসে কোট বিছিয়ে ছাত্রটি তার উপরে গা এলিয়ে দিয়েছে, কেমন যেন উদাসীনভাবে। বাড়ীর চারিদিক ঘিরে রক, তার উপরে ওর স্থূরকার বড়ো ভাই এভেলিনার পাশে, আর তার পাশে গলাবন্ধ উর্দি গায়ে ক্যাডেট। পিওতরও বসেছে, সবাই থেকে একটু দূরে, জানলার কাঠে হেলান দিয়ে। মাথা নিচু করে এই মাত্র শোনা বিতর্কের কথা পিওতর ভাবছে, বিতর্কটি তার বিশেষ আগ্রহ জাগিয়েছে।

ভাইদের মধ্যে বড়ো যে সে জিজ্ঞেস করল, 'এ

সব শুনে কী মনে হল আপনার, এভেলিনা দেবী? আপনি ত একটা কথাও বলেননি।'

'বেশ ভালোই সবকিছু, মানে যা বলছিলেন আপনার বাবাকে। তবে...'

'তবে কী?'

এভেলিনা তক্ষুণি জবাব দিল না। হাতের কাজ কোলে রেখে সযত্নে সেটা ঠিক করল, তাকিয়ে রইল সেটার দিকে, কী যেন ভাবছে। কী ভাবছে সেটা বলা কঠিন—যে নকসা বুনছে তার জন্য অন্য কোন কাপড় বাছাই করা উচিত ছিল কি না, কিম্বা হয়ত প্রশ্নের জবাবে কী বলবে তাই ভাবছে।

তরুণেরা সবাই তার উত্তরের জন্য উদগ্রীব। ছাত্রটি কনুই-এ ভর দিয়ে একটু উঠে খুব আগ্রহের সঙ্গে তার দিকে চাইল। সুরকার তার দিকে তাকিয়ে, চোখে ধীর জিজ্ঞাসু ভাব। পিওতরও ব্যগ্র, মাথা তুলল সে, এক মুহূর্ত পরেই মুখ অন্য দিকে ফেরাল।

হাতের কাজ ঠিক করতে করতে মৃদুকণ্ঠে এভেলিনা বলল, 'সংসারে সবাই ত একপথে যায় না। আমাদের প্রত্যেকেরই ভবিতব্য আলাদা।'

'হায় ভগবান।' তীক্ষ্ণকণ্ঠে ছাত্রটি বলল। 'আপনি ত দেখছি দারুণ জ্ঞানী লোক! বয়স আপনার কত, এভেলিনা দেবী? অবশ্য যদি কিছু মনে না করেন।'

'সতেরো,' সহজভাবে এভেলিনা বলল, কিন্তু তক্ষুণি সরল আগ্রহে যোগ করল, 'অনেক বেশী বয়স নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন?'

ওরা সবাই হেসে উঠল।

স্বরকার বলল, 'আপনার বয়স কত আমাকে জিজ্ঞেস করলে তেরো থেকে তেইশ, কত হতে পারে বলতে গিয়ে মুশকিলে পড়তাম। কখনো কখনো আপনাকে নেহাৎ শিশু মনে হয়, সত্যি বলছি! অথচ মাঝে মাঝে আপনি বেশ বিচক্ষণ বুড়ীর মত কথা বলেন!'

'গুরু ব্যাপার গম্ভীরভাবে আলোচনা করাই ত উচিত, গাব্রিলো পেত্রোভিচ,' বিজ্ঞভাবে ক্ষুদে মহিলাটি বলল, হাতের সেলাই কোল থেকে তুলে নিল।

সবাই চুপ। আবার এভেলিনার ছুঁচ চলতে লাগল। এই ছোট অথচ সংযতস্বভাব মহিলাটির দিকে ছেলেছোকরারা বেশ কৌতূহলের সঙ্গে তাকিয়ে রইল।

৪

পিওতরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পরে এভেলিনা অবশ্যই বড়ো হয়ে উঠেছে; কিন্তু যুবা স্তাভরুচেঙ্কোর উক্তিও ঠিক। ছোট পাতলা শরীর তার, প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় নেহাৎ শিশু। অথচ ওর মন্থর স্থির চলনে এমন একটা কিছু আছে যেটা মাঝে মাঝে ওকে বয়স্কার গাম্ভীর্য এনে দেয়। ওর মুখ দেখেও একই কথা মনে হয়। আমার বিশ্বাস শুধু শ্লাভ্‌দের মধ্যেই এ ধরনের মুখ দেখা যায়। সূক্ষ্ম পরিষ্কার গড়ন, মসৃণ কোমল রেখায় টানা; নীল চোখ, ধীর স্থির; পাণ্ডুর কপোল, কদাচিৎ তাতে লাল আমেজ লাগে—তীব্র আবেগের আভায় টকটকে লাল-হয়ে ওঠার জন্য সর্বদাই উন্মুখ, এমন ধরনের পাণ্ডুরতা নয় অবশ্য—বরঞ্চ বরফের স্নিগ্ধ শ্বেতাভার মত। ওর সোনালী চুল স্বল্প ছায়া ফেলেছে মর্মরমসৃণ কপালের দুদিকে, বড়ো বিনুনী করে বাঁধা চুল, যখন হাঁটে তখন মনে হয় বিনুনীর ভারে মাথা পিছনে হেলে যাচ্ছে।

পিওতরেরও বয়স হয়েছে, বেশ পরিণত সে এখন। বিবর্ণ, গভীরভাবে বিচলিত, সবায়ের থেকে একটু

দূরে বসে আছে সে, ওর দিকে এ সময় কেউ তাকালে ওর সুশ্রী মুখ মনে গভীর ছাপ ফেলবেই, মুখের ভাব অন্যান্যদের তুলনায় এত স্বতন্ত্র, অন্তরের সমস্ত কিছুতে সাড়া দিয়ে এত স্পষ্টভাবে পরিবর্তনশীল। কালো চুল সুন্দর ঢেউ-এ নেমেছে কপালে, সেখানে অকালে পাতলা বলিরেখা। মাঝে মাঝে ওর মুখ হঠাৎ লাল, আবার হঠাৎ বিরস পাণ্ডুর হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে নিচের ঠোঁট অস্থিরভাবে কাঁপছে, কোণের দিকে একটু বাঁকা সেটা ; চঞ্চল ভুরু উঠছে নামছে। কিন্তু সুন্দর চোখজোড়া সমান অনড় দৃষ্টিতে সামনের দিকে নিবদ্ধ, তাতে মুখে এসেছে কিছুটা অস্বাভাবিক বিষাদের আভাস।

কয়েক মুহূর্তের নীরবতার পরে ছাত্রটি আবার শুরু করল, 'তাহলে এভেলিনা দেবী ভাবেন যে, যে সব বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম সেগুলো স্ত্রীলোকের বোধশক্তির বাইরে, মেয়েদের কপালে ঘরকন্নার জীবন ছাড়া আর কিছু নেই।'

যুবকটির বলার ভঙ্গীতে আত্মপ্রসাদের সুর (সে সময় এ ধরনের সব কথা একেবারে নতুন ছিল) আর পরিহাসের তালঠোকা একটা ভাব। মুহূর্তের জন্য

আবার সবাই চুপ। এভেলিনা অসহায়ভাবে লাল হয়ে উঠল।

শেষে সে বলল, 'সিদ্ধান্তটা আপনি বড়ো তাড়াতাড়ি করেছেন। যা বলেছিলেন সবই বুঝতে পেরেছিলাম, তার মানে এসব কথাবার্তা মেয়েদের মাথায় ঢোকে। ভবিতব্য সম্বন্ধে আমার কথাটা হল আমাকে নিয়ে, আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে।'

থেমে গিয়ে এত একাগ্রভাবে সে সেলাই-এর কাজে মন দিল যে যুবকটির প্রশ্ন করবার সাহসে ভাটা পড়ল।

বিব্রতভাবে সে বলল, 'কেমন অদ্ভুতভাবে আপনি কথা বলেন! যেন আপনার জীবন আমরণ কীভাবে চলবে আগে থেকেই সেটা ঠিক করে রেখেছেন!'

'কিন্তু তাতে অদ্ভুত কী আছে, গাব্রিলো পেত্রোভিচ?' জবাবে শান্তকণ্ঠে বলল এভেলিনা। 'আমার ত নিশ্চিত মনে হয় যে ইলিয়া ইভানভিচ পর্যন্ত' (ক্যাডেটের নাম) 'সারা জীবন কী করবেন এরি মধ্যে ঠিক করে রেখেছেন; আর তিনি ত আমার চেয়েও বয়সে ছোট, নয় কি?'

'ঠিক কথা,' বলল ক্যাডেট, কথাবার্তায় যোগ দিতে পেরে সে খুসী। 'জানেন, কিছু দিন আগে ন-এর জীবনী

একটা পড়েছিলাম। তিনিও ত পরিকল্পনামত চলতেন। বিশ বছর বয়সে বিয়ে করেন, আর সৈন্য চালনার ভার পান বয়স যখন পঁয়ত্রিশ।'

ছাত্রটি বিদ্রূপের সুরে হাসল। আবার এভেলিনা একটু লাল হয়ে উঠল।

'দেখছেনই ত, আমাদের প্রত্যেকের ভবিতব্য তাহলে আলাদা,' স্বল্প বিরতির পরে নিরাসক্ত কঠোরভাবে বলল সে।

এ বিষয়ে আর আলোচনা করতে কেউ চাইল না। অল্পবয়স্কদের এই ছোট দলে এল গভীর মৌন, একটা বিব্রত আশঙ্কার ভাব সে মৌনে অনুভব করা যায়। সবাই বুঝতে পারল যে তাদের কথাবার্তা অজ্ঞাতসারেই কোন গোপন ব্যক্তিগত অনুভূতিতে ঘা দিয়েছে, এভেলিনার আপাতসহজ কথাগুলোর আড়ালে আছে কোন টান-টান, সংবেদনশীল তারের কম্পন ...।

গাছের খসখস ছাড়া আর কোন শব্দ মৌন ভাঙল না। অন্ধকার হয়ে আসছে, কেন যেন মনে হচ্ছে পুরানো বাগানটার মেজাজ বিগড়ে গিয়েছে।

৫

এই সব বিতর্ক, যৌবনের নানা আশা আর আগ্রহের দুরন্ত জোয়ার, মতামত আর প্রত্যাশা অন্ধ পেতিয়ার উপরে ভেঙ্গে পড়ল হঠাৎ ঝড়ের মত। বিস্মিত প্রশংসায় রক্তিম মুখে প্রথম প্রথম ব্যগ্রভাবে সে শুনত। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই সে না বুঝে পারল না যে এই বলিষ্ঠ জোয়ারে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার কোনই উদ্যম নেই, তার বিষয়ে বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। তার মতামত কেউ জানতে চাইত না, কোন প্রশ্ন তাকে কখনো করা হত না। এক পাশে ছেড়ে দেওয়া হত তাকে, বিরস নিঃসঙ্গ-তায়, জমিদার-বাড়ীতে উত্তেজনা যত বাড়ছে ততই বিরস সেই নিঃসঙ্গতা।

তবুও মনোযোগ দিয়ে কথাবার্তা পেতিয়া শোনে, নতুন আর অদ্ভুত সব কথাবার্তা; আর শুনতে শুনতে তার ভ্রূকুঞ্চন আরো প্রখর হয়, পাণ্ডুর মুখে আসে ক্লিষ্ট আগ্রহের ভাব। সে আগ্রহ কিন্তু বিষাদে ভরা, ভারী আর তিক্ত ভাবনাচিন্তা যোগায় তাকে।

বিষণ্নভাবে মা ছেলেকে দেখে। এভেলিনার চোখেও উৎকণ্ঠা আর অনুকম্পার ছাপ। সজীব সাহচর্যের প্রভাব

তাঁর ছাত্রের উপরে কেমন সেটা একমাত্র মাক্সিমই লক্ষ্য করেননি মনে হয়। অভ্যাগতদের প্রায়ই আসতে তিনি অনুরোধ করলেন অত্যন্ত আন্তরিকভাবে, কথা দিলেন যে জাতিতত্ত্ব বিষয়ে মনোগ্রাহী মালমশলার সম্ভার খুঁজে পেতে রাখবেন ওদের জন্য।

আবার আসবে কথা দিয়ে ওরা চলে গেল। যাবার সময় আন্তরিক বন্ধুত্বে পিওতরের হাতে চাপ দিল যুবক তিনটি, প্রতিদানে আবেগের সঙ্গে সেও চাপ দিল, আর ওদের গাড়ী যখন চলে গেল তখন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল চাকার ঘর্ঘর শব্দ, তারপর হঠাৎ ঘুরে বাগানে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

ওরা চলে যাবার পরে জমিদার-বাড়ীতে পুরানো নীরবতা ফিরে এল। কিন্তু অন্য ধরনের নীরবতা, পিওতর সেটা অনুভব করল: বিচিত্র অস্বাভাবিক সে নীরবতা। মৌনের মধ্যেই যেন ও শুনতে পায় কিছু একটা, গভীর গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা ঘটে গিয়েছে, তার স্বীকৃতি। বাগানে পায়ে চলার নিস্তব্ধ পথ, শুধু বীচ আর লাইলাকের খসখস ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না, সেখানেও কিছুদিন আগেকার কথাবার্তার প্রতিধ্বনি

যেন বাজছে। তাছাড়া ড্রয়িং-রুমে কী যেন নিয়ে তর্ক চলত, খোলা জানলা দিয়ে কখনো কখনো ওর কানে আসে। মা'র গলা ভেসে আসে, যন্ত্রণায় আর অনুরোধে ভরা, আর এভেলিনার ক্রোধরুদ্ধ কণ্ঠস্বর, দুজনেই মাক্সিমের বিপক্ষে, সেটা বোঝা যায়; আর মনে হয় মাক্সিম, যদিও উত্তেজিত তিনি, তবুও দৃঢ়ভাবে তাদের আক্রমণের জবাব দিচ্ছেন। পিওতরকে দেখলেই আলাপ আলোচনা বন্ধ হয়ে যেত।

যে দেয়াল এতদিন তাঁর অন্ধ ছাত্রকে ঘিরে রেখেছিল, দৃঢ় সঙ্কল্পে নিষ্ঠুরভাবে সে দেয়ালে প্রথম ঘা দিয়ে ভেঙ্গেছেন মাক্সিম। ফাটল দিয়ে খরবেগে ঢুকেছে প্রথম উদ্দাম অশান্ত ঢেউ, তার ধাক্কায় পেতিয়ার মানসিক প্রশান্তি বিক্ষুব্ধ।

মন্ত্রমুগ্ধ গণ্ডিতে নিজেকে এখন আড়ষ্ট মনে হয় তার। তাকে পীড়া দিচ্ছে বাড়ীর প্রশান্ত স্তব্ধতা, পুরানো বাগানের মন্থর অস্ফুট সব ধ্বনি, তার সজীব অন্তর যে গভীর ঘুমে এত দিন আচ্ছন্ন ছিল তার একঘেয়েমী। অন্ধকার আনছে নতুন নানা কণ্ঠস্বর, তারা তাকে ডাকছে, লোভ দেখাচ্ছে; নতুন ভাসা-ভাসা নানা

প্রত্যয়ে অন্ধকার চঞ্চল, ভিড় করে তারা আসছে তার মাথায়, অস্থির আকাঙ্খায় ভরে দিচ্ছে মন।

অন্ধকার তাকে ডাকছে, তলব দিচ্ছে; জাগিয়ে তুলছে এত দিন নিদ্রাচ্ছন্ন অনেক অভাবকে। আর এই সব প্রথম হাতছানি ছাপ রেখে গেল। পেতিয়ার মুখের পাণ্ডুরতা গেল বেড়ে, অস্পষ্ট বিরস যন্ত্রণায় তার হৃদয় কাতর।

তার অশান্তির সব লক্ষণ মা ও এভেলিনার চোখে সত্বর ধরা পড়ল। দৃষ্টি যাদের আছে তারা অন্য লোকের মুখে ভাবনা ও অনুভূতির প্রতিচ্ছায়া দেখে নিজেদের আবেগ গোপন করতে শেখে। কিন্তু এ বিষয়ে অন্ধেরা অসহায়। ড্রয়িং-রুমে ভুলে-যাওয়া খোলা কোন ডায়েরী যেমন সহজে পড়া যায়, তেমন পিওতরের বিবর্ণ মুখ দেখে সহজেই ওর মনের ভাব বোঝা যায়, ওর মুখে মর্মান্তিক অশান্তির প্রতিচ্ছবি।

মা ও এভেলিনা এটাও বুঝল যে মাক্সিমও সবকিছু লক্ষ্য করেছেন — আরো বেশী — উনি কী একটা পরি-কল্পনা অনুসরণ করছেন, তার অংশ এটা। দুজনের কাছে সেটা দারুণ নিষ্ঠুর মনে হল। যদি পারত শরীর

দিয়ে মা সন্তানকে আগলে রাখত। চারাগাছের কাঁচের ঘর, মাক্সিমের মতে? হোক না কেন, কী এসে যায় তাতে, এতদিন ত কাঁচের ঘরে পেতিয়া শান্তিতে ছিল। ওর জীবন এইভাবেই চলুক, স্তব্ধ প্রশান্ত জীবন, কোন আলোড়ন থাকবে না তাতে। এভেলিনা অতখানি স্পষ্টবক্তা নয়, মনে হয় অনেক ভাবনা সে চেপে রাখে। কিন্তু মাক্সিমকে আগে যেভাবে দেখত সেভাবে আর দেখে না; তাঁর অনেক প্রস্তাবে, এমন কি তুচ্ছ খুঁটিনাটি নিয়ে আপত্তি করত— এত তীব্রভাবে যে আগে মাক্সিম কখনো দেখেননি।

ভ্রূকুঞ্চিত করে জিজ্ঞাসার ভঙ্গীতে ওর দিকে তাকাতেন তিনি। অনেক সময় ওর চোখে দেখতেন ক্রোধের দীপ্তি। তখন মাথা নেড়ে, অবোধ্য কিছু বিড়বিড় করে আরো ঘন তামাকের ধোঁয়ায় নিজেকে ঘিরে ফেলতেন তিনি, গভীর মানসিক সংহতির লক্ষণ এটা। কিন্তু নিজের পথ থেকে কখনো ভ্রষ্ট হতেন না মাক্সিম; আর মাঝে মাঝে উগ্র বুলি দু একটা ছাড়তেন, বিশেষ কাউকে উদ্দেশ্য করে নয়, মেয়েলি অনুরাগের বোকামী আর মেয়েলি চিন্তাধারার সীমাবদ্ধতা, এসব তাঁর উক্তির লক্ষ্যবস্তু; সারা

দুনিয়া জানে যে মুহূর্তের দুঃখ বা মুহূর্তের আনন্দ ছাড়া মেয়েরা আর কিছু দেখতে পায় না, ওদের দৃষ্টি এত সঙ্কীর্ণ। পিওতরের জন্য প্রশান্তি তিনি খুঁজছেন না, তিনি চান যতখানি সম্ভব ততখানি সমগ্রভাবে ওর জীবন গড়ে উঠুক। লোকে বলে ছাত্রকে নিজের মত করে গড়ে তোলার প্রয়াস শিক্ষক মাত্রেই করেন। আর যা তিনি নিজে দেখে অকালে হারিয়ে ছিলেন তা ভাগ্নের জন্য চাইতেন মাক্সিম: সংগ্রামের জীবন, উত্তেজনাময় সংঘাতের জীবন। কীভাবে, সেটা নিজে বলতে পারেন না, কিন্তু বহির্জগতের বিষয়ে ধারণা অন্ধ পেতিয়ার যাতে বাড়ে তার যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন তিনি—এমন কি যদি তাতে তার মনে ধাক্কা লাগে, আধ্যাত্মিক বিপর্যয় ঘটে, তাও সই। নিজের বোন আর এভেলিনা সম্পূর্ণ আলাদা অন্য কিছু চায় সেটা জানতেন তিনি...

'মায়ের অন্ধ প্রবৃত্তি!' মাঝে-মাঝে বলে উঠতেন তিনি, রেগে ক্রাচ খটখটিয়ে ঘরের এধার থেকে ওধারে পায়চারি চলত।

কিন্তু রাগতেন তিনি কদাচিৎ। সাধারণত বোনের যুক্তিতর্কের জবাব দিতেন কোমল সহানুভূতিতে, বোঝাবার

চেষ্টা করতেন নরমভাবে, নরম ভাবটা আরো বেড়ে যেত এভেলিনার অনুপস্থিতিতে, কেননা খুঁটি ধরার জন্য এভেলিনা না থাকলে বোন সহজেই তাঁর কথা মেনে নিত—অবশ্য এটা বলা উচিত যে তখন মেনে নিলেও কিছু দিন যেতে না যেতেই একই কথা আবার তুলতে তার বাধত না। এভেলিনা থাকলে প্রতিরোধ হত প্রখরতর, আর তখন বৃদ্ধটি আশ্রয় নিতেন বাক্যহীনতায়। মনে হত দুজনের মধ্যে লড়াই শুরু হয়েছে, এখনো প্রতিপক্ষেরা এ ওকে খুঁটিয়ে দেখছে, সাবধানে তুরুপ লুকিয়ে রেখে।

৬

দু সপ্তাহ পরে যখন ওরা আবার এল তখন খুব আন্তরিকভাবে এভেলিনা ওদের অভ্যর্থনা করল না। কিন্তু ওদের যৌবনসুলভ চঞ্চলতায় এমন একটা মোহ ছিল যে সেটা ঠেকিয়ে রাখা তার পক্ষে কঠিন। দিনের পর দিন ওরা গ্রামে ঘুরে বেড়ায়, বনে যায় শিকার করতে মাঠে গিয়ে ধান-কাটুরেদের গান রেকর্ড করে। সন্ধ্যেবেলায় সবাই জোটে বাগানে, বাড়ীর রকে জমায়েৎ হয়।

এমন একটা সন্ধ্যায় কী হচ্ছে সেটা এভেলিনা বোঝার আগেই কথাবার্তা আবার মোড় নিল অপ্রীতিকর বিষয়ে। কী করে শুরু হল, কে শুরু করল সেটা কেউ বলতে পারত না — যেমন তাদের পক্ষে বলা দুষ্কর ছিল কখন সূর্যাস্তের আভা মিলিয়ে গিয়েছে, প্রদোষ নেমেছে বাগানে, কিম্বা ঠিক কোন মুহূর্তে ঝাপসা ঝোপঝাড়ে শুরু হয়েছে নাইটিংগেলের সান্ধ্য গান।

অজানা ভবিষ্যতের সঙ্গে ভয়ভাবনাহীন মোকাবিলার কথা ছাত্রটি বলছে ব্যগ্রভাবে, তার গলায় যৌবনের উদ্দাম অনুরক্ত আবেগ; যে স্থির বিশ্বাসে সে ভবিষ্যতের কথা, অবশ্যম্ভাবী বিস্ময়ে ভরা ভবিষ্যতের কথা বলছে তাতে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না, দৃঢ় প্রত্যয়ের প্রায়-অজেয় শক্তি তার বিশ্বাসে।

এভেলিনার মুখ লাল হয়ে গেল; সে বুঝল আজকের এই আহ্বানের লক্ষ্য সে, আর কেউ নয়, হয়ত বক্তা নিজেও সেটা ঠিক জানে না।

কথা শুনে সেলাই-এর কাজে ঝুঁকে পড়ল এভেলিনা। ওর চোখ দীপ্ত, গাল রক্তিম। বুক ঢিপ ঢিপ করছে। কিন্তু তারপর চোখের দীপ্তি আর গালের রক্তিমাভা গেল

মিলিয়ে, যদিও হৃৎস্পন্দন আরো বেড়ে চলল, ঠোঁট দুটো হঠাৎ চাপা, বিবর্ণ মুখে এল ভয়ের ছাপ।

চোখের সামনে কালো একটি দেয়াল ফাঁক হয়ে গিয়েছে, ফাটল দিয়ে দেখা যাচ্ছে আলাদা কোন পৃথিবীর সুদূর উজ্জ্বল দৃশ্য, সজীব কর্মমুখর বিশাল এক পৃথিবী। তাই ভয়।

অনেক দিন ধরে সেই পৃথিবী তাকে ডাকছে। আগে বুঝতে পারেনি সেটা। তবুও ছায়াভরা পুরানো বাগানের কোন নিরালা বেঞ্চে প্রায়ই ঘণ্টার পর ঘণ্টা একলা বসে থাকত সে, অদ্ভুত সব স্বপ্ন, সুদূর কত জায়গার স্বপ্ন দেখত; আর সেসব স্বপ্নে অন্ধ পেতিয়া বেচারার কোন স্থান ছিল না ...।

আর এখন সেই পৃথিবী হঠাৎ খুব কাছে সরে এসেছে, শুধু যে ডাকছে তা নয়, তার উপরে কেমন যেন একটি অধিকার দাবী করছে।

পিওতরের দিকে ক্ষিপ্র দৃষ্টিপাত করল এভেলিনা, আর বেদনায় তার বুক মুচড়িয়ে উঠল। নিঃসাড় হয়ে বসে আছে পিওতর, গভীর চিন্তায় মগ্ন, ওর ভঙ্গীতে এমন একটি ভারী ভাব যে সেটা অনেক দিন এভেলিনার

মনে থাকবে। 'বুঝতে পারছে ও, সব বুঝতে পারছে।' কথাটা মনে হতেই এভেলিনার হঠাৎ নিজেকে অসাড় লাগল। সমস্ত রক্ত বুকে চলে গেল, মুখ এত শাদা হয়ে উঠল যে নিজের পাণ্ডুরতা এভেলিনা নিজেই অনুভব করল। মুহূর্তের জন্য সে দেখল সেই উজ্জ্বল সুদূর পৃথিবীতে নিজে চলে গিয়েছে, আর মাথা নিচু করে ও একলা বসে আছে। কিন্তু না, এখানে বসে নেই। বসে আছে নদীর ধারে টিলাতে, যেখানে অনেক দিন আগে একটি সন্ধ্যায় ছোট্ট অন্ধ ছেলেটির জন্য সে কেঁদে-ছিল ...।

আর এভেলিনার ভয় করল, পুরানো ক্ষত থেকে যদি কেউ ছুরিটা টেনে বের করে নেবার চেষ্টা করে, সেই ভয়।

মনে পড়ল মাক্সিমের চোখ, আজকাল প্রায়ই মাক্সিম তার দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাহলে তাঁর দীর্ঘ, ভাষাহীন দৃষ্টিপাতের মানে এই। এভেলিনার চেয়েও ভালো করে ওর মনোভাব আঁচ করেছেন তিনি, বুঝেছেন যে বাছাই করার লড়াই এখনো ওর শেষ হয়নি, এখনো ওর আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ... কিন্তু ভুল বুঝেছেন তিনি; প্রথমে

কী করতে হবে এভেলিনা জানে সেটা; আর সেটা করার পর জীবন থেকে নিঙড়ে কী বের করতে পারে সেটা দেখবে।

গভীর, হাঁপধরা নিঃশ্বাস নিল ও, যেন কঠিন দৈহিক পরিশ্রম করে উঠছে, তাকাল চারিদিকে। স্তব্ধভাবে, এখানে কতক্ষণ বসে আছে সবাই, ছাত্রটি আর কী বলেছে, যদি বলে থাকে কিছু, কখন কথা থামিয়েছে সে, কিছুই জানে না ও। পিওতর যেখানে বসেছিল সে দিকে তাকাল এভেলিনা।

পিওতর নেই সেখানে।

৭

'আমাকে মাপ করবেন আপনারা', সেলাই-এর কাজ শান্তভাবে গুটিয়ে নিয়ে এভেলিনা বলল, 'আপনাদের একলা ছেড়ে দিয়ে আমাকে যেতে হবে, কিছুক্ষণের জন্য।'

বাগানের ছায়াচ্ছন্ন পথ ধরে মন্থরভাবে চলে গেল সে। শুধু এভেলিনার কাছেই এই সব সন্ধ্যা উৎকণ্ঠায় ভারী ছিল না। পথের বাঁকে এসে কিছু আগে গাছের

নিচে বেঞ্চের কাছ্ থেকে গলার শব্দ তার কানে এল। সেখানে বসে মাক্সিম আর আন্না মিখাইলভ্না কথা বলছেন, দুজনকেই মনে হচ্ছে গভীরভাবে বিচলিত।

'ঠিক তাই। আমি মেয়েটির কথাও ভাবছিলাম, শুধু পেতিয়ার নয়', কর্কশভাবে মাক্সিম বললেন। 'তুমিই একবার ভেবে দেখ না কেন। এভেলিনা ত এখনো নেহাৎ শিশু, জীবনের কিছুই জানে না। তুমি কি ওর অজ্ঞতার সুযোগ নেবে? সেটা নিশ্চয়ই করবে না!'

উত্তর দিতে গিয়ে প্রায় কাঁদো-কাঁদো ভাবে মা বলল:

'কিন্তু মাক্সিম, যদি... যদি ও... পেতিয়া বেচারার তাহলে কী হবে?'

'যা হবার হবে', বৃদ্ধ সৈনিক জবাব দিলেন দৃঢ়ভাবে, কিন্তু বিষণ্ন স্বরে। 'যদি সেরকম হয়, তাহলে আমাদের যা করবার যথাসাধ্য করব। কিন্তু যাই হোক, ওর জন্য অন্য একজনের জীবন নষ্ট হয়ে গিয়েছে এই ভাবনার দুরূহ বোঝা কখনো ওর ওপরে চাপানো উচিত নয়। আর আমাদের বিবেকের ওপরেও নয়... সেটাও ভাবতে হবে তোমার, আন্না।'

মাক্সিমের গলা কোমল হয়ে এসেছে। বোনের হাত তুলে সস্নেহে চুম্বন করলেন তিনি। আন্না মিখাইলভ্‌না মাথা নোয়াল।

'বেচারা পেতিয়া! এভেলিনার সঙ্গে দেখা না হলেই ওর ভালো হত!'

অস্ফুট যন্ত্রণার সুরে মা বলল, এত অনুচ্চ কণ্ঠে যে কথাগুলো শোনার চেয়ে বেশী আঁচ করল এভেলিনা।

বেদনায় লাল হয়ে উঠল এভেলিনা। অনিচ্ছাসত্ত্বেও পথের বাঁকে সে থমকে দাঁড়াল। ওদের পেরিয়ে গেলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে যে সে ওদের গোপন কথা শুনে ফেলেছে।

কিন্তু মুহূর্তের পরে গর্বিতভাবে মাথা উঁচু করল এভেলিনা। সে ত আর আড়ি পেতে শুনতে চায়নি। তাছাড়া, কৃত্রিম লজ্জার কোন তাড়নায় নির্বাচিত পথ থেকে সে কখনো ভ্রষ্ট হবে না। আর মাক্সিমমামা বড্ড বেশী জিনিস নিজের ঘাড়ে নেন। ওর জীবন নিজের ব্যাপার, যা ভালো মনে করে তাই করবে সে।

মাথা উঁচু করে আস্তে আস্তে ওরা যে বেঞ্চে বসেছিল সেটা ছাড়িয়ে চলে গেল এভেলিনা। ওর পায়ের কাছ

থেকে তাড়াতাড়ি ক্রাচটা সরিয়ে নিলেন মাক্সিম; আর আন্না মিখাইলভনা মুখ তুলে তাকাল ওর দিকে, সে দৃষ্টিতে ক্লেশ, অনুরাগ আর প্রায় সমীহের ভাব, সঙ্গে সঙ্গে ভয়েরও; যেন মায়ের অন্তর বুঝতে পারল যে এই ক্রুদ্ধ দ্বন্দ্বের ভঙ্গীতে সামনে দিয়ে চলে-যাওয়া এই সুন্দর গর্বিত মেয়েটিই তার সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্ত সুখ বা দুঃখের বাহন।

৮

জমিদার-বাড়ীর বাগানের এক কোণে একটি পুরানো পরিত্যক্ত জলের মিল। চাকাগুলো অনেক দিন ঘোরেনি, পাল্লাগুলো শ্যাওলায় ভরা আর ফাঁক দিয়ে ছোট ছোট ধারায় অনবরত জল চুঁইয়ে পড়ছে। পেতিয়ার প্রিয় জায়গা এটি। প্রায়ই বাঁধের উপরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকত সে, শুনত জলের কুলকুল শব্দ, আর বাড়ীতে পিয়ানোয় ঠিক সে ধরনের আওয়াজ তুলত। কিন্তু এখন জলের শব্দ শোনার মত মনের অবস্থা নয়। যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত, হৃদয় তিক্ততায় পূর্ণ, পথের এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিক, ক্রমাগত পায়চারি করছে সে।

এভেলিনার পায়ের লঘু শব্দ কানে আসাতে সে দাঁড়াল।

কাছে এসে এভেলিনা তার কাঁধে হাত রাখল, গভীরভাবে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে, পিওতর, আমাকে বলো ত। কীসে এত কষ্ট পাচ্ছো?'

তাড়াতাড়ি ঘুরে পিওতর আবার হাঁটতে শুরু করল। এভেলিনা চলল তার সঙ্গে। কেন ও কথা বলছে না, কেন হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে, বুঝতে পারল এভেলিনা, আর মুহূর্তের জন্য মাথা নিচু করল।

বাড়ীর কাছে কে যেন গাইছে:

বন্ধুর পাহাড় চূড়ায়
শোনো ঈগলের তীক্ষ্ণ চীৎকার,
দেখ, ওরা উড়ছে, ডানা মেলে আসছে,
ছোঁ মেরে নামছে শিকারের সন্ধানে।

ভরাট নবীন গলা, দূর বলে কোমল লাগছে, প্রেম আর সুখ আর বিস্তীর্ণ মাঠের গান, সন্ধ্যার স্তব্ধতা ভেদ করে ভেসে আসছে গানের সুর, বাগানের অলস ফিস-ফিস শব্দ ছাপিয়ে।

সুখী ওরা, ওই সব যুবকেরা যারা পরিপূর্ণ উজ্জ্বল জীবনের বিষয়ে আলাপ চালায়। এভেলিনা নিজেও ত

কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত ওদেরি সঙ্গে ছিল, তারো নেশা লেগেছিল দীপ্ত জীবনের স্বপ্নে, সে জগতে পেতিয়ার কোন স্থান ছিল না। ও কখন চলে এসেছে সেটা পর্যন্ত লক্ষ্য করেনি, আর কে বলতে পারে নিঃসঙ্গতায় বিষাদের মুহূর্তগুলি কত দীর্ঘ ওর কাছে লেগেছে?

পিওতরের পাশে হাঁটতে হাঁটতে এ সব কথা এভেলিনার মনে হল। এর আগে ওর সঙ্গে কথা বলা, ওর মেজাজ বদলানো এত দুঃসাধ্য তার কখনো মনে হয়নি। কিন্তু এখনো, নিজের উপস্থিতি যে ওর বিষাদ ক্রমশ কমিয়ে দিচ্ছে সেটা বুঝতে পারল এভেলিনা।

পেতিয়ার দ্রুত পদক্ষেপ অল্পক্ষণের মধ্যেই মন্থর হয়ে এল, ওর মুখের অন্ধকার ভাবটাও কেটে যাচ্ছে। এভেলিনা পাশে আছে, তাই অন্তরের তিক্ত যন্ত্রণা কমে গিয়ে আসছে অন্য একটি কোমল ভাব—নামহীন হলেও ভাবটা তার পরিচিত, তার শুভ প্রভাবে সে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে।

'কী হয়েছে?' এভেলিনা আবার জিজ্ঞেস করল।

'এমন কিছু নয়', জবাবে বলল পিওতর, তার কণ্ঠস্বরে তিক্ততার ছাপ।

‘শুধু নিজেকে ভয়ানক অযাচিত আর অবাঞ্ছিত মনে হয়, এই যা।’

বাড়ীর কাছে গান থেমে গিয়েছে। কিছুক্ষণ নিঃশব্দতা, তারপর আর একটি নতুন গান ভেসে এল, প্রায় শোনা যাচ্ছে না সেটা, প্রাচীন বানদুরিস্তের কায়দায় অনুচ্চকণ্ঠে পুরানো উক্রেনীয় গান ছাত্রটি গাইতে শুরু করল। মাঝে মাঝে গায়কের গলা একেবারে মিলিয়ে যাচ্ছে, শ্রোতাদের অন্তরে রেখে যাচ্ছে ভাসা-ভাসা নিরাকার স্বপ্নের রেশ; তারপর আবার গাছের মর্মর ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে অস্পষ্টভাবে ভেসে আসছে সুরটি।

শোনার জন্য পিওতর কিছু না ভেবেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

বিষাদের সুরে বলল, ‘জানো, মাঝে মাঝে মনে হয় বুড়োরা যা বলে সেটা ঠিক—পৃথিবীর গতিক ক্রমশ খারাপ হচ্ছে, বেঁচে থাকা দায়। আগেকার কাল আরো ভালো ছিল, এমন কি অন্ধদের জন্যও। সে সময় জন্মালে পিয়ানো না বাজিয়ে বান্দুরা বাজাতাম। আর গ্রাম আর সহরে, দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতাম। লোকেরা আমার গান শোনার জন্য ভিড় করে আসত, আর আমি তাদের কাছে পূর্বপুরুষদের বীরত্বের আর মহিমার, তাদের সব

মহান কাজের কথা গান গেয়ে শোনাতাম। অন্ধ হলেও নিজের ঠাঁই থাকত একটা। কিন্তু এখন... এমন কি ওই বাচ্চা ক্যাডেটটা—কাঁসার মত গলা যার—সেও জীবনে কী করবে এখন থেকেই ছক করে ফেলেছে। ওর কথাবার্তা শুনেছো তো? কখন বিয়ে করতে হবে, আর কখন সৈন্যদের ভার নিতে হবে। সবাই ওর কথা শুনে হেসেছিল। কিন্তু আমি... এমন কি ওটাও আমার নাগালের অনেক বাইরে।'

আশঙ্কায় এভেলিনার নীল চোখ বিস্ফারিত হল, সন্ধ্যার ছায়ায় এক বিন্দু চোখের জল চিকচিক করছে।

'বাচ্চা স্তাভরুচেঙ্কোর কথায় তুমি কান দিয়েছো দেখছি', যতদূর সম্ভব হালকাভাবে বলল সে, নিজের উৎকণ্ঠা চাপতে চাইছে।

'হ্যাঁ, ওর কথা শুনছিলাম', আস্তে আস্তে পিওতর বলল। 'ওর গলাটা বেশ। ও কি দেখতে ভালো?'

'ভালোই', ভেবেচিন্তে বলতে শুরু করল এভেলিনা, কিন্তু হঠাৎ নিজের উপরে চটে উঠে কথাটা বন্ধ করে তীব্রস্বরে বলল, 'না, ভালো নয়, একেবারেই ভালো নয়, ওকে আমার একটুও ভালো লাগে না। ও বেজায়

আত্মম্ভরী, তাছাড়া ওর গলাও ভালো নয়, বড্ড জোরে কথা বলে ও।'

এভেলিনার হঠাৎ রাগে ঘাবড়ে গিয়ে পিওতর কিছু বলতে পারল না।

'কথার কোনো মাথামুণ্ডু নেই', মাটিতে পা ঠুকে তাড়াতাড়ি বলে চলল এভেলিনা, 'এ সব মাক্সিমের কাণ্ড, সমস্তটা ওঁর কাণ্ড, আমি জানি। বুড়ো মাক্সিমকে কী যে ঘৃণা আমি করি।'

'কী বলছো তুমি, এভেলিনা?' পিওতর বলল। 'ওঁর কাণ্ড, তার মানে কী?'

'ওঁর কাণ্ড, ওঁরি কাণ্ড এটা, আর আমি ওঁকে ঘৃণা করি', এভেলিনা জোর দিয়ে আবার বলল। 'সবকিছু এত ভেবেচিন্তে এত হিসেব করে করেছেন যে দয়ামায়ার ছিটেফোঁটা আর ওরঁ নেই, কখনো থাকলেও গলা টিপে মেরেছেন। ওদের কথা আর বোলো না। অন্য লোকের জীবনে হাত দেবার অধিকার কে ওদের দিয়েছে?'

হঠাৎ থেমে গিয়ে এত জোরে নিজের দুটো কোমল হাত এভেলিনা চেপে ধরল যে আঙুলের গাঁটগুলো মটমট করে উঠল, তারপর শিশুর মত কাঁদতে শুরু করল।

ওর হাত নিজের হাতে নিল পিওতর, কী হয়েছে ভেবে সে উদ্বিগ্ন। এই আকস্মিক উদ্বেগের কারণ বুঝতে পারল না। এভেলিনা ত বরাবরই খুব শান্ত স্বভাবের, নিজের আবেগ সে কখনো অধীরভাবে প্রকাশ করে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর কান্না শুনল পিওতর, সে কান্না তার নিজের বুকে অদ্ভুত প্রতিধ্বনি তুলছে। পুরানো কত স্মৃতি ভিড় করে এল, নিজের কথা মনে পড়ল, আজকের মত বিষণ্নভাবে টিলায় দাঁড়িয়ে আছে, আর ছোট্ট মেয়েটি তার জন্য আজকের মত কাঁদছে...।

হঠাৎ এভেলিনা হাতদুটো ছাড়িয়ে নিল, আবার অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল পিওতর, এভেলিনা হাসছে!

'আমার মত বোকা মেয়ে দেখেছো? কেন কাঁদছিলাম জানি না ত!'

চোখ মুছে এভেলিনা আবার বলল অনুশোচনায় কোমল গলায়, 'অবিচার করা আমার উচিত নয়। ওরা সত্যিই চমৎকার লোক, ওরা দুজনেই। আর যে সব নিয়ে কথা বলছিল সেগুলোও চমৎকার। শুধু — ও সব কথা সবায়ের জন্য ঠিক নয়।'

'যারা পারে তাদের প্রত্যেকের জন্য', বলল পিওতর।

'তুমি আর হাসিও না', স্পষ্টভাবে বলল এভেলিনা, ওর হাসিতে এখনো লেগে আছে কান্নার রেশ। 'মাক্সিমের কথাই ধরো না কেন—যতদিন পেরেছিলেন লড়াই করেছিলেন উনি; কিন্তু এখন পারেন না, জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছেন নিজেকে। আর আমরা ...'

' "আমরা" বোলো না। তোমার কথা একেবারে আলাদা।'

'না, আলাদা নয়।'

'কেন নয়?'

'কেন না ... আচ্ছা ... কেন না তুমি আমাকে বিয়ে করবে, করবে না? তাহলে আমাদের জীবন ত এক রকম হবে।' অবাক হয়ে পিওতর থমকে দাঁড়াল।

'তোমাকে বিয়ে করব? আমি? তুমি ... তুমি বলছো আমাকে বিয়ে করবে?'

'নিশ্চয় করব বলছি', জোর গলায় বলল এভেলিনা, উত্তেজনার তাড়নায় কথাগুলো তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করল সে। 'কী বোকা তুমি! সত্যি এটা কখনো তুমি ভাবো নি আগে? কত সহজ ব্যাপার এটা! আমাকে ছাড়া আর কাকে বিয়ে করতে তুমি, বলো ত?'

'তোমাকে নিশ্চয়ই', অনভ্যস্ত স্বার্থপরতায় পিওতর বলল, কিন্তু পর মুহূর্তে কী বলছে সেটা উপলব্ধি করে এভেলিনার হাত নিজের হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি বলতে লাগল, 'না, এভেলিনা। কথা শোনো আমার। এইমাত্র ত ওদের কথা শুনলে। সহরে মেয়েরা পড়তে পারে, অনেক কিছু শিখতে পারে। আর তুমি ... তোমার জীবনেও অনেক বড়ো কিছু ঘটতে পারে। কিন্তু আমি...'

'বেশ, তোমার কী হবে?'

'আমি ... আমি ত অন্ধ', অসংলগ্নভাবে কথাটা ও শেষ করল।

আবার শৈশবের সব স্মৃতি এল ফিরে: কোমলভাবে তীরে জল লাগছে, সেই নদীটা; এভেলিনার সঙ্গে প্রথম আলাপ, যখন তার মুখে শুনল সে অন্ধ তখন তার তিক্ত অশ্রুজল। আর সহজাত কোন বোধ তাকে থামিয়ে দিল, বুঝতে পারল ওর কথা এভেলিনাকে ঘা দেবে, সেইদিন যেমন দিয়েছিল। এক মুহূর্ত আর কোন শব্দ নেই, শুধু ফাঁকে ফাঁকে জলের ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ। এভেলিনা নিস্তব্ধ, এত নিস্তব্ধ যে মনে হচ্ছে সে এখানে নেই। সেই মুহূর্তে বাক্যহীন যন্ত্রণায় এভেলিনার মুখ বিকৃত

হয়ে গেল। কিন্তু তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে, আবার যখন কথা বলল তখন ওর গলা হালকা আর স্বচ্ছন্দ।

'তুমি অন্ধ, তাতে কী এসে যায়?' জানতে চাইল এভেলিনা। 'যদি কোন মেয়ে অন্ধ ছেলেকে ভালোবাসে, তাহলে তাকে বিয়ে না করে আর কী করবে? এইভাবেই ত সবকিছু চলে, সেটা তুমি ত জানো। তাই আমাদের আর কী করার আছে?'

'যদি কোন মেয়ে ভালোবাসে', আস্তে আস্তে পুনরুক্তি করল পিওতর, আর ওর ভুরুজোড়া চিন্তার সংহতিতে টান হয়ে এল, চেনা কথাগুলো নতুন সংজ্ঞায় চেতনায় মিশে যাচেছ। 'যদি ভালোবাসে?' এবার উত্তেজিত প্রশ্নের আরোহী স্বরে সে বলল।

'নিশ্চয়ই তাই। তুমি আর আমি—আমরা ত দুজনে দুজনকে ভালোবাসি। তুমি বড্ড বোকা! একবার ভেবে দেখ ত: আমি চলে গেলে তুমি এখানে একলা থাকতে পারবে?'

মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল পিওতরের, দৃষ্টিহীন চোখ মেলে সে তাকাল।

সাড়াশব্দ নেই। শুধূ জলের কুলকুল ধ্বনি। সে শব্দও মাঝে মাঝে ক্ষীণ হয়ে আসছে, মিলিয়ে যাচ্ছে প্রায়, কিন্তু আবার শক্তি সঞ্চয় করে ফিরে এসে শুরু করছে ঠুনঠুন কাহিনী। চেরিগাছের ঘন পত্রগুলো ভরে গেল ফিসফিস শব্দে। বাড়ীর কাছে গান শেষ হয়েছে—এবারে কিন্তু মিলের পুকুরের ধারে একটি নাইটিংগেল ইতস্তত করে ডাকতে শুরু করল।

'তাহলে মরে যাবো আমি', ভারী গলায় পিওতর বলল।

এভেলিনার ঠোঁট কেঁপে উঠল, ওদের প্রথম পরিচয়ের দিনে যেমন কেঁপেছিল।

'আমিও', চেষ্টা করে বলল সে, ওর গলা হঠাৎ ক্ষীণ আর শিশুর মত হয়ে গেল। 'তোমাকে ছেড়ে যদি একলা অনেক দূরে থাকতে হয় তাহলে আমিও মরে যাবো।'

ওর ছোট হাতে চাপ দিল পিওতর। আর আশ্চর্য এটা, প্রত্যুত্তরে যে কোমল চাপ দিল এভেলিনা আগেকার সঙ্গে তার কোন মিল নেই। আজকে ওর ছোট আঙুলের এই স্বল্প চাপ পিওতরের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করল। ছেলেবেলাকার বন্ধু শুধু নয়, তা ছাড়া নতুন আলাদা

ধরনের একটি মানুষে পরিণত হয়েছে এভেলিনা। পিওতরের নিজেকে লাগছে বলিষ্ঠ আর বীর্যবান, আর এভেলিনাকে লাগছে দুর্বল, ও কাঁদছে। গভীরতম স্নেহের আবেগে এভেলিনাকে কাছে টেনে নিয়ে ওর সিল্‌ক-মসৃণ চুলে হাত বোলাতে লাগল পিওতর।

আর মনে হল ওর অন্তরের সমস্ত ব্যথা থেমে গিয়েছে, আশা আর আকাঙ্খা নেই, জীবনে এই মুহূর্তটি ছাড়া আর কিছু নেই।

পুকুরের ধারে নাইটিংগেলটি নিজের প্রথম ইতস্তত প্রয়াসে সন্তুষ্ট হয়ে এবার ভরা গলায় গান ধরল, তীব্র আবেগের সুরে শান্ত বাগান ভরে গেল। চমকে উঠে লাজুকভাবে এভেলিনা পিওতরের আদর-করা হাত সরিয়ে দিল।

পিওতর তাকে ছেড়ে দিল তৎক্ষণাৎ, চুল ঠিক করছে ও, দাঁড়িয়ে পিওতর শুনল। গভীর, সহজভাবে পিওতরের নিশ্বাস পড়ছে। ওর বুক জোরে কিন্তু সমানে টিপটিপ করছে, সমস্ত শরীরে উষ্ণ রক্তের জোয়ার ছড়িয়ে পড়ছে, আনছে সংহত শক্তির নতুন একটি বোধ। এক মুহূর্ত পরে সহজভাবে যখন ও বলল, ‘এবারে বাড়ীতে

ওদের কাছে ফিরে গেলে হয়', তখন কথাগুলো যত নয় তত তার চেনা প্রিয় এই গলায় নতুন সুর পিওতর অবাক হয়ে শুনল।

৯

ছোট ড্রয়িং-রুমে ওরা সবাই জড়ো হয়েছে। শুধু পিওতর আর এভেলিনা নেই। মাক্সিম কথা বলছেন বুড়ো স্তাভ্রুচেঙ্কোর সঙ্গে, কিন্তু যুবকেরা খোলা জানলার কাছে চুপচাপ বসে। ঘরে অদ্ভুত মৌন একটি ভাব—আবেগের সংকট মুহূর্তে এই ধরনের স্তব্ধতা আসে, সবাই যেটা পুরোপুরি না বুঝলেও অনুভব করে। পিওতর আর এভেলিনা নেই, সেটা কেমন করে যেন সবায়ের বারবার মনে হচ্ছে। কথা বন্ধ করে মাক্সিম বারবার খোলা দরজার দিকে প্রত্যাশায় দ্রুত দৃষ্টিক্ষেপ করছেন। আন্না মিখাইলভ্না বিষণ্ন, প্রায় বিবেক-দংশনের ছাপ তার মুখে। গৃহকর্ত্রীর মত মনোযোগ দিয়ে অমায়িক ব্যবহার করার চেষ্টা সে করছে, বোঝা যায়। শুধু শ্রীপপেলস্কি, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশ মোটা হয়েছেন তিনি, নির্বিকারচিত্তে চেয়ারে বসে খাবারের অপেক্ষায় ঝিমোচ্ছেন।

বাগানের বারান্দায় পায়ের শব্দ, সবাই সেদিকে তাকাল। বারান্দার দরজার কালো ঢোকবার জায়গায় দেখা গেল এভেলিনাকে, ওর পিছনে সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে আসছে পিওতর।

সবায়ের একাগ্র দৃষ্টি তার উপরে, এভেলিনা বুঝতে পারল। কিন্তু অস্বস্তির কোন লক্ষণ সে দেখাল না। স্বভাবসুলভ ধীর পদক্ষেপে এল ঘরের ভিতরে। শুধু একবার, মাক্সিমের চোখে চোখ পড়াতে তার ঠোঁটে এল ক্ষীণ হাসির বাঁকা রেখা, চোখ ঝলসে উঠল ব্যঙ্গময় প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। আন্না মিখাইলভনার দৃষ্টি শুধু পিওতরের উপরে নিবদ্ধ।

এভেলিনাকে অনুসরণ করে পিওতর আস্তে আস্তে আসছে, ওকে দেখে মনে হল কোথায় আছে সেটা বলতে গেলে জানেই না। দরজার উজ্জ্বল আলোতে পোঁছিয়ে হঠাৎ দাঁড়াল সে, রাত্রির অন্ধকারের পটভূমিতে স্পষ্টভাবে দেখা গেল ওর পাণ্ডুর মুখ আর পাতলা শরীর। তারপর দোরগোড়া পেরিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের পিয়ানোর কাছে গেল, তখন তার মুখে অদ্ভুত অন্যমনস্ক ভাব।

জমিদার-বাড়ীর নিরিবিলি জীবনে সঙ্গীত সবাই

মেনে নিয়েছিল, কিন্তু বরাবরই সেটা ছিল নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপার, বাইরের পৃথিবী তার ভাগ পেত না। নবীন অতিথিদের গল্পগুজব আর গানে বাড়ীটি যে কদিন উচ্চকিত সে কদিন পিয়ানোর দিকে একবারও যায়নি পিওতর, যদিও স্তাভরুচেস্কোদের একজন, সঙ্গীতের ছাত্র যে, কয়েকবার পিয়ানো বাজিয়েছিল। অতিথিদের সজীব সাহচর্য থেকে যে সে এতটা পিছিয়ে পড়ত, হৈচৈ আনন্দের মধ্যে তাকে যে প্রায় লোকে ভুলেই যেত, যা দেখে ওর মা এত ব্যথা পেত, তার অন্যতম কারণ ওর সংযম। আজ এই প্রথম আস্থার সঙ্গে ওর অভ্যস্ত জায়গায় গেল পিওতর। কী করছে সেটা ঠিক বোঝেনি মনে হল, মনে হল ঘরের লোকজনকে ও ভুলে গিয়েছে। এটা সত্যি যে ও আর এভেলিনা ঢোকার পরেই সবাই এত চুপ করে গিয়েছিল যে ও ভাবতে পারত ঘরে কেউ নেই।

পিয়ানোর ঢাকনা খুলে চাবিতে কোমলভাবে আঙুল রাখল পিওতর, তারপর বাজাল কয়েকটি দ্রুত হালকা ধ্বনি, পরখ-করার, জিজ্ঞাসার রেশ তাতে। মনে হল ও কিছু একটা জিজ্ঞেস করছে, চাবিতে চাপ দিয়ে

পিয়ানোটিকে জিজ্ঞেস করছে; কিম্বা হয়ত জিজ্ঞেস করছে নিজের অন্তঃকরণকে, নিজের মনকে।

শব্দগুলি মিলিয়ে গেল, ও বসে রইল অনড়, চিন্তায় মগ্ন—পিয়ানোর চাবিতে হাতদুটি নিষ্ক্রিয়ভাবে পাতা; ঘরের স্তব্ধতা হল গভীরতর।

খোলা জানলার কালো আয়তক্ষেত্রের বাইরে রাত্রি। এখানে সেখানে পত্রবহুল দু-একটা গাছ বাড়ীর আলো পড়াতে অন্ধকার থেকে বিচ্ছিন্ন, কৌতূহলভরে যেন ঘরের দিকে তাকিয়ে আছে। অতিথিরা নিঃশব্দ প্রত্যাশায় বসে, পিওতরের ভাসা-ভাসা গৌরচন্দ্রিকা ছাপ ফেলেছে তাদের মনে, ওর পাণ্ডুর মুখ থেকে বিচ্ছুরিত অদ্ভুত একটি অনুপ্রেরণায় মোহমুগ্ধ তারা।

তখনো পিয়ানোর চাবিতে পিওতরের হাত নিশ্চল পড়ে আছে। দৃষ্টিহীন চোখ উপরের দিকে নিবদ্ধ, কী যেন শুনছে। ওর বুকে আবেগের উদ্দাম জোয়ার। অজানা অনাস্বাদিত জীবন ওকে তুলে ধরেছে, সমুদ্রের শুকনো বালুতে শান্তভাবে বহুদিন পড়ে-থাকা নৌকোকে যেমন উত্তাল ঢেউ তুলে ধরে। মুখে ওর বিস্ময়ের আর জিজ্ঞাসার ছাপ—আরো একটা কিছুর, আলোছায়ার দ্রুত পরম্পরায়

অনভ্যস্ত, প্রাণবন্ত একটা উত্তেজনা আসছে আর যাচ্ছে। ওর দৃষ্টিহীন চোখজোড়াকে গভীর আর অন্ধকার দেখাচ্ছে।

মুহূর্তের জন্য মনে হল যে জিনিসটি সবচেয়ে ব্যগ্রভাবে খোঁজ করছে ও, ভাবাবেগের প্রাবল্যে সেটা ঠিক বের করে নিতে পারছে না। কিন্তু তারপর বিস্ময় আর প্রত্যাশার ভাব না বদলালেও যেন কোন কিছুর অপেক্ষা না করে শুরু করল পিওতর, পিয়ানোর চাবির উপরে হাত তুলল, নতুন অনুভূতির ঢেউ-এ ধরা দিয়ে নিজেকে ছেড়ে দিল উচচকিত সঙ্গীতের মুখর প্রবাহে...।

## ১০

স্বরলিপি ধরে বাজানো অন্ধদের পক্ষে কঠিন। উঁচু করে বসানো সে লিপি, প্রত্যেকটি ধ্বনি-প্রকৃতির জন্য আলাদা চিহ্ন, বই-এর অক্ষরের মত সারি বেঁধে সাজানো। একসঙ্গে বাজাবার নানা ধ্বনির মধ্যকার বিস্ময়ের চিহ্ন তাদের যোগাযোগ বোঝায়। হাত দিয়ে সে লিপি পড়ে নিয়ে অন্ধ বাদককে প্রত্যেকটি অংশ মনে রাখতে হয়, দুটো হাতের জন্য আলাদা করে মনে না রাখলে বাজানো সম্ভব হয় না। দীর্ঘ শ্রমসাপেক্ষ প্রক্রিয়া এটা। কিন্তু

সঙ্গীতের সব উপাদানই পিওতর বরাবর ভালোবাসত; আর যখন দুটি হাতের জন্য আলাদা আলাদা করে কয়েকটি বার মনে রেখে সেগুলো বাজাতে বসত তখন শব্দের ঐকতানে হঠাৎ রূপান্তরিত হত সামনের সঙ্কেতলিপি— এই সব মুহূর্তে তার আনন্দ আর আগ্রহ প্রখর হত, যে নিরস শ্রমের ফলে সুরকে বশে এনেছে তার বিরক্তিকর ক্লান্তি অনেকটা কমে যেত, বরঞ্চ সে নিরস শ্রম মুগ্ধ করত তাকে।

তবুও, সুরলিপির চিহ্নগুলো আর শব্দের মাধ্যমে তাদের প্রকাশ, এ দুটোর মধ্যবর্তী প্রক্রিয়া অনেক। সঙ্গীতে রূপ নেবার আগে প্রত্যেকটি চিহ্নকে আঙুল হয়ে মাথায় যেতে হয়, মনে গেঁথে রাখতে হয় সেটিকে, আবার মাথা থেকে সেটি ফিরে আসে আঙুলের ডগায়, চাবিতে চাপ দেবার সময়। আর পিওতরের সঙ্গীতধর্মী কল্পনা শৈশব থেকেই এত প্রখর যে সেটা স্মরণশক্তির প্রক্রিয়ায় বাধা দেয়, ফলে, যারই রচিত হোক না কেন, বাজাবার সময় শেখা সুরটিতে স্পষ্টভাবে পড়ে অন্ধ বাদকের ব্যক্তিত্বের ছাপ। যে রূপে সুর প্রথমে তার চেতনায় ঘা দিয়েছিল, আর পরে যেরূপে ভরিয়ে দিয়েছিল মায়ের বাজানো,

ঠিক সেই রূপে পিওতরের সঙ্গীত-অনুভূতি গড়ে ওঠে। ওর অন্তরে সব সময়ে বাজত নিজের দেশের লোকসঙ্গীত, এই লোকসঙ্গীতের মাধ্যমেই প্রকৃতির সঙ্গে তার অন্তরের যোগাযোগ।

দুরুদুরু বুকে, উচ্ছ্বাসের জোয়ারে যে ইতালীয় সুরটি সে বাজাতে শুরু করল তার প্রথম ধ্বনি কটিতেই ব্যাখ্যানের দিক দিয়ে অস্বাভাবিক কিছু ছিল, অতিথিরা বিস্মিতভাবে এ ওর দিকে তাকাল। বাজিয়ে চলল পিওতর, আর ওরা সবাই মুগ্ধ না হয়ে পারল না, শুধু স্তাভরুচেস্কোর বড়ো ছেলে, নিজে যে সুরকার, জানা সুরটি খুঁজে বের করার কিম্বা কীভাবে সেটিকে বাজানো হচ্ছে তার বিশ্লেষণের চেষ্টা করল।

ঘর ভরে গেল সঙ্গীতে, স্তব্ধ বাগানে তার ধ্বনি প্রতিধ্বনি। নবীনেরা উত্তেজিত কৌতূহলে আর আগ্রহে শুনছে, ওদের চোখ উজ্জ্বল। বৃদ্ধ স্তাভরুচেস্কো প্রথমে চুপ করে বসেছিলেন, মাথা নিচু করে ভাবছিলেন কী, কিন্তু কিছুক্ষণ যেতে না যেতে তাঁর উত্তেজনা ক্রমশ বেড়ে গেল। কনুই দিয়ে খোঁচা দিয়ে মাক্সিমকে ফিসফিস করে হঠাৎ বললেন:

‘চমৎকার বাজনা! একেই বলে বাজানো, কী বলো?’

সুর জমাট হয়ে আসছে, খুব সম্ভব যৌবনের সব স্মৃতি বুড়ো তর্কবাগীশের মনে ভিড় করে এল, কেননা পিঠ সোজা করে বসলেন তিনি, মুখে রক্তাভা, চোখ উজ্জ্বল। হাত মুঠো করে তুললেন তিনি, যেন টেবিলে সজোরে মারবেন, কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে নিঃশব্দে হাত নামালেন শেষ পর্যন্ত।

‘বুড়োদের একধারে ফেলে রাখবে, তাই না? চেষ্টা করে দেখুক না কেন!’ ছেলেদের দিকে ক্ষিপ্র দৃষ্টিপাত করে, ফিসফিস করে মাক্সিমকে বললেন স্তাভরুচেঙ্কো। ‘তুমি আর আমি মানুষের মত মানুষ ছিলাম একদিন...। আর এখনো আছি, তাই না?’

লম্বা গোঁফে চাড়া দিলেন স্তাভরুচেঙ্কো।

মাক্সিম সাধারণত সঙ্গীতের বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। কিন্তু ছাত্রের আজকের বাজানোয় সম্পূর্ণ নতুন কিছুর আঁচ পেলেন তিনি; একাগ্রভাবে শুনছেন মাক্সিম, তামাকের ধোঁয়ার আড়ালে মাঝে মাঝে মাথা নাড়ছেন, কখনো পিওতরের, কখনো এভেলিনার দিকে তাকাচ্ছেন। আবার জীবন তাঁর ব্যবস্থায় বাধা দিচ্ছে, যেভাবে চলবে

সব ঠিক করেছিলেন একেবারেই সেভাবে নয়। আন্না মিখাইলভ্‌নাও প্রায়ই এভেলিনার দিকে তাকাচ্ছে, বুঝতে চেষ্টা করছে পিওতরের সঙ্গীতে কী বাজছে—দুঃখ না আনন্দ। বাতির শেডের নিচে বসে এভেলিনা, মুখে আলো পড়ছে না সেখানে। ছায়ায় শুধু ওর চোখের দীপ্তি, চোখ দুটি বড়ো করে খোলা, দিনের বেলার তুলনায় আরো গভীর। নিজের মত করে সুরটি বুঝছে সে; শুনতে পাচ্ছে পুরানো জলের মিলের ফাঁকে ফাঁকে জলের কুল-কুল শব্দ, ছায়াচ্ছন্ন বাগানে চেরির মর্মরধ্বনি।

১১

সুর বদলে গেছে অনেকক্ষণ। ইতালীয় রচনা ছেড়ে দিয়ে পিওতর নিজের সব কল্পনার লাগাম খুলে দিয়েছে, মাথা নিচু করে পিয়ানোর চাবিতে নিষ্ক্রিয় হাত রেখে স্মৃতিতে আচ্ছন্ন হয়ে বসে থাকার স্তব্ধ মুহূর্তগুলিতে যা কিছু তার মাথায় ভিড় করে এসেছিল, প্রকাশ করছে তাদের। তার হাতে বাজছে প্রকৃতির নানা ধ্বনি—হাওয়ার প্রবাহ আর বনের মর্মর, তীরে নদীর জলের আঘাত, আর নানা ভাসা-ভাসা অস্ফুট শব্দ, কেঁপে উঠে

আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে যায় যারা; আর সবকিছুর পিছনে গভীর হৃদয়-ভরানো সেই আবেগ, স্পষ্ট করে যেটা বোঝানো যায় না, প্রকৃতির রহস্যময় ভাসা-ভাসা শব্দ যেটা অন্তরে জাগায়। সেটিকে ব্যাকুলতা বলব? কিন্তু তাহলে সেটা এত প্রীতিকর কেন? আনন্দ, হয়ত? কিন্তু তাহলে সেটা এত গভীরভাবে, এত অসীমভাবে বিষণ্ন কেন?

মাঝে মাঝে জোরালো, প্রখরভাবে সুরটি বাজছে, আর তখন অন্ধ পিওতরের মুখে আসছে অদ্ভুত কঠোরতা — যেন নিজের অপ্রত্যাশিত সঙ্গীতের নতুন শক্তিতে সে নিজেই বিস্মিত, এর পরে কী হবে জানতে অধৈর্য, ব্যগ্র। আর কয়েকটি তান, মনে হয় তার পরেই সব কিছু সুন্দর মহান ঐকতানে মিশবেই। সেই মুহূর্তের জন্য রুদ্ধশ্বাস প্রত্যাশায় শ্রোতারা অপেক্ষা করছে। কিন্তু বেজে উঠতে না উঠতেই সুরটি ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে অদ্ভুত বিষণ্ন অস্ফুট ধ্বনিতে — যেমন ফেনায় আর জলকণায় ঢেউ ভেঙে পড়ে; আর পরে অনেক দীর্ঘ মুহূর্ত ধরে জিজ্ঞাসার, তিক্ত বিহ্বলতার সব ধ্বনি সুরটিতে ফিরে ফিরে আসছে।

তারপর হয়ত ক্ষিপ্র হাত দুটো মুহূর্তের জন্য থেমে গেল, ঘরে আবার স্তব্ধতা, শুধু বাগানের গাছের ফিসফিসানি সে স্তব্ধতা ভাঙছে। ভেঙে যাচ্ছে সেই কুহকটি যেটি ছোট এই দলটিকে আচ্ছন্ন করে নিরালা জমিদার-বাড়ী থেকে নিয়ে গিয়েছিল দূরে, অনেক দূরে। ড্রয়িং-রুমের দেয়ালগুলো আবার তাদের ঘিরছে, খোলা জানলা দিয়ে অন্ধকার রাত্রি উঁকি মারছে—যতক্ষণ না সুরকার শক্তি সঞ্চয় করে চাবির উপরে হাত তুলে আবার বাজাতে শুরু করল।

আর আবার সুরটির বিস্তার আর বৃদ্ধি, আবার কী যেন চাইছে সেটা, কী যেন জিজ্ঞেস করছে, ক্রমশ উঠছে উচ্চতর শিখরে। ক্রমাগত বদলে-যাওয়া তারের ঝঙ্কার ভেদ করে আসছে লোকগীতির সুর, সে সুরে আছে আকাঙ্খায়-ভরা প্রেমের কথা, বিগত দিনের বেদনা আর মহিমার স্মৃতি, কিম্বা যৌবনের যত উচ্চকিত উৎসব আর আশা। সঙ্গীতের বাঁধা ও চেনা রূপে তার অনুভূতি প্রকাশ করার চেষ্টা করল অন্ধ বাদক।

কিন্তু গানগুলিও ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে আর

আবার জিজ্ঞাসার ধ্বনি, একটি অমীমাংসিত সমস্যার বিষণ্ণ ধ্বনি ছোট ড্রয়িং-রুমের স্তব্ধতায় কাঁপছে।

১২

শেষ কয়েকটি ধ্বনি, অজানা বিরক্তি ও অভিযোগে পূর্ণ। ধ্বনিগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে, আন্না মিখাইলভ্না পিওতরের মুখে যে ভাব দেখল তা তার অতি চেনা। মনে এল গত বসন্তের একটি উজ্জ্বল দিন; আবার দেখল ছোট্ট পেতিয়া পড়ে আছে নদীর ধারে ঘাসের উপরে, প্রকৃতির জাগরণের অতি-প্রখর অনুভূতিতে অভিভূত।

তার ক্লেশের এই ভাব আর কারো চোখে পড়ল না। কথাবার্তায় ঘর মুখর হয়ে উঠেছে। বৃদ্ধ স্তাভরুচেঙ্কো মাক্সিমকে চেঁচিয়ে কী বলছেন, আর অল্পবয়স্কেরা সবাই খুব উত্তেজিত আর বিচলিত, পিওতরের হাতে চাপ দিয়ে বলছে ভবিষ্যতে সুরকার হিসেবে সে অনেক নাম কিনবে।

স্তাভরুচেঙ্কোর বড়ো ছেলে ঘোষণা করল, 'সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আশ্চর্য, কীভাবে আপনি

আমাদের লোকসঙ্গীতের সারটুকু ধরতে পেরেছেন, কী সম্পূর্ণভাবে তার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছেন আর সেটা আয়ত্ত করেছেন। আচ্ছা, গোড়ায় আপনি কী বাজাচ্ছিলেন?’

ইতালীয় একটি রচনার নাম করল পিওতর।

‘আমিও তাই ভেবেছিলাম’, নবীন স্তাভরুচেঙ্কো বলল, ‘সুরটা কিছুটা আমি জানি, তবে এত অদ্ভুত নিজস্ব ঢং-এ আপনি ওটা বাজালেন। অনেকে আপনার চেয়ে ভালো বাজায়, কিন্তু যেভাবে আপনি বাজালেন, সত্যি সেভাবে আর কেউ পারবে না। অনেকটা যেন ইতালীয় সঙ্গীতের ভাষা থেকে উক্রেনীয় সঙ্গীতের ভাষায় তর্জমা করার মত। আপনার আরো চর্চা করা দরকার, তারপর...’

মনোযোগ দিয়ে শুনছে পিওতর। তার বিষয়ে এত সাগ্রহ কথাবার্তা এর আগে কখনো হয়নি; নতুন একটা অনুভূতি হচ্ছে, নিজের শক্তির বিষয়ে গর্বিত উপলব্ধি। সত্যি কি তার সঙ্গীত অন্যদের এত গভীরভাবে আলোড়িত করতে পারে? আর আজ ত বাজাতে তার অনেক বেশী কষ্ট হয়েছে, বাজিয়ে এত অসন্তুষ্ট এর আগে কখনো

লাগেনি। তার মানে, জীবনে তারো কিছু করবার আছে। পিওতর চেয়ারে বসল। সবচেয়ে জোরে কথা চলছে, পিয়ানোর চাবিতে তখনো রাখা তার আঙুলে হঠাৎ উষ্ণ চাপ পড়ল। তার আঙুলে গোপনে চাপ দিতে দিতে খুসীতে ফিস্‌ফিস করে এভেলিনা বলল:

'শুনলে ত, ব্যাপারটা বুঝলে? তোমার কাজ ত তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। একবার যদি দেখতে, যদি জানতে কীভাবে আমাদের সবাইকে তুমি আজ অভিভূত করে দিয়েছিলো ...।'

চমকে উঠল পিওতর, সগর্বে সোজা হয়ে বসল। এভেলিনার দ্রুত ফিসফিস আর পিওতরের উপরে তার প্রভাব শুধু মায়ের চোখে পড়ল। দেখে তার মুখ লাল হয়ে উঠল, যেন তাকেই প্রথম আদর করছে নবীন প্রেম।

নিশ্চলভাবে বসে রইল পিওতর। আনন্দের যে নতুন জোয়ার তার অন্তরে সেটা সংযত করার চেষ্টা করছে সে। আর যে ঝোড়ো মেঘ, জগদ্দল আকারহীন মেঘ তার সত্তার অতল কোন গভীরে ইতিমধ্যেই উদ্যত, তার প্রথম ছায়া হয়ত একই সময়ে সে অনুভব করল।

# ষষ্ঠ অধ্যায়

১

পরের দিন খুব ভোরেই পিওতরের ঘুম ভাঙল। ঘরে কোন শব্দ নেই, সারা বাড়ীও চুপচাপ। দিনের চাঞ্চল্য তখনো শুরু হয়নি। সারা রাত্রি ধরে খোলা জানলা দিয়ে বাগান থেকে সকালের তাজা হাওয়া জোরে এসেছে। অন্ধ হলেও প্রকৃতির বিষয়ে পিওতরের অনুভূতি অত্যন্ত সজাগ। এখন যে খুব ভোর সেটা সে জানে। এটাও জানে যে জানলাটা খোলা, কেননা খুব কাছে থেকে গাছগুলোর সরসর শব্দ স্পষ্টভাবে আসছে, ঘরে সে শব্দ আসার কোন বাধা নেই। অন্য দিনের তুলনায় প্রকৃতির বিষয়ে তার অনুভূতি আজ অনেক প্রখর। আলো তার কাছে পৌঁছয়নি, তবুও ও জানে, সূর্য উঁকি মারছে ঘরে; এটাও জানে যে যদি জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দেয় তাহলে ঠিক বাইরের ঝোপগুলো থেকে ঝরঝর করে শিশির-বিন্দু পড়বে। তাছাড়া অন্য একটা অনুভূতিও আছে আজ, অচেনা অনাস্বাদিত

অনুভূতি একটি তার সমস্ত সত্তাকে ভাসিয়ে নিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে পিওতর বাগানে ছোট্ট একটা পাখীর কিচিরমিচির শুনল, আর অবাক হয়ে ভাবল তার হৃদয়ের এই নতুন, বিচিত্র অনুভূতির কথা।

সেটি কী? কী ঘটেছে তার? নিজেকে জিজ্ঞেস করছে, হঠাৎ পুরানো জলের মিলের ধারে কাল রাত্রের অন্ধকারে শোনা এভেলিনার কথাগুলো মনে পড়ল।

'সত্যি এটা আগে কখনো ভাবোনি?' বলেছিল ও। 'কী বোকা তুমি!...'

না, আগে কখনো ভাবেনি। এভেলিনার সান্নিধ্য বরাবর তাকে আনন্দ দিয়েছে; কিন্তু কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত সে আনন্দ সচেতনভাবে সে জানেনি, যে হাওয়া নিশ্বাসে গ্রহণ করি তার বিষয়ে যেমন আমরা সচেতন নই। স্তব্ধ জলে পাথর ফেললে যেমন আলোড়ন আসে, এভেলিনার সহজ কথাগুলো তেমন ভাবে তার হৃদয়কে আলোড়িত করেছে; পাথর লাগল, আর জলের মসৃণ চকচকে ভাব, সূর্যের আলো আর আকাশের সুদূর নীল

সে জলে প্রতিবিম্বিত, একেবারে উধাও, অতল গভীর পর্যন্ত আলোড়ন আসে।

এইভাবে নবীভূত অন্তরে, ঘুম থেকে উঠে নিজের পুরানো খেলার সাথীকে সম্পূর্ণ নতুন আলোয় দেখল পিওতর। কাল সন্ধ্যায় যা কিছু ঘটেছিল সমস্ত ফিরে এল মনে, ক্ষুদ্রতম খুঁটিনাটি পর্যন্ত; আর এভেলিনার কণ্ঠস্বর মনে ধ্বনিত হওয়াতে ওর গলার 'নতুন' স্বরে ও অবাক হয়ে গেল। 'যদি কোন মেয়ে ভালোবাসে'... আর 'কী বোকা তুমি।'

এক লাফে বিছানা থেকে উঠে, তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরে নিল পিওতর, বাগানের শিশিরে-ভেজা পথ দিয়ে দৌড়িয়ে গেল পুরানো জলের মিলে। কাল রাত্রে যেমন ঠিক তেমন ভাবে ফাঁকে ফাঁকে জলের ছলছল শব্দ আর তার চারিদিকে চেরিগাছের নিঃশ্বাস; শুধু তখন ছিল অন্ধকার আর এখন সকাল, উজ্জ্বল, সূর্যালোকে দীপ্ত। এত গভীরভাবে সে কখনো আলো 'অনুভব' করেনি, যেন সকালের তাজা ভাব আর সোঁদা গন্ধ তার শিরশির করে-ওঠা স্নায়ুকেন্দ্রে পৌঁছিয়ে দিল দিবালোকের উজ্জ্বল আনন্দের স্বল্প আভাস।

২

জমিদার-বাড়ীর জীবনযাত্রা যেমন করেই হোক সজীবতর হল, এল আরো আনন্দ। আন্না মিখাইলভ্‌নার যেন বয়স কমে গিয়েছে, আর মাক্সিম হাসিঠাট্টা করছেন শোনা যেত, যদিও তামাকের ধোঁয়ার আড়াল থেকে মাঝে মাঝে আসত অপ্রসন্ন গুরুগুরু ধ্বনি—সুদূর ঝড়ের রেশের মত। তিনি গজগজ করতেন যে এমন কয়েকজন লোক আছে যাদের কাছে জীবন শুধু বিয়ের বাজনায় শেষ হওয়া অর্বাচীন নাটকনভেলের মত; কিন্তু আমাদের পৃথিবীতে অনেক কিছু আছে যার বিষয়ে ওদের অল্প মাথা ঘামাতে হবে। আর শ্রীপপেলস্কি, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মধ্যবয়সে গোলগাল সুশ্রী চেহারা তাঁর, গালদুটো এখনো বেশ লালচে, চুলে আস্তে আস্তে পাক ধরছে —শ্রীপপেলস্কি ভাবতেন মাক্সিমের গজগজানির লক্ষ্যবস্তু তিনিই, সব সময় তাঁর কথায় সায় দিয়ে তাড়াতাড়ি কোন কাজে চলে যেতেন; এটা বলতেই হবে যে তাঁর বিষয়কর্মে কোন বিশৃঙ্খলা কখনো হত না। কিন্তু মাক্সিমের গজগজানিতে নবীনেরা হাসত শুধু, নিজেদের নানা

জল্পনায় অতি ব্যস্ত তারা। পিওতরকে ভালোভাবে গানবাজনা শিখতে হবে এবার।

ফসল তোলা শেষ, মাঠেঘাটে পাতলা সোনালি জালে নিজেকে সাজিয়ে হেমন্ত অলস তৃপ্তিতে বিশ্রামরত, পপেলস্কিদের সবাই আর এভেলিনা স্তাভরুকোভোতে রওনা হল, স্তাভরুচেঙ্কোর জমিদারীর নাম ওটা। মাত্র সত্তর ভার্স্টের পথ, কিন্তু তার মধ্যেই গ্রামাঞ্চলের চেহারা অনেক বদলে যায়। কারপেথিয়নের পাদদেশের শেষ কয়েকটি পাহাড় ভলহিনিয়া আর বুগনদী ছাড়ালে আর দেখা যায় না, তারপর শুধু উক্রেনীয় স্তেপভূমির বন্ধুর বিস্তার। এখানকার গ্রামগুলো ফলের চাষে আর বাগানে সবুজ। স্তেপ চিরে কোন কোন জায়গায় খাদ এদিকে ওদিকে গিয়েছে; দিগন্তে এখানে সেখানে উঁচু কবর, তাদের পা ঘেঁষে চাষবাস চলেছে অনেকদিন, এখন চারিদিকে হলুদ শস্যের নাড়া।

পপেলস্কিরা বাড়ী ছেড়ে এত দূর এসেছে কদাচিৎ। চেনা মাঠঘাট আর গ্রাম, যেখানে জমির সূক্ষ্মতম অংশ পর্যন্ত জানা, ছেড়ে এসে পিওতরের গতির স্বাচ্ছন্দ্য চলে গেল; নিজের দৃষ্টিহীনতা বেশী করে অনুভব করল

সে, মেজাজ কেমন অস্থির আর বিগড়ে গেল। স্তাভরুচেঙ্কোদের আমন্ত্রণ ত খুসী হয়েই গ্রহণ করেছিল। প্রেম আর জাগ্রত প্রতিভার শক্তি প্রথম যেদিন বুঝতে পারে সেই স্মরণীয় সন্ধ্যা থেকে বহির্পৃথিবী থেকে, অভ্যস্ত গণ্ডীর বাইরের অন্ধকার অজানা দৃশ্যপট থেকে আগেকার মত ও যেন হটে আসত না। সেই পৃথিবী ক্রমশ তাকে টানছে, তার উপরে প্রভাব ছড়াচ্ছে।

স্তাভরুকোভোতে দিনগুলি আনন্দে কাটল। নবীনদের সাহচর্যে পিওতরের আগেকার মত এত বাঁধো-বাঁধো ঠেকে না। ব্যগ্রভাবে ও শুনত নবীন স্তাভরুচেঙ্কোর ওস্তাদী বাজানো, কনসারভেটরির আর রাজধানীতে শোনা নানা জলসার গল্প; আর যখন কথা উঠত পিওতরের নিজের প্রতিভার, মাজা-ঘষা না হলেও যার প্রকাশ এত প্রখর, তখন স্বরকারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় পিওতর খুসীতে লাল হয়ে উঠত। নিজেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা আর না করে কথাবার্তায় যোগ দিত অন্যদের মত সহজভাবেই, হয়ত অত বাচালভাবে নয়। এভেলিনাও ত্যাগ করেছে তার কঠিন সংযমের প্রায় সদাজাগ্রত ভাব, কিছুদিন আগে পর্যন্ত যেটা তাকে ঘিরে রেখেছিল;

ওর সহজ আনন্দ, হঠাৎ ফূর্তির অদম্য উচ্ছ্বাস সবাইকে খুসী করত।

স্তাভরুকোভো থেকে প্রায় দশ ভার্স্ট দূরে একটি পুরানো মঠ, এককালে সেখানকার ইতিহাসে যে ভূমিকা নিয়েছিল তার জন্য এটি প্রখ্যাত। বারবার পঙ্গপালের মত দলে দলে তাতারেরা মঠটিকে ঘেরাও করে রক্ষাকারীদের তীরের জালে আচ্ছন্ন করেছে; কিম্বা বেপরোয়া আক্রমণ চালিয়েছে পোলীয় সৈন্যরা; অথবা, যখন পোলীয়দের হাতে, তখন কসাকেরা তাদের দুর্গটি সাহস করে আবার দখল করার জন্য যুদ্ধে নেমেছে। এখন প্রাচীন মিনারগুলোর ভগ্নস্তূপ পড়ে আছে। ধ্বসে-পড়া দেয়ালগুলো এদিকে ওদিকে খুঁটির বেড়া দিয়ে ঠেকানো, কোন বিষম শত্রুকে আটকাবার জন্য নয়, শুধু যাতে স্থানীয় চাষীদের উদ্যোগী গরুবাছুর মঠের শাকসব্জীর বাগানে না ঢুকতে পারে তার জন্য; চওড়া পরিখাগুলো জোয়ারে ভরে গিয়েছে।

দেরী-করে-আসা হেমন্তের একটি পরিষ্কার লঘু দিনে স্তাভরুচেঙ্কোরা এবং তাদের অতিথিরা মঠে রওনা হল; মাক্সিম, তাঁর বোন আর এভেলিনা গাড়ীতে,—বড়ো

পুরানো ধরনের গাড়ীটা উঁচু স্প্রিঙ-এ ভর দিয়ে দুলছে হাওয়ায়-বিক্ষিপ্ত নৌকোর মত; যুবকেরা চলল ঘোড়ায় চেপে।

অন্যদের সঙ্গে বেশ স্বচ্ছন্দে ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছে পিওতর, সঙ্গীদের ঘোড়ার খুরের আর সামনের গাড়ীর চাকার শব্দে পথ চিনে। যেরকম অবলীলাক্রমে, নির্ভয়ে যাচ্ছে, দেখলে কোন অচেনা লোকের আঁচ করা কঠিন হত যে নবীন অশ্বারোহীটি পথ দেখতে পাচ্ছে না, দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে শুধু সে ঘোড়ার সহজাত বোধকে বিশ্বাস করতে শিখেছে। পথ আর ঘোড়া দুটোই তার অপরিচিত, সে জন্য প্রথম প্রথম উৎকণ্ঠিতভাবে আন্না মিখাইলভনা বার বার ছেলের দিকে ফিরে তাকাচ্ছিল। মাক্সিমও চোরাভাবে চাইছেন, ছাত্রের বিষয়ে শিক্ষক্সুলভ জাঁক তাঁর, অর্বাচীন মেয়েলী সব ভয়ের অনেক ঊর্ধ্বে তিনি।

ছাত্র স্তাভরুচেঙ্কো গাড়ীর কাছে গিয়ে হঠাৎ বলল, 'জানেন, একটা কথা এই মাত্র মনে এল। এখানে একটা কবর আছে, সেটা আমাদের সত্যি দেখা উচিত। কিছুদিন আগে মঠের পুরানো কাগজপত্তর ঘাঁটতে ঘাঁটতে

গল্পটা জানতে পারি, দারুণ মনোগ্রাহী ঘটনাটা। আপনাদের মত হলে এক্ষুণি যাওয়া যায়, পথ ছেড়ে বেশীদূর যেতে হবে না, গ্রামের ঠিক শেষে কবরটা।'

'কবরের কথা মাথায় জাগল কেন?' হেসে জিজ্ঞেস করল এভেলিনা। 'আমরা কি এতই বিষণ্ন যে দেখে কবরের কথা মনে হয়?'

'পরে জবাব দেবো', স্তাভরুচেঙ্কো বলল, কলদ্নায়ার দিকে ঘুরে ওস্তাপের বাগানের পৈঠার কাছে গাড়ী দাঁড় করাতে কোচওয়ানকে নির্দেশ দিল।

তারপর ঘোড়া ফিরিয়ে চটপট সঙ্গীদের কাছে ফিরে এল।

অপরিসর ছোট একটি রাস্তায় গাড়ীটা ঘুরে ঢুকল, ধূলোর ভারী স্তরে চাকাগুলো খস খস শব্দে গেল ডুবে। তীরের মত গাড়ীটা পেরিয়ে রাস্তার ধারে একটা কঞ্চির বেড়ার পাশে তরুণেরা নামল ঘোড়া থেকে। ঘোড়াগুলোকে বেঁধে, গাড়ীটা এসে পড়লে মেয়েদের নামতে সাহায্য করার জন্য স্তাভরুচেঙ্কোরা ওদিকে গেল; পিওতর রইল দাঁড়িয়ে, জিনের থোবনায় হেলান দিয়ে, মাথা

নিচু করে কান পেতে একাগ্রভাবে শুনছে, এই অচেনা জায়গায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করছে।

ওর কাছে হেমন্তের এই উজ্জ্বল দিনটি অমাবস্যার রাত্রির মত, শুধু তার চারিদিকে দিনের বেলার নানা শব্দে সজীব। গাড়ীটা আসছে, তরুণ দুটির হাসি আর কথার শব্দ কানে এল। পাশের ঘোড়াগুলো বেড়ার উপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ধরছে সব্জীবাগানের ধার-ঘেঁষা লম্বা আগাছাগুলোকে, লাগামে টান পড়াতে ঠুনঠুন শব্দ হচ্ছে। পাতলা হাওয়ায় ভেসে আসছে একটি গান, আকাঙ্খায় ভরা, অলস। খুব কাছ থেকে আসছে, বাগান থেকে হয়ত। কাছের একটি ফলের বাগানে পাতার শব্দ। একটা বক খটখট করে ঠোঁট ঠোকরালো; পাখার ঝটপট আওয়াজ, মুরগী ডাকল, যেন কোন জরুরী ব্যাপার হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছে; কুয়োর কাঠ কিঁচকিঁচ করে উঠল। আর সত্যিই গ্রামটির কাজের দিন আসছে তা বোঝা যায়।

গ্রামের ঠিক প্রান্তে একটি বাগানের ধারে দাঁড়িয়েছে ওরা। আরো দূর থেকে যে সব শব্দ আসছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট একটি মঠের নিয়মিত ঘণ্টা ধ্বনি,

খুব পাতলা আর চড়া। যে ভাবে ঘণ্টাটা বাজছে তা থেকে, কিম্বা হাওয়ায় বিশেষ ধরন, অথবা অন্য কোন চিহ্ন, সেটা কী ঠিক জানে না, তা থেকে হয়ত পিওতর অনুভব করল যে মঠটি পেরিয়ে জমি কোথাও নিশ্চয়ই হঠাৎ নিচু কিম্বা অসমান হয়ে গিয়েছে—কোন ছোট নদীর খাড়া পার হয়ত; আর তারপরেই সমতল জমির দীর্ঘ বিস্তার শান্তিপূর্ণ জীবনের নানা শব্দে গুনগুন করছে। অস্পষ্টভাবে এই সব শব্দের টুকরোও তার কানে আসছে, আনছে দূরত্বের একটি শ্রবণ-নির্ভর বোধ, ঝাপসা, কম্পমান—চোখে দেখতে পারে যারা তাদের যেমন মনে হয় দূরের সব রেখা সন্ধ্যার ঝাপসা আলোয় কাঁপে।

টুপির নিচে চুলে হাওয়া লাগছে, কান ঘেঁষে যাচ্ছে কোমল গুঞ্জনে, হাওয়ায় এয়োলীয় বীণায় যেমন আওয়াজ ওঠে। ভাসা-ভাসা নানা স্মৃতি ওর মনকে নাড়া দিচ্ছে। দূর শৈশবের নানা ঘটনা বিস্মৃতির হাত ছাড়িয়ে আবার জীবন্ত হয়ে উঠছে হাওয়া স্পর্শ আর শব্দের রূপে। তার চারিদিকে খেলছে সেই হাওয়া, দূরের ঘণ্টাধ্বনি আর কাছের বাগানের আকাঙ্খা পূর্ণ গানের সঙ্গে মিশে

তাকে যেন এখানকার অতীত ইতিহাসের কোন পুরানো, করুণ গল্প বলছে, হয়ত ওকে বলছে ওর নিজের অতীতের কথা, হয়ত বা নিজের ভবিষ্যতের কথা —সে ভবিষ্যৎ অন্ধকার, দানা বাঁধেনি এখনো।

গাড়ীটা এসে পড়ল, আর সবাই দল বেঁধে পৈঠা পেরিয়ে ঢুকল বাগানে। বাগানের এক কোণে, ঘাস আর আগাছার জঙ্গলে একটি বড়ো পাথরের ফলক, চারিধারের মাটির সঙ্গে প্রায় এক স্তরে। আগুন-রাঙা ফুল ঘিরে থিসেলের সবুজ পাতা, চওড়া-পাতার বার্‌ডক্‌ আর লম্বা সরু বোঁটার কক্‌ল্‌ ছোট ছোট ঘাসের উপরে দুলে হাওয়ায় অস্ফুট শব্দ করছে, পরিত্যক্ত কবরটির উপরে তারা ফিসফিস করছে পিওতর শুনতে পেল।

'এই ত সেদিন এটা আবিষ্কার করেছি', বলল নবীন স্তাভরুচেঙ্কো। 'জানেন, কবরটা কার? প্রাচীন ইগনাত্‌ কারি'র, তখনকার কালের প্রসিদ্ধ লোক।'

'তাহলে প্রাচীন যোদ্ধা এখানে শুয়ে আছেন', আস্তে আস্তে মাক্সিম বললেন। 'কালোদ্‌নায়াতে কী করে এসেছিলেন তিনি?'

'১৭-এর ঘটনা। মঠটি তখন পোলীয় সৈন্যদের দখলে, কসাকেরা একটি তাতার দলের সঙ্গে একত্র হয়ে ঘেরাও করেছে। আর, জানেন ত, তাতারদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানোয় হামেশাই বিপদ ছিল। ওদের টাকা দিয়ে কোন উপায়ে দুর্গরক্ষীরা নিশ্চয়ই কিনে নিয়েছিল। আর একটি রাত্রে পোলীয়রা দুর্গ থেকে বেড়িয়ে হঠাৎ আক্রমণ করল, তখন তাতাররা ওদের দলে ভিড়ল। অন্ধকারে ভয়াবহ যুদ্ধ চলল। তাতাররা, আমার মনে হয়, হেরে যায়, আর মঠটি আসে কসাকদের দখলে; কিন্তু যুদ্ধে কসাকেরা তাদের নেতাকে হারায়।'

এক মুহূর্ত থেমে আবার আস্তে আস্তে বলতে লাগল সে, 'গল্পে আর একজনের নাম আছে, কিন্তু দ্বিতীয় কবর আমরা দেখতে পাইনি। মঠের কাগজপত্তরে কারির পাশে কবর-দেওয়া একটি অন্ধ বানদুরিস্তের কথা আছে। অনেক অভিযানে কারির সঙ্গে ও ছিল।'

'অন্ধ?' জিজ্ঞেস করল আন্না মিখাইলভনা, তার গলা কেঁপে গেল। 'তবু কারির সঙ্গে অভিযানে যেত?'

অন্ধকারে সেই ভয়াবহ যুদ্ধের মধ্যে নিজের অন্ধ ছেলেকে কল্পনা করল সে।

'হ্যাঁ, ও অন্ধ ছিল। আর এটা স্পষ্ট যে সারা জাপোরোজ্‌য়েতে গানের জন্য নাম ছিল ওর। অন্তত এই কথাই কাগজপত্তরে ওর বিষয়ে লেখা আছে, পোলীয়, উক্রেনীয় আর চার্চ স্লাভোনিকের বিচিত্র মিশ্রণে গল্পটি লেখা। যদি চান ত বলতে পারি, ও অংশটা প্রায় সমস্তটা আমার মনে আছে: 'আর ওর সঙ্গে ইউরকো, বিখ্যাত কসাক গায়ক, কখনো ওকে ছেড়ে যায়নি, ও তাকে ভয়ানক ভালোবাসত। কারি নিহত পড়ে আছে, ইউরকোকেও বিধর্মীর দল নিষ্ঠুরভাবে কেটে ফেলল। কারণ পৌত্তলিক বলে ওরা পঙ্গুদের শ্রদ্ধা করে না, গান রচনার আর বীণা বাজাবার গৌরবময় প্রতিভাকেও নয়, সে প্রতিভায় স্তেপের নেকড়েদেরও মন কোমল হতে পারে হয়ত, কিন্তু এই বিধর্মীদের নয়; রাত্রের আক্রমণে পঙ্গু গায়ককে ছেড়ে দিল না তারা। আর ওরা দুজন পাশাপাশি শুয়ে আছে, গায়ক আর যোদ্ধা, আর ওদের মহৎ সমাপ্তির কথা যেন চিরকাল ধ্বনিত হয়। তথাস্তু ...।'

'পাথরের চাঁইটা বড়ো', দলের একজন বলল। 'হয়ত ওটার নিচে দুজনকেই কবর দেওয়া হয়েছে।'

'হতে পারে কিন্তু শিলালিপি সব ক্ষয়ে গিয়েছে। আশা-সোঁটা আর ঘোড়ার লেজের চিহ্নটা এখনো দেখা যাচ্ছে ওপরের দিকে, কিন্তু আর কিছু নেই, শুধু শ্যাওলা।'

'দাঁড়ান, একটু দাঁড়ান', বলল পিওতর, রুদ্ধশ্বাস উৎসাহে গল্পটি এতক্ষণ সে শুনছিল।

পাথরটির কাছে হাঁটু গেড়ে বসে শ্যাওলার আস্তরণে পাতলা আঙুলে চাপ দিল সে। শ্যাওলা ভেদ করে পাথরটির কঠিন অঙ্গসংস্থান আর ওপরে খোদাই-করা অক্ষরের অস্পষ্ট ছাপ অনুভব করতে পারছে ও।

এক মুহূর্ত বসে রইল, মুখ তুলে, ভ্রূকুঞ্চিত করে। তারপর পড়ল:

'ইগনাতি, কারি নামে পরিচিত।... ঈশ্বরের নির্বন্ধে ... তাতার তীরে নিহত...'

'হ্যাঁ, অতটা আমরাও পড়তে পেরেছিলাম,' ছাত্রটি বলল।

পিওতরের টান-টানভাবে বাঁকা আঙুলগুলো পাথরের গা বেয়ে আস্তে আস্তে নামছে।

'কারি যখন মরে পড়ে আছে...'

'বিধর্মীর দল'... ব্যগ্রভাবে কথা জোগালো ছাত্রটি। 'কাগজপত্তরে এইভাবে ইউরকোর মৃত্যু বর্ণনা করা হয়েছে। তাহলে সত্যিই একই পাথরের নিচে ইউরকোও আছে।'

'হ্যাঁ, "বিধর্মীর", পিওতরও বলল। 'তাছাড়া আর কিছু বুঝতে পারছি না। না, একটু দাঁড়ান ত। আরো লেখা আছে: "তাতার তরবারিতে নিহত..." আরো কী একটা... কিন্তু সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আর কিছু নেই।'

প্রায় দেড়শ বছর আগে কবরটির উপরে বসানো পাথরটিতে নবীন বানদুরিস্তের আর সব স্মৃতিচিহ্ন ধুয়েমুছে ক্ষয়ে গিয়েছে।

এক মুহূর্তের জন্য বাগানে গভীর স্তব্ধতা। শুধু হাওয়ায় পত্রপুঞ্জ নড়ছে। তারপর ভক্তিপূর্ণ বিলম্বিত দীর্ঘশ্বাসে সে স্তব্ধতা ভেঙে গেল—অস্তাপ আসছে, বাগানের মালিক সে, এবং সেই সূত্রে এককালীন আতামানের শেষ পার্থিব বাড়িটিরও। ভদ্রজনদের অভ্যর্থনা করতে এসে যা দেখল তাতে নির্বাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সে—ঊর্ধ্বমুখ, দৃষ্টিহীন একটি যুবক কবরের

উপরে ঝুঁকে স্পর্শের মাধ্যমে পড়ার চেষ্টা করছে সেই সব অক্ষর যেগুলো কাল, ঝড় আর বৃষ্টি একযোগে মানুষের চোখের অগোচরে এতদিন রেখেছে।

গভীরতম ভক্তিতে পিওতরের উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অস্তাপ বলল, 'এটা ঈশ্বরের মহিমা, আমরা চোখ দিয়ে যা কখনো দেখি না তা অন্ধেরা পারে, ঈশ্বরের মহিমা এটা।'

ধূলোভরা রাস্তায় মঠের দিকে মন্থরভাবে গাড়ীটা আবার চলেছে; ছাত্রটি বলল, 'শ্রীমতী এভেলিনা, এখন বুঝতে পারছেন ইউরকোর কথা কেন আমার হঠাৎ মনে পড়েছিল? আমরা দু ভাই, দুজনেই খালি ভাবছিলাম কী করে একটি অন্ধ গায়ক কারি আর তার তুরন্ত দলের সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে যেতে পারে। অবশ্য হতে পারে কারি সে সময়ে প্রধান আতামান ছিল না, হয়ত কোন সৈন্য দলের নায়ক ছিল। কিন্তু এটা আমরা জানি যে কারি হামেশাই ঘোড়সওয়ারদের চালাত, পদাতিকদের নয়। আর বানদুরিস্তরা—সাধারণত তারা বুড়ো লোক, গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা চেয়ে গান গাইত। আজকে যখন আপনার পিওতরকে ঘোড়ায় চেপে যেতে দেখলাম তখনি

হঠাৎ অন্ধ কিশোরের ছবি মনে এল, ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছে, পিঠে ঝোলানো বন্দুকের বদলে বান্দুরা।'

এক মুহূর্ত থেমে ছাত্রটি আবার বলতে লাগল ভেবেচিন্তে, 'আর ও লড়াইও করত, সত্যি সত্যি হয়ত। যাই হোক না কেন, সমস্ত অভিযান, সমস্ত বিপদের অংশীদার ও ছিল। আমাদের এই উক্রেনে কী সময়ই না ছিল এক কালে!'

'কী সর্বনেশে সময়!' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আন্না মিখাইলভনা বলল।

'কী অদ্ভুত সময়!' জবাবে নবীন স্তাভরুচেঙ্কো বলল।

'ওরকমটা আর ঘটে না এখন', কর্কশভাবে পিওতর বলল। গাড়ীর পাশে এসে নবীন স্তাভরুচেঙ্কোর সঙ্গে এইমাত্র যোগ দিয়েছে সে। ভুরু তুলে এক মুহূর্ত কান পেতে রইল, অন্য ঘোড়াগুলোর চলন আঁচ করে তার ঘোড়াকে গাড়ীর পাশে পাশে চালাল। ওর মুখ অপেক্ষাকৃত বিবর্ণ, গভীর বিক্ষোভের ছাপ তাতে ধরা পড়ছে।

'ও সবের চিহ্ন মাত্র আর এখন নেই', আবার বলল পিওতর।

'যাবার যা ছিল তা গিয়েছে', মাক্সিম বললেন, তাঁর গলায় কঠোরতার আভাস। 'ওরা নিজেদের কালে নিজেদের মত বেঁচেছিল। তোমাদের কালে কী ভাবে বাঁচা উচিত সেটা তোমাদের খুঁজে নিতে হবে।'

'ওটা বলা আপনার পক্ষে সহজ', ছাত্রটি বলল। 'জীবনের কিছুটা ত আপনি পেয়েছিলেন।'

'তা বটে, আর জীবনও আমার কাছ থেকে কিছু নিয়েছে,' বললেন গারিবালদির বৃদ্ধ অনুচর ক্রাচের দিকে তাকিয়ে, মুখে তাঁর কঠোর হাসি।

মুহূর্তকাল চুপ করে মাক্সিম বলে চললেন, 'বয়সকালে পুরানো কসাক দিনগুলোর স্বপ্ন আমিও দেখেছিলাম— উদ্দাম কাব্য আর স্বাধীনতার স্বপ্ন। আমি ত সত্যি সত্যি তুরস্কে চলে গিয়েছিলাম, সাদিকের * সঙ্গে কাজ করার জন্য।'

যুবকেরা ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করল, 'কী হল তারপর?'

---

* সাদিক-পাশা — চাইকোভ্স্কি নামে একজন উক্রেনীয় ভাবুক, তিনি তুরস্কে কসাকদের একটি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করবেন ভেবেছিলেন।

'তোমাদের "স্বাধীন কসাকরা" যথেচ্ছাচারী তুর্কদের নিমক খেয়ে কী করে দেখে আমার সব স্বপ্ন রাতারাতি উবে গেল। একেবারে সং-পনা, ইতিহাসের নামে ভাঁড়ামি! বুঝতে পারলাম যে ওসব ভড়ং আর অলঙ্কার ইতিহাস জঞ্জালের স্তূপে ফেলে দিয়েছে; বুঝতে পারলাম যে আদর্শটা কী সেটাই আসল কথা, খোলসটা নয়, যতই চটকদার দেখাক না কেন সেটা! আর সেই জন্যই ইতালিতে গেলাম। সেখানে লোকেরা একটা আদর্শের জন্য লড়াই করছিল, তার জন্য প্রাণ দিতে রাজী ছিলাম, যদিও ওদের ভাষা আমি জানতাম না।'

মাক্সিম এখন গম্ভীর, আবেগের সঙ্গে কথা বলছেন, তাতে কথাগুলো আরো জোর পাচ্ছে। বৃদ্ধ স্তাভরুচেঙ্কো আর তাঁর ছেলেদের উচ্চকণ্ঠ বিতর্কে মাক্সিম যোগ দিতেন কদাচিৎ, ওদের উচ্ছ্বাস দেখে মুখ টিপে হাসতেন শুধু, আর তিনি যেন ওদের পক্ষে এইভাবে সমর্থন চেয়ে যুবকেরা আবেদন করলে অমায়িকভাবে হাসতেন। কিন্তু আজ শ্যাওলায় ঢাকা কবরটি সবাই যখন ঝুঁকে পড়ে দেখছিল তখন পুরানো ঘটনাটির ছবি জীবন্তভাবে উঠে এসেছিল সামনে, নাড়া দিয়েছিল তাঁকে; তাছাড়া তিনি

অনুভব করেছিলেন যে সুদূর অতীতের এই ঘটনাটির তাৎপর্য বিচিত্রভাবে বর্তমানেও নিহিত আছে — আছে পিওতরের জন্য, আর পিওতরের মধ্য দিয়ে সবায়ের জন্য।

এবারে যুবকেরা তর্ক করার কোন চেষ্টা করল না, হয়ত অস্তাপের বাগানে অতীত দিনগুলির মৃত্যুমুখর পাথরের ফলকটির পাশে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ আগে যে অনুভূতিটি হয়েছিল সেটি তাদের বাধা দিল; কিম্বা হয়ত বৃদ্ধ সৈনিকের আন্তরিক সুর তাদের মনে ছাপ ফেলেছে।

'তাহলে আমাদের করবার আর কী রইল?' মাক্সিমের কথার পরে সবাই চুপ হয়ে গিয়েছিল, স্তব্ধতা ভেঙে ছাত্রটি জিজ্ঞেস করল।

'লড়াই করতে হবে, সে লড়াই-এর শেষ নেই', উত্তর দিলেন মাক্সিম।

'কোথায়? কী ভাবে?'

'সেটা বের করতে হবে তোমাদের।' সংক্ষিপ্তভাবে বললেন মাক্সিম।

তাঁর স্বভাবসুলভ আধা-ব্যঙ্গের সুর এখন নেই, মনে হল গভীরভাবে আলোচনা করতে তিনি ইচ্ছুক।

কিন্তু গভীর আলোচনার আর সময় ছিল না। মঠের দরজার কাছে গাড়ীটা এসে গিয়েছে। পিওতরের ঘোড়াকে থামাবার জন্য ছাত্রটি হাত বাড়াল। খোলা বই-এর মত অন্ধ পিওতরের মুখ, গভীর আবেগে এখনো ও বিচলিত, সেটা বোঝা যাচ্ছে।

৩

মঠে যারা যেত তারা সাধারণত পুরানো গির্জায় কিছুক্ষণ ঘুরে ঘণ্টাঘরে উঠত, সেখান থেকে আশেপাশের গ্রামাঞ্চলের বিস্তৃত দৃশ্য দেখা যায়। পরিষ্কার দিনে একদৃষ্টে তাকালে দূর অঞ্চলের প্রধান সহরের শাদা শাদা ছোপ আর দিগন্তে বিলীন দ্‌নেপ্রের ঝকঝকে বাঁক চেনা যায়।

মঠের একটি কুঠরীর ছোট্ট প্রবেশদ্বারের পাশে মাক্সিমকে জিরোতে দিয়ে যখন অন্যান্যরা ঘণ্টাঘরের বন্ধ দরজার কাছে পৌঁছল তখন সূর্য ডুবতে শুরু করেছে। খিলান-দেওয়া প্রবেশপথে একটি নবব্রতী ওদের উপরে নিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করছে দেখল—পাতলা চেহারা তার, পরনে জুব্বা, মাথায় টুপি। দরজার দিকে পিঠ করে দাঁড়াল তালার উপরে হাত রেখে। ঠিক তার

নাগালের বাইরে শিশুদের একটি ছোট্ট দল সন্ত্রস্ত চড়ুই-এর মতো সজাগ। বোঝা গেল যে নবব্রতী আর অস্থির বাচ্চাগুলোর মধ্যে কিছু একটা গোলমাল ঘটেছে। যেভাবে তালায় হাত রেখে যুদ্ধং দেহি ভাবে নবব্রতী দাঁড়িয়ে আছে তাতে মনে হচ্ছে খুব সম্ভব বাচ্চাগুলো ভদ্রলোকরা উপরে যাবার সময় চট করে ঢুকে পড়বার মতলবে দরজার আশেপাশে ঘুরছিল, সে সময় ওদের ধরে ফেলেছে ও আর ভাগিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। ওর মুখে রাগের রক্তাভা, চামড়ার পাণ্ডুরতার বৈসাদৃশ্যে আরো প্রখর।

নবীন নবব্রতীর চোখ দেখে অস্বাভাবিক একটা কিছু মনে হচ্ছিল, চোখদুটো একেবারে অনড়। ওর দৃষ্টির এই অনড়তা আর মুখের বিচিত্র ভাব প্রথমে আন্না মিখাইলভনার নজরে পড়ল। কেঁপে উঠে সে এভেলিনার হাত চেপে ধরল। চমকে উঠল এভেলিনা, ফিসফিস করে বলল, 'ও ত অন্ধ।'

'চুপ', পিওতরের মা বলল। 'আর... দেখছো?'

'হ্যাঁ।'

সহজেই চোখে পড়ে সেটা — পিওতর আর নবব্রতীর মুখের অদ্ভুত আদল। মুখে সেই এক রকমের স্নায়বিক

পাণ্ডুরতা, স্পষ্ট কিন্তু অনড় চোখের মণি, চঞ্চল অস্থির ভুরুজোড়া প্রতিটি নতুন শব্দে ওঠাপড়া করছে, ভয়-পাওয়া পোকার শুঁয়োর মত। নবব্রতীর মুখাবয়ব পিওতরের চেয়ে কর্কশ, ওর গঠন আরো তীক্ষ্ণ গোছের, কিন্তু তার ফলে সাদৃশ্যটি আরো স্পষ্ট মনে হয়। আর যখন দমকা কাশতে স্বরু করল ও, হাতদুটো ক্ষীণ বুকে চট করে চলে এল, তখন আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে আন্না মিখাইলভনা ওর দিকে তাকিয়ে রইল, যেন কোন ভৌতিক ছায়ামূর্তি দেখছে।

কাশির বেগ থেমে গেলে দরজা খুলল নবব্রতী, কিন্তু রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে রইল।

'আশেপাশে কোন বাচ্চা নেই ত?' কর্কশকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, তারপর হঠাৎ সামনে তেড়ে গিয়ে বাচ্চাদের চেঁচিয়ে বলল, 'ভাগ এবার, হতচ্ছাড়ারা!'

এক মুহূর্ত পরেই, নবীনেরা যখন সার বেঁধে ওকে পেরিয়ে ঘণ্টাঘরে উঠছে তখন ওর মধু-ঢালা গোছের অনুরোধের স্বর ওদের কানে এল:

'ঘণ্টাবাদকের কি কিছু একটা মিলবে, সামান্য কিছু? পথ দেখে চলুন, ভেতরটা অন্ধকার।'

সিঁড়ির তলায় দলের সবাই জড়ো হল। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত আন্না মিখাইলভনা খাড়া কঠিন আরোহণের কথা ভেবে ইতস্তত করছিল, এখন মূক বশ্যতায় অন্যদের অনুসরণ করল।

অন্ধ ঘণ্টাবাদক দরজা বন্ধ করে তালা দিল...। বুরুজের ভিতরটা বেশ অন্ধকার হয়ে গেল, কিছুক্ষণ কেটে গেলে পরে আন্না মিখাইলভনা উপরে দেখল আলোর মৃদু রেখা, ভারী পাথরের দেয়ালের একটি কোণাকুণি ফাঁক থেকে সেটা আসছে। গম্বুজের এদিক থেকে ওদিকে তির্যকভাবে পড়ে রেখাটি বিপরীত দেয়ালের এবড়ো-খেবড়ো ধূলাচ্ছন্ন পাথরে ফেলছে ক্ষীণ আভা।

অল্পবয়স্কেরা ইতিমধ্যে তাড়াহুড়ো করে ঘোরানো সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করেছে, ওদের এগিয়ে যেতে দিয়ে আন্না মিখাইলভ্না তখনো সিঁড়ির তলায় অনিশ্চিতভাবে দাঁড়িয়ে।

বুরুজের বাইরে হঠাৎ বাচ্চাদের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'আমাদের ঢুকতে দাও, দোহাই তোমার, খুড়ো! খুব ভালো লোক তুমি!'

ঘণ্টাবাদক কিন্তু ক্রুদ্ধভাবে দরজায় ঝাঁপিয়ে পড়ে লোহার গায়ে ঘুঁষি মারতে লাগল।

'ভাগ তোরা, হতচ্ছাড়া যত সব', কর্কশকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল ও, রাগে দম বন্ধ হয়ে আসছে, 'তোদের মাথায় বাজ পড়ে না কেন!'

'অন্ধ শয়তান!' জোরে চেঁচিয়ে বলল কয়েকজন; খালি পায়ে কয়েকজন দৌড়িয়ে পালাচ্ছে তার শব্দ কানে এল।

ঘণ্টাবাদক মুহূর্ত খানেক দাঁড়িয়ে শুনল, তারপর দ্রুত নিঃশ্বাস নিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'জাহান্নামে যা তোরা! কতকাল আর জ্বালাবি! দম আটকে মর তোরা!' তারপর একেবারে অন্য স্বরে, সহ্যাতীত যন্ত্রণা যে গভীর হতাশা আনে তার স্বরে বলল, 'হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, আমাকে পরিত্যাগ করেছো কেন?'

সিঁড়ির দিকে সরে যেতে ধাক্কা লাগল আন্না মিখাইলভনার সঙ্গে, সিঁড়ির তলায় দাঁড়িয়ে তখনো ইতস্তত করছিল সে।

'কে? কী করছ এখানে', তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল ঘণ্টাবাদক, কিন্তু তারপরে অপেক্ষাকৃত নরম

গলায় বলল, 'ঠিক আছে। ভয় পাবেন না, আসুন, আমার হাত ধরুন।'

আর আবার, সিঁড়িতে উঠতে উঠতে দোরগোড়ায় যেমনভাবে বলেছিল তেমন বিরক্তিকর মিহি গলায় আবেদন জানাল: 'ঘণ্টাবাদকের কি কিছু একটা মিলবে, সামান্য কিছু?'

অন্ধকারে ব্যাগ হাতড়ে আন্না মিখাইলভনা ওকে একটা নোট দিল। ঝট করে নিল সেটা। ততক্ষণে ওরা দেয়ালের সঙ্কীর্ণ ফাটলের স্তরে এসেছে, ঝাপসা আলোয় আন্না মিখাইলভনা দেখল ও নোটটা গালে চেপে ধরছে, সযত্নে আঙুল দিয়ে দেখছে। অদ্ভুত, ক্ষীণ সেই আলোয় ওর পাণ্ডুর মুখ—পিণ্ডতরের মত মুখ—অকপট লোভের আনন্দে হঠাৎ বেঁকে গেল।

'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ', চেঁচিয়ে বলল ও। 'পঁচিশ রুবল! ভেবেছিলাম আমাকে ধাপ্পা দিচ্ছেন, অন্ধকে নিয়ে ঠাট্টা করছেন শুধু। অনেকে ত করে...।'

অবিরল অশ্রুধারায় দুর্ভাগা নারীটির মুখ ভিজে গেল। তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে অন্যদের কাছে যাবার জন্য এগোল সে, অনেক এগিয়ে গিয়েছে ওরা, ওদের

কণ্ঠস্বর আর পায়ের শব্দ সিঁড়ি বেয়ে বিরস প্রতিধ্বনিতে ফিরে আসছে—পাথরের দেয়ালের আড়াল থেকে শোনা পড়ন্ত জলের শব্দের মত।

অনেক উঁচুতে সিঁড়ির একটা মোড়ে ওরা দাঁড়াল, সেখানে সঙ্কীর্ণ একটা জানলা দিয়ে অল্প অল্প হাওয়া আর আলোর ক্ষীণ রেখা আসছে, আলোটা খুব ঝাপসা, কিন্তু নিচেকার আলোর চেয়ে স্পষ্ট। এখানে দেয়াল মসৃণ, অনেক কিছু লেখা তাতে, বেশীর ভাগই কোন না কোন সময়ে ঘণ্টাঘরে যারা এসেছে তাদের স্বাক্ষর।

অনেকের নাম নবীন স্তাভরুচেঙ্কোদের চেনা, এক একটা চিনছে, আর হাসি আর ঠাট্টার রোল উঠছে।

'কিন্তু এখানে অন্য গোছের একটা কী দেখছি,' ছাত্রটি বলে উঠল, জড়িয়ে হিজিবিজি করে লেখা উক্তিটি আস্তে আস্তে পড়ল: 'রওনা হয় অনেকে; গন্তব্যে পৌঁছয় মাত্র কয়েকজন।' হেসে উঠে বলল, 'এই সিঁড়ি ভাঙ্গা নিয়ে লিখেছে বোধ হয়।'

'মর্জি হলে ওটার অর্থ আপনি ঘুরিয়ে নিতে পারেন', স্তাভরুচেঙ্কোর দিকে কান ফিরিয়ে রূঢ়ভাবে ঘণ্টাবাদক বলল, চঞ্চল ভুরুজোড়ায় ওর উত্তেজনা ধরা পড়ছে। 'একটু নিচে একটা কবিতাও আছে, সেটা পড়লে আপনার ক্ষতি হবে না।'

'কবিতা? কোথায়? এখানে ত নেই।'

'খুব নিশ্চিত আপনি, নয় কি? কিন্তু আছে একটা, বলছি আপনাকে। আপনাদের যাদের চোখ আছে তাদের কাছ থেকে অনেক জিনিস লুকানো থাকে।'

দু এক ধাপ নেমে, দেয়ালের যে অংশটা ঠিক আলোর ক্ষীণ রেখার বাইরে, সেখানে হাত বোলাল সে।

'এই ত এখানে', ও বলল। 'কবিতাটি সুন্দরও বটে। তবে লণ্ঠন ছাড়া আপনারা পড়তে পারবেন না, এই যা।'

পাশে গিয়ে পিওতর দেয়ালে হাত বোলাল, আর নিমেষেই কঠোর পংক্তিগুলো খুঁজে পেল সে, কেউ একজন, হয়ত শতাধিক বছর আগে পাথর কেটে লিখেছিল ওগুলো :

স্মরণে রেখো অন্তিম মুহূর্তের কথা,
শেষ বিচারের দিন মনে রেখো,
ভুলো না একদিন জীবন শেষ হবেই,
নরকের আগুনের কথা স্মরণে রেখো।

'মজার কথা বটে!' ছাত্রটি মন্তব্য করল, কিন্তু যে কারণেই হোক ঠাট্টাটা মোটেই জমল না।

'ভালো লাগছে না আপনার, তাই ত?' বিদ্বেষের সুরে ঘণ্টাবাদক বলল। 'অবশ্য আপনার বয়স কম, তবু... কে বলতে পারে? রাত্রির অন্ধকারে চোরের মত অন্তিম মুহূর্ত লুকিয়ে আসে।' গলার সুর একটু বদলে বলে চলল, 'কবিতাটা চমৎকার। "স্মরণে রেখো অন্তিম মুহূর্তের কথা, শেষ বিচারের দিন মনে রেখো।" ' আবার বিদ্বেষের সুরে বলল, 'হ্যাঁ, তারপর আমাদের কী হয়, সেটাই আসল কথা।'

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে ঘণ্টাঘরের নিচের দিকের প্ল্যাটফর্মে অবিলম্বে পৌঁছল ওরা। জায়গাটা খুব উঁচু, কিন্তু দেয়ালের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল আর একটি সিঁড়ি। প্রথমটার চেয়ে খাড়া আর অপরিসর, সেটা ধরে ওরা এল উপরের আরো উঁচু প্ল্যাটফর্মে। সামনে সুন্দর

বিস্তৃত দৃশ্যপট। পশ্চিমে অস্তগামী সূর্য নিচু জমিতে দীর্ঘ ছায়া ফেলছে; পূবের আকাশ ভারী মেঘে অন্ধকার। দূরে প্রদোষে সবকিছু ঝাপসা আর অস্পষ্ট, শুধু সূর্যের রশ্মি এখানে সেখানে কোন চাষীর চুনকাম-করা বাড়ীর উপরে আড়া-আড়ি ভাবে পড়ে নীল ছায়া থেকে ওটাকে আলাদা করে ধরছে, কিম্বা চুনী-লালে আঁকছে কোন জানলার কাঁচকে, সূর্যের আলোয় ঝকঝক করে উঠছে দূরের কোন ঘণ্টাঘরের ক্রুশ।

ছোট দলটি স্তব্ধ হয়ে গেল। ওদের চারিদিকে বইছে হাওয়া, তাজা, অনাবিল, এত উঁচুতে পৃথিবীর সব ছোঁয়াচ থেকে মুক্ত। ঘণ্টার দড়ি আর ঘণ্টাগুলো নিয়ে সে হাওয়া খেলছে, মাঝে মাঝে কেঁপে উঠে ঘণ্টাগুলো, ক্ষীণ বিলম্বিত ধাতব ধ্বনি করছে, মনে হচ্ছে দূরাগত সঙ্গীত কোন, কিম্বা ঘণ্টাগুলোর তাম্র মর্মস্থানে ধ্বনিত কোন দীর্ঘশ্বাস হয়ত। স্তব্ধ গ্রামাঞ্চল প্রশান্তিতে মগ্ন।

ঘণ্টাঘরের প্ল্যাটফর্মে যে সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল তার আর একটি কারণ আছে। কোন সহজাত প্রবৃত্তির ঝোঁকে, উচ্চতার উপলব্ধি আর অসহায়ভাবের জন্য খুব সম্ভব অন্ধ যুবক দুটি কোণের থামগুলোয় ভর দেবার জন্য

সরে গিয়েছে, হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে, নরম হাওয়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে।

ওদের চেহারার বিচিত্র সাদৃশ্য প্রত্যেকের চোখে পড়ছে। ঘণ্টাবাদকের বয়স একটু বেশী। ওর ক্ষয়ে যাওয়া শরীরের কাঠামোয় ভারী ভাঁজে ভাঁজে পড়েছে ভরাট জুব্বাটা; পিওতরের তুলনায় ওর মুখাবয়ব স্থূল, আরো ফরসা। আরো কর্কশভাবে গড়া। খুঁটিয়ে দেখলে আরো কিছু পার্থক্য চোখে পড়ে। ওর চুল সোনালী রঙের, নাকটা একটু বাঁকা, ঠোঁটদুটো পিওতরের চেয়ে পাতলা। ছোট কোঁচকানো দাড়ি, গোঁফের ক্ষীণ রেখা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু চেহারার আশ্চর্য আদল, প্রায় পারিবারিক সাদৃশ্য সেটা, ধরা পড়ে ওর অঙ্গভঙ্গীতে, ঠোঁটের বিচলিত ভাঁজে ভুরুর, অবিরাম চঞ্চলতায়; এ ধরনের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখা যায় অনেক কুঁজোর মধ্যে।

পিওতরের মুখের ভাব ওর চেয়ে একটু বেশী প্রশান্ত। যে বিষণ্ণতার ভাব ওর অভ্যাসগত, সেটা ঘণ্টাবাদকের মুখে পরিণত হয়েছে প্রখর তিক্ততায়, মাঝে মাঝে মর্মভেদী বিদ্বেষের ছাপে। অবশ্য এখন ওর মুখে এসেছে কোমলতর ভাব—যেন নরম হাওয়া ওর কপালের

বলিরেখাকে মিলিয়ে দিয়েছে, নিচেকার পৃথিবীর স্তব্ধ শান্তিতে ভরে দিয়েছে ওর অন্তর, যদিও সে পৃথিবী ওর চোখের অগোচর। ওর ভ্রূকুঞ্চন ক্রমশ কমে আসছে।

তারপর হঠাৎ ওর ভুরুজোড়া দ্রুত উপরে উঠে গেল, পিওতরেরও, যেন দুজনেই নিচের উপত্যকায় কোন শব্দ শুনেছে, অন্য কারো কানে যে শব্দ আসেনি।

'গির্জার ঘণ্টা', বলল পিওতর।

'পোনেরো ভার্স্ট দূরে সেণ্ট ইয়েগরি'র গির্জা থেকে ওটা আসছে', ঘণ্টাবাদক বলল। 'ওরা রোজই আমাদের চেয়ে আধ ঘণ্টা আগে সন্ধ্যার প্রার্থনা শুরু করে ওটা বাজায়। তাহলে তোমার কানে এসেছে শব্দটা? আমিও শুনতে পেয়েছি। বেশীর ভাগ লোক কিন্তু পারে না।'

স্বপ্নালসভাবে ও বলে চলল, 'এখানে উঠলে চমৎকার লাগে। বিশেষ করে উৎসবের দিনে। আমার ঘণ্টা বাজানো কখনো শুনতে পাও?'

প্রশ্নটি করল, সরল গর্বের সুরে। 'একদিন এসে আমার ঘণ্টা বাজানো শোনো না কেন? ফাদার পামফিলি, ওঁকে ত চেনো, চেনো না? উনি এই দুটো নতুন ঘণ্টা আনিয়েছেন, বিশেষ করে আমার জন্য।'

থাম ছেড়ে দুটো ছোট ঘণ্টায় টোকা দিল ও, কালের ছাপে অন্যান্য ঘণ্টার মত কালো হয়ে যায়নি এখনো সে দুটো।

'চমৎকার ঘণ্টা দুটো। কী রকমভাবে বাজে, সত্যি কেমন সুন্দর বাজে! বিশেষ করে ইস্টারটাইডের সময়ে।'

হাত বাড়িয়ে ঘণ্টার দড়ি ধরে, ক্ষিপ্র আঙুলে সুরেলাভাবে নাড়িয়ে দিল দুটোকে। এত হালকা অথচ এত স্পষ্টভাবে কণ্ঠিদুটো ঘণ্টায় লাগল যে কাছের দলের সবাই ধ্বনিটি শুনতে পেলেও ঘণ্টাঘরের প্ল্যাটফর্ম থেকে একটু দূরেই কারোর কানে শব্দটা প্রায় পৌঁছত না।

'আর ওই বড়ো ঘণ্টাটাও শোনা উচিত—গমগম আওয়াজ করে ওটা।'

শিশুসুলভ আনন্দে ওর মুখ উজ্জ্বল; কিন্তু ওর আনন্দতেও রুগ্ন করুণ কী একটা ছিল।

হঠাৎ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ও বলে চলল, 'ফাদার পামফিলি—হ্যাঁ, তিনিই আমার জন্য ঘণ্টাদুটো আনান, কিন্তু গরম কোট একটা কিছুতেই দিচ্ছেন না আমাকে। ভয়ানক কিপ্‌টে লোক। এই ঘণ্টাঘরে আমার ঠাণ্ডা

লাগল আর হেমন্তই সব চেয়ে খারাপ সময়। দারুণ ঠাণ্ডা এখানে...।'

কী একটা শুনে ও চুপ করল, তারপর বলল:

'ঘোঁড়াটা নিচে থেকে ডাকছে। আপনাদের নামার সময় হয়েছে।

প্রথমে এভেলিনা পা বাড়াল, এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মত ঘণ্টাবাদককে সে দেখছিল।

'হ্যাঁ, আমাদের যাওয়া উচিত এবার,' সে বলল।

সিঁড়ির দিকে গেল সবাই। ঘণ্টাবাদক কিন্তু নড়ল না আর পিওতর মা'র পিছনে যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

আদেশ করার ভঙ্গীতে পিওতর বলল, 'আমার জন্য অপেক্ষা কোরো না। আমি এক্ষুণি যাচ্ছি।'

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। শুধু কয়েক ধাপ নিচে এভেলিনা দাঁড়িয়ে আছে। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আন্না মিখাইলভনাকে চলে যেতে দিয়েছে সে, আর এখন রুদ্ধশ্বাস প্রত্যাশায় অপেক্ষা করছে।

অন্ধ যুবক দুজন ভাবল তারা একলা। মুহূর্তের জন্য অনড়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল তারা, অস্বস্তিকর স্তব্ধতায়, কী যেন শুনছে।

'এটা কে?' জানতে চাইল ঘণ্টাবাদক।

'আমি', জবাব দিল পিওতর।

'তুমিও অন্ধ, তাই না?'

'হ্যাঁ। আর তুমি—কতদিন ধরে অন্ধ তুমি?' পিওতর জিজ্ঞেস করল।

'জন্ম থেকেই। রমান এখন ঘণ্টা বাজাতে আমাকে সাহায্য করে, সাত বছর বয়সে ও অন্ধ হয়ে যায়। আচ্ছা, তুমি দিন রাত্রির তফাৎ ধরতে পারো?'

'পারি।'

'আমিও পারি। আলো আসছে ধরতে পারি। রমান কিন্তু পারে না। কিন্তু যাই হোক, ওর পক্ষে আলো ধরতে পারা আরো সহজ।'

'কেন?' ব্যগ্রভাবে পিওতর জিজ্ঞেস করল।

'কেন? কেন জানো না? ও ত আলো দেখেছে। নিজের মাকে দেখেছে ও। বুঝতে পারছো? রাত্রে যখন ঘুমোয় তখন স্বপ্নে ও মাকে দেখে। ওর মার বয়স হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আগেকার মত দেখে ও, এই যা। তুমি কখনো স্বপ্নে তোমার মাকে দেখ?'

'না', বিরসভাবে পিওতর বলল।

'সত্যি, দেখবে কী করে? জন্মাবার পরে অন্ধ হলে দেখা যায়। কিন্তু অন্ধ হয়ে জন্মালে...'

পিওতরের মুখে গম্ভীর ছায়া পড়েছে, যেন তাকে ঘিরেছে কোন ঝোড়ো মেঘ। অনড় চোখের উপরে হঠাৎ ঘণ্টাবাদকের ভুরুজোড়া উঠল, অন্ধ যন্ত্রণার ভঙ্গীতে, সে ভঙ্গীটা এভেলিনার বিশেষ চেনা।

'যতই সাবধানে থাকুক না কেন, লোকে কোন না কোন সময়ে পাপ করবেই। হে ঈশ্বর, আমাদের সৃষ্টিদাতা! কুমারী মেরি, ঈশ্বরের জননী! একবার, অন্তত একবার স্বপ্নেই না হয় আমাকে আলো আর আনন্দ দেখতে দাও...।'

মুখ বিকৃত হয়ে গেল ওর, আগেকার মত তিক্ততায় বলে চলল:

'কিন্তু না, ওরা এমন কি সেটাও দেখতে দেবে না। মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি, তবে এত ঝাপসা সব স্বপ্ন যে জেগে উঠে আর মনে করতে পারি না...'

হঠাৎ চুপ করে গেল ও, কান পেতে শুনছে। বিবর্ণ হয়ে গেল, অদ্ভুত একটা বিক্ষোভের খিঁচুনী সমস্ত মুখ বিকৃত করে দিল।

'শয়তানরা ঢুকেছে', রাগতভাবে বলল।

আর সত্যিই, সঙ্কীর্ণ সিঁড়িতে ধ্বনিত হচ্ছে বাচ্চাদের চীৎকার আর পায়ের শব্দ, যেন বন্যার জল গর্জিয়ে এগিয়ে আসছে। তারপর নিমেষের জন্য সব শব্দ থেমে গেল। খুব সম্ভব বাচ্চারা নিচের প্ল্যাটফর্মে পৌঁছিয়েছে, ওদের চেঁচামেচির শব্দ বাইরে চলে যাচ্ছে। কিন্তু পর মুহূর্তেই উপরের সিঁড়ি কোলাহলে ভরে গেল, আর ফূর্তিতে উচ্ছল বাচ্চার দল এভেলিনাকে পেরিয়ে দৌড়িয়ে এল ঘণ্টাঘরের প্ল্যাটফর্মে। উপরে এসে এক মুহূর্ত থামল তারা, তারপর একে একে চট করে প্রবেশ পথ পেরিয়ে ঢুকে পড়ল, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ঘণ্টাবাদক, বিদ্বেষে মুখ বিকৃত, পাগলের মত ওদের ঘুঁষি মারতে চেষ্টা করছে।

দোরগোড়ার অন্ধকারে নতুন একজনকে দেখা গেল। রমান খুব সম্ভব। চওড়া, গুটিভরা মুখ, অতিশয় ভালো স্বভাবের ছাপ তাতে। বোজা চোখের পাতার আড়ালে কোটরগত চোখজোড়া ঢাকা, কিন্তু ওর ঠোঁটদুটো বিশেষ ধরণের সহৃদয় হাসিতে বাঁকা। এভেলিনা তখনো দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, তাকে পেরিয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে এল। দোরগোড়ায় ওর ঘাড়ে লাগল তার সঙ্গীর ঘুঁষি।

'ইয়েগর', গভীর সুশ্রাব্য গলায় রমান ডাকল। 'কি ভাই, আবার দারুণ চটে গিয়েছো দেখছি।'

বুক ঘেঁষে দুজনে দাঁড়িয়ে, এ ওকে অনুভব করছে।

'লক্ষ্মীছাড়াদের ঢুকতে দিলে কেন?' উক্রেনীয় ইয়েগর জানতে চাইল, রাগে তখনো গনগন করছে।

'খেলুক না কেন', রমান ভালোভাবে বলল। 'ভগবানের ছোট্ট পাখীর মত ওরা। ওদের এত ভয় দেখাও কেন? কই গো, দুষ্টুরা, তোরা সব কোথায়?'

প্ল্যাটফর্মের কোণে কোণে জড়োসড়ো হয়ে বাচ্চাগুলো চুপ করে আছে। কিন্তু দুষ্টুমীতে, আর একটু ভয়েও ওদের চোখ চকচক করছে।

নিঃশব্দে সকলের অলক্ষিতে সিঁড়ি ধরে এভেলিনা নিচের প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে গিয়েছে, তখন ইয়েগরের জোরালো পায়ের শব্দ শুনতে পেল, পিওতরেরও। পর মুহূর্তেই উপরের প্ল্যাটফর্মে জাগল উৎফুল্ল চেঁচামেচি আর হাসির হৈহৈ, বাচ্চারা দৌড়িয়ে গিয়ে রমানকে জড়িয়ে ধরছে।

গাড়ীটা আস্তে আস্তে মঠের দরজা দিয়ে বেরিয়ে

যাচ্ছে, উপরে ঘণ্টাগুলো বাজতে শুরু করল। সন্ধ্যার প্রার্থনার জন্য রমান বাজাচ্ছে।

সূর্য অস্ত গিয়েছে, অন্ধকার মাঠ বাট ধরে গাড়ীটা চলল। পিছু পিছু ভেসে এসে মঠের ঘণ্টার সমান বিষণ্ণ শব্দ সন্ধ্যার নীল ছায়ায় মিলিয়ে গেল।

ফেরার পথে কথাবার্তা হল না। সেদিন সারা সন্ধ্যা পিওতর অন্যদের এড়িয়ে বাগানের একটা কোণে একলা বসে রইল, এমন কি এভেলিনার উৎকণ্ঠিত ডাকেও সাড়া দিল না। সবাই শুতে চলে গেল, শুধু তখনই বাড়ীর ভিতরে গেল, নিজের ঘরের দিকে হাতড়ে চলল।

৪

স্তাভরুকোভোতে থাকার শেষ কয়েকটি দিনে মাঝে মাঝে পিওতরের আগেকার সজীবতা ফিরে আসত, ওর নিজস্ব ধরনে বেশ হাসিখুসী মনে হত ওকে। স্তাভরুচেঙ্কোর বড়ো ছেলে সংগ্রহ করে অনেক বাদ্যযন্ত্র জমিয়েছিল, তাতে বিশেষ উৎসাহ দেখাল পিওতর। সেগুলোর অনেক কটা তার কাছে নতুন, প্রত্যেকটি বাজিয়ে দেখতে হল তাকে, প্রত্যেকটিরই নিজস্ব স্বুর, নিজের নিজের

বিশিষ্ট অনুভূতির খোঁচ প্রকাশের উপযুক্ত তারা। কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল কী একটা পিওতরকে যন্ত্রণা দিচ্ছে; ক্রমশ বাড়ছে বিষণ্নতার অন্ধকার, তার পটভূমিতে ওর খুসীর মুহূর্তগুলো মাত্র নিমেষের ঝলক মনে হল।

দলের কেউ ঘণ্টাঘরের উল্লেখ আর করল না। যেন সকলের নীরব অনুমোদনে সে যাত্রার সমস্ত কথা বিস্মৃতিতে তলিয়ে গিয়েছে। কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল সেদিনকার ঘটনা পিওতরের উপরে গভীর ছাপ ফেলেছে। যখন একলা, এমন কি যখন অন্যান্যরা আছে, তখনো সবাই চুপ করে গেলে, কোন কথায় মন দিতে না হলে ও নিজের নানা চিন্তায় ডুবে যেত, মুখে আসত তিক্তভাব। এটা সত্যি যে আগেও তার মুখে এ ধরনের ভাব প্রায়ই দেখা যেত, কিন্তু সেটা আরো কর্কশ দেখায় এখন, আর যেমন করেই হোক, অন্ধ ঘণ্টাবাদকের কথা মনে করিয়ে দেয়।

পিয়ানো-এ বসলে, নিজেকে চেপে রাখার চেষ্টা ও করছে না এমন সব মুহূর্তে ওর সঙ্গীতে প্রায় আসত উঁচু সেই বুরুজের উপরে ঘণ্টার কম্পমান সুর আর ঘণ্টাগুলোর তাম্র মর্মস্থানে ধ্বনিত সেই বিলম্বিত দীর্ঘশ্বাস। বাজিয়ে চলত ও, আর শ্রোতাদের মনে স্পষ্টভাবে জাগত

এমন অনেক ছবি যেগুলো মুখ খুলে বলার ভরসা কারো ছিল না। ঘোরানো সিঁড়ির গম্ভীর অন্ধকার, ঘণ্টাবাদকের পাতলা দেহ, ওর গালের ক্ষয়কাশসুলভ আভাস, ওর বিদ্বেষ, ওর তিক্ত সব অনুযোগ। আর তারপর, ঘণ্টাঘরের প্ল্যাটফর্মে দুটি অন্ধ যুবক—এত সাদৃশ্য তাদের দেহ ভঙ্গীতে, মুখের ভাবে, প্রত্যেকটি শব্দে বা গতিতে উৎক্ষিপ্ত ভুরুতে। এতদিন পিওতরের আত্মীয় ও বন্ধুদের যেটাকে মনে হত ওর নিজস্ব, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, দেখা গেল সেটা তমসার সাধারণ শীলমোহর, অন্ধকারের রহস্যময় শক্তির বলি যারা তাদের প্রত্যেকের মুখে সমানভাবে সেটার ছাপ।

বাড়ীতে ফেরার কয়েক দিন পরে মাক্সিম বোনকে বললেন, 'দেখো, আন্না, আমাদের পিওতরের যে পরিবর্তন দেখছি সেটা মঠে যাবার পর থেকে শুরু হয়েছে। অসাধারণ কিছু ওখানে ঘটেছিল বলে তুমি জানো কি?'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আন্না মিখাইলভনা জবাব দিল, 'ওখানে সেই অন্ধ ছেলেটির সঙ্গে আমাদের দেখা হবার পরেই ত এ সব হয়েছে।'

ইতিমধ্যেই আন্না মিখাইলভনা ভেড়ার লোমের দুটো কোট মঠে পাঠিয়েছে, আর টাকাও, দুটি অন্ধ ঘণ্টাবাদক যাতে ভালো করে থাকতে পারে তার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে অনুরোধ করে সঙ্গে একটি চিঠি দিয়েছে ফাদার পামফিলিকে। এটা সত্যি যে মায়ামমতাশীল হলেও প্রথমে রমানের কথা তার মনে হয়নি, এভেলিনাকে বলতে হয়েছিল যে দুজনেরই বন্দোবস্ত করতে হবে। 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই', জবাব দিয়েছিল আন্না মিখাইলভনা; কিন্তু স্পষ্টতই শুধু একজনের — ইয়েগরের — কথাই ভাবছিল সে। ইয়েগরের জন্যই ব্যথায় আর করুণায় তার হৃদয় উন্মুখ, সে করুণার সঙ্গে মিশেছে একটি কুসংস্কারজাত বোধ যে তাকে এই নৈবেদ্য পাঠালে হয়ত কোন অজানা কিন্তু ভয়ঙ্কর শক্তি তুষ্ট হবে, সে শক্তি আপাতপ্রায়, কুটিল ছায়া ফেলছে পিওতরের জীবনে।

'কোন অন্ধ ছেলে?' খুব অবাক হয়ে গিয়ে মাক্সিম জানতে চাইলেন।

'কেন, ঘণ্টাঘরে যে ছিল।'

বিরক্তিতে ধপাস্ করে ক্রাচ মাটিতে ঠুকলেন মাক্সিম।

'পা দুটোই আমাকে ডুবিয়েছে। আন্না, তুমি ভুলে

গিয়েছো যে ঘণ্টাঘরের সিঁড়ি বেয়ে আমি আজকাল আর তড়তড় করে উঠতে পারি না। মেয়েদের ঘটে যদি বুদ্ধির ছিটে ফোঁটা থাকত! এভেলিনা, দেখো ত, ঘণ্টাঘরে ঠিক কী ঘটেছিল সেটা বলতে পারো কি না?'

'যে ঘণ্টাবাদকটা আমাদের ওপরে নিয়ে গিয়েছিল সে অন্ধ', এভেলিনা শুরু করল শান্ত স্বরে। এ কদিনে সেও আগের চেয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। 'তার পর...।'

কথা খুঁজে না পেয়ে এভেলিনা চুপ করল। দুটো হাতে মুখ ঢাকল আন্না মিখাইলভনা, রক্তিম গাল বেয়ে নামা অশ্রুধারা লুকোবার চেষ্টায়।

'ওর চেহারা... ওর চেহারা অনেকটা পিওতরের মত', আবার শুরু করল এভেলিনা।

'আর এ বিষয়ে একটা কথাও কেউ বলেনি আমাকে। আর কী ঘটেছিল? কেন না, শেষ পর্যন্ত, আন্না—ওটা এমন কিছু শোকাবহ ঘটনা নয়', বোনের দিকে ফিরে মাক্সিম বললেন, মৃদু তিরস্কারে ওঁর স্বর কোমল হয়ে এসেছে।

'আমার সহ্যের বাইরে', অস্ফুট কণ্ঠে বলল আন্না মিখাইলভনা।

'কোনটা সহ্যের বাইরে? কোন অন্ধ ছেলে পিওতরের মত দেখতে, সেটা?'

এবারে এভেলিনার চোখে চোখ পড়ল মাক্সিমের, ওর মুখের ভাব দেখে চুপ করে গেলেন তিনি। অল্পক্ষণ পরেই আন্না মিখাইলভনা ঘর ছেড়ে চলে গেল, এভেলিনা কিন্তু বসে রইল, সেলাই নিয়ে যথারীতি ব্যস্ত সে। দু-এক মুহূর্ত কোন কথা নেই।

'গল্পটা কি ওখানেই খতম?' অবশেষে মাক্সিম জিজ্ঞেস করলেন।

'না। পিওতর সবায়ের সঙ্গে ঘণ্টাঘর ছেড়ে যায়নি, আন্না মাসীকে বলল'—আন্না মিখাইলভনাকে মাসী বলে ডাকে শৈশব থেকে এভেলিনা—'অন্যদের সঙ্গে নিচে চলে যেতে, কিন্তু নিজে গেল না ও, অন্ধ ঘণ্টাবাদকের সঙ্গে রয়ে গেল। আর... আমিও থেকে গেলাম।'

'আড়ি পাততে?'

প্রায় যান্ত্রিকভাবে প্রশ্নটি করলেন মাক্সিম—বহুবছর যে শিক্ষাতত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন তার লক্ষণ ওটা।

'আমি... আমি চলে যেতে পারিনি।' আস্তে আস্তে বলল এভেলিনা। 'ওরা দুজনে কথা বলল এমনভাবে...'

'দুঃখের সাথী হিসেবে?'

'হ্যাঁ। অন্ধ যেমন অন্ধের সঙ্গে কথা বলে। আর তারপর ইয়েগর জিজ্ঞেস করল পিওতর মাকে স্বপ্নে কখনো দেখেছে কি না। আর পিওতর বলল কখনো দেখেনি। আর ইয়েগর... সেও দেখে না। কিন্তু ওখানে আর একজন অন্ধ ঘণ্টাবাদক আছে—রমান, সে স্বপ্নে নিজের মাকে দেখে। ওর মায়ের বয়স হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ও দেখে অল্পবয়সের মা'কে।'

'আচ্ছা। আর কী হল?'

এক মুহূর্ত ভেবে এভেলিনা তার নীল চোখ তুলে মাক্সিমের দিকে তাকাল। এভেলিনার চোখের গভীরে যন্ত্রণা আর দ্বিধা।

'অন্য ছেলেটি, রমান—সে দয়ালু, মনে হয় শান্তিতে আছে। ওর মুখটা বিষণ্ন কিন্তু তাতে কোন বিদ্বেষ নেই। জন্ম থেকে অন্ধ নয় ও। কিন্তু ইয়েগর...' একবার থামল এভেলিনা, তারপর তাড়াতাড়ি, এড়িয়ে যাবার ভাবে বলল, 'ভয়ানক যন্ত্রণা পায় ও।'

'যা বলতে চাইছো, খুলে বল', অধৈর্যভাবে বাধা দিলেন মাক্সিম। 'ইয়েগর তাহলে খুব তিতিবিরক্ত?'

'হ্যাঁ। কয়েকটা বাচ্চা ওপরে এসেছিল, ও তাদের গালিগালাজ করে ঘুঁষি মারার চেষ্টা করছিল। কিন্তু রমান, মনে হল বাচ্চারা ওকে ভালোবাসে।'

'তিক্ত, আর পিওতরের চেহারার সঙ্গে মিল আছে', চিন্তান্বিতভাবে মাক্সিম বললেন। 'বুঝতে পারছি।'

আবার ইতস্তত করল এভেলিনা, কিন্তু শেষে বলে চলল ক্ষীণকণ্ঠে, যেন বলতে আন্তরিক যন্ত্রণা হচ্ছে:

'মুখের গড়নে ওদের সত্যি সত্যি একেবারে মিল নেই। মুখের ভাবে মিল আছে বরঞ্চ। ওদের দুজনের দেখা হবার আগে আমার মনে হয়, পিওতরের ভাব আরো বেশী করে রমানের মত ছিল, কিন্তু এখন ক্রমশ ইয়েগরের মত হয়ে যাচ্ছে। আর জানেন, আমার যেটা ভয় করছে... মানে... আমার মনে হচ্ছে...'

'কীসে তোমার ভয় হচ্ছে, বলো ত, তুমি ত খুব বুদ্ধিমতী। আমার কাছে এসো।' এত কোমলভাবে কথা কদাচিৎ বলেন মাক্সিম, তার পক্ষে এত অস্বাভাবিক এটা যে এভেলিনার চোখ জলে ভরে এল। ওর সিল্ক-মসৃণ চুলে নিজের বড় হাত রাখলেন মাক্সিম।

'তোমার কী মনে হচ্ছে, বলো ত আমাকে। কেন না তোমার চিন্তাশক্তি আছে, সেটা এখন বুঝতে পারছি।'

'আমার মনে হয়... মনে হয় ও এখন ভাবে যে জন্মান্ধ হলে খিটখিটে হয়ে যেতে হবে। আর মনে হচ্ছে, নিজেকে বুঝিয়েছে যে ওকেও খিটখিটে হতেই হবে, না হয়ে কোন উপায় নেই।'

'আচ্ছা, তাহলে এই।' যে হাতে আদর করছিলেন সে হাতটা হঠাৎ নেমে এল। 'আমার পাইপটা এনে দেবে, লক্ষ্মীটি? ওই যে ওখানে, জানলার তাকে।'

অবিলম্বে তামাকের নীল ধোঁয়া তাঁকে ঘিরে ফেলল, ধোঁয়ার মধ্যে গলা শোনা যাচ্ছে, নিজের মনে গজগজ করছেন।

তাহলে এই, আচ্ছা। না ওতে ভালো কিছু হবে না... ভুল করেছেন তিনি, ওঁর বোন ঠিকই বলেছিলেন। যে সব জিনিসের অভিজ্ঞতা জীবনে কখনো হয়নি সে সব জিনিসের অভাবে লোকে সত্যি সত্যিই কষ্ট পেতে পারে, চাইতে পারে তাদের। আর এখন সহজাত প্রবৃত্তির শক্তিবৃদ্ধি করেছে সচেতন উপলব্ধি, দুটোই একই উদ্দেশ্যে কাজ করতে থাকবে। অন্ধ দুজনের সাক্ষাৎকার

দুর্ভাগ্যের বিষয়। তবুও শেষ পর্যন্ত, যেমন লোকে বলে, সত্য প্রকাশ পাবেই, কোন না কোন উপায়ে।

ধোঁয়ার মেঘে প্রায় দেখা যাচ্ছে না মাক্সিমকে...। ওর চৌকো করে খোদাই করা মাথায় নতুন নানা কথা আর সিদ্ধান্ত দানা বাঁধছে।

৫

শীত এল। বরফের স্তূপে রাস্তাঘাট মাঠ গ্রাম ভরে গিয়েছে। জমিদার-বাড়ীতে সবকিছু শাদা দেখাচ্ছে। বাগানের গাছগুলো পেঁজা তূলোর মত বরফে ভর্তি, যেন শুকনো সবুজের বদলে নতুন পাতা গজিয়েছে। ড্রয়িং-রুমে ফায়ার-প্লেসে গনগনে আগুন চড়চড় করে জ্বলছে। বাইরে থেকে যারা ঢুকছে প্রত্যেকেরই সঙ্গে আসছে তাজা আমেজ, নতুন-পড়া বরফের গন্ধ।

শীতের প্রথম দিনের কাব্য পিওতর বিশেষভাবে অনুভব করত। এমন কোন সকালে ঘুম ভাঙলেই উৎসাহ উদ্যমের বিশেষ একটি সাড়া জাগে। শীতের নানা চেনা লক্ষণ চারিদিকে—বাইরের ঠাণ্ডা থেকে এসে রান্নাঘরে লোকে পা ঠুকছে; দরজাগুলোর কিঁচকিঁচ আওয়াজ;

বাড়ীর চারিদিকে হাড়-কাঁপানো হাওয়ার ছোট ছোট স্রোতের হুড়োহুড়ি; অঙ্গনে বরফের উপরে চলাফেরার কড়মড় শব্দ; আর বাইরে-থেকে-আসা প্রত্যেকটি শব্দে শীতের নতুন অনুভূতি। আর যখন ইওহিমের সঙ্গে খোলা মাঠে গাড়ী করে যেত তখন টাটকা বরফের উপরে শ্লেজের গড়িয়ে যাওয়ার ঘর্ঘর, আর নদীর ওপারের বনে হঠাৎ চড়চড় সব আওয়াজ, মাঠে বাটে তাদের প্রতিধ্বনি, শুনতে কী ভালোই না লাগত।

কিন্তু এবারে বরফের প্রথম দিন শুধু ঘনীভূত বিষণ্ণতা আনল। লম্বা বুট পরে সেদিন সকালে পিওতর পুরানো মিলে গিয়ে পৌঁছল। প্রতি পদক্ষেপে পা বরফে অনেকটা ডুবে যাচ্ছে, সে পথে তখনো কেউ পা দেয়নি।

বাগানে কোন সাড়া নেই। মাটি জমে গিয়েছে, উপরে বরফের পাতলা চাদর, হাঁটলে পায়ের শব্দ শোনা যায় না। কিন্তু আজকের হাওয়ায় প্রতিটি ধ্বনি ধরা পড়ছে, এত স্পষ্টভাবে বছরের অন্য কোন সময়ে ধরা পড়ে না, অনেক দূর থেকে স্পষ্ট পরিষ্কারভাবে নিয়ে আসছে কাকের ডাক, কুঠারের আওয়াজ, এমন কি গাছের ডাল ভেঙে পড়ার ক্ষীণ শব্দটুকু। মাঝে মাঝে

পিওতরের কানে হাওয়ায় ভেসে আসছে একটি অদ্ভুত ঝনঝনে ধ্বনি, যেন কাচের শব্দ, দ্রুত লয়ে তীক্ষ্ণ উচচ গ্রামে পেঁৗছিয়ে মনে হচেছ্ বহুদূরে মিলিয়ে যাচেছ্। শব্দটা আসছে গ্রামের পুকুর থেকে। সেখানে রাতারাতি জলে পড়েছে বরফের পাতলা স্তর। গ্রামের ছেলেরা ঢিল ছুঁড়ে স্তরটা পরখ করছে।

জমিদার-বাড়ীর পুকুরটাও জমে গিয়েছে। কিন্তু পুরানো মিলের কাছের নদীটি বরফে-ঢাকা দুটো পারের মাঝখান দিয়ে এখনো বয়ে চলেছে, জল বেরিয়ে যাবার ফাঁকে ফাঁকে কুলকুল শব্দ, যদিও স্রোতধারা এখন মন্থরতর আর জলের রঙ আগের চেয়ে ঘোলাটে।

বাঁধে হেঁটে গিয়ে পিওতর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে। জলের শব্দের প্রকৃতি বদলে গিয়েছে। শব্দটা আরো ভারী, আগেকার সুর আর নেই। সমস্ত গ্রামাঞ্চলে মৃত্যুর স্পর্শের মত যে হিম পড়ে আছে শব্দটি তার প্রতিচছ্বি যেন।

আর পিওতরের অন্তরও হিম-শিতল বিষণ্ণতায় ভরে গিয়েছে। গ্রীষ্মের সেই সুন্দর সন্ধ্যায় যে অন্ধকার অনুভূতি তার সত্তার অতলে কোথাও জাগ্রত হয়েছিল—আশঙ্কা

অসন্তোষ, সংশয়ের সেই অস্পষ্ট বোধ—সে অনুভূতি ক্রমশ বেড়ে তার সমস্ত হৃদয়কে গ্রাস করেছে, যে হৃদয় এককালে সুখ আর আনন্দে ভরপূর ছিল।

এভেলিনা নেই। হেমন্তের শেষ থেকেই এখানে নেই। ওর বাপ-মা ভাবছিলেন তাঁদের পূর্বতন 'হিতৈষিণী', বৃদ্ধা কাউণ্টেস পতৎস্কায়ার কাছে যাবেন, আর কাউণ্টেস মেয়েকে নিয়ে নিশ্চয়ই যেতে লেখেন। যাবার ইচ্ছে ছিল না এভেলিনার, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাপের জেদে রাজী হতে বাধ্য হয়, মাক্সিমও খুব উৎসাহে ওর বাবাকে সমর্থন করেছিলেন।

আবেগের অখণ্ড ঐকতান একদিন এখানে পিওতর অনুভব করেছিল, আজ পুরানো মিলের কাছে দাঁড়িয়ে সেই অনুভূতি আবার ফিরে পাবার চেষ্টা করল। নিজেকে জিজ্ঞেস করল এভেলিনার জন্য মন কেমন করে কি না। হ্যাঁ, করে। কিন্তু যদিও ওর অনুপস্থিতি খারাপ লাগে, তবু ওর উপস্থিতিও—পিওতর বুঝতে পারল—আর তাকে আনন্দ জোগায় না। বরঞ্চ ওর উপস্থিতি আনে নতুন, তীব্র বেদনা, ও না থাকলে সে বেদনার জ্বালা কিছুটা কমে।

মাত্র কিছুদিন আগে পর্যন্ত সেই সন্ধ্যার সমস্ত খুঁটিনাটি বিবরণ পিওতরের মনে গাঁথা ছিল — ওর কথা, ওর চুলের সিল্ক-মসৃণ স্পর্শ, নিজের বুকে রাখা ওর বুকের স্পন্দন। আর এই সমস্ত খুঁটিনাটি থেকে এভেলিনার একটি ছবি পিওতর নিজের জন্য সৃষ্টি করেছিল, তাকে আনন্দে ভরিয়ে রেখেছিল সেটি। কিন্তু ওর দৃষ্টিহীন কল্পনায় যে সব ছায়ামূর্তি হানা দিয়ে ঘোরে তাদের মত রূপহীন বিকৃতাকার কিছু একটার সর্বনেশে নিঃশ্বাস এখন সে ছবির উপরে পড়েছে, টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে দিয়েছে সেটিকে। সে সন্ধ্যার সব স্মৃতি আর পিওতর মেলাতে পারে না সেই অখণ্ডতায়, সেই ঐকতানে যেটা শুরুতে তাকে ভাসিয়ে দিয়েছিল। ওর অনুভূতির গভীরে গোড়া থেকেই গুপ্ত ছিল বিজাতীয় কিছু একটার টুকরো, চোখের বালি — আর এখন সে টুকরোটা বেড়ে গিয়ে সবকিছু যেন মুছে দিয়েছে — কঠিন ঝোড়ো-মেঘে যেমন দিগন্ত বিলুপ্ত হয়।

এভেলিনার কণ্ঠস্বর আর ধ্বনিত হয় না ওর কানে। সেই আনন্দ-সন্ধ্যার উজ্জ্বল স্মৃতি মুছে গিয়েছে, পড়ে আছে অসীম শূন্যতা। আর ওর অন্তরে কিছু একটা,

অন্তরের গভীরে চাপা কিছু একটা প্রাণপণে সে শূন্যতা ভরাবার প্রয়াস করছে।

এভেলিনাকে দেখতে চায় পিওতর!

ব্যথার বিরস ভাব—বরাবরই ছিল অবশ্য। কিন্তু বহুদিন সেটার প্রকৃতি ছিল ভাসা-ভাসা অর্ধ-অনুভূত অস্বস্তির, তার বেশী কিছু নয়, অনেকটা দাঁতের ব্যথার মত, কনকনে তখনো নয়।

অন্ধ ঘণ্টাবাদকের সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকে তার সচেতনতা আর উপলব্ধি অস্পষ্ট ব্যথাটিকে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় পরিণত করেছে।

এভেলিনাকে ভালোবাসে! আর দেখতে চায় ওকে পিওতর!

এই মনোভাবে বরফে-ঢাকা নিস্তব্ধ জমিদার-বাড়ীতে দিনের পর দিন তার কাটছে।

মাঝে মাঝে আনন্দের মুহূর্তগুলি স্পষ্টভাবে আবার মনে ফিরে আসে, পিওতরের মুখ ঝরঝরে দেখায়, মনে হয় বিষণ্নতার ঘোর কেটে গিয়েছে। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়; শেষে এই সব অপেক্ষাকৃত আনন্দের মুহূর্তগুলিতেও চাপা অস্বস্তি হানা দেয়, যেন ওর আশঙ্কা যে এরাও অদৃশ্য

হবে, আর ফিরে আসবে না কখনো। ফলে ওর মেজাজের ঠিক ছিল না, তীব্র আবেগকোমল উচ্ছ্বাস আর সজীব চঞ্চলতা, তারপর গভীর বিষণ্ণতার দীর্ঘ বিরস দিন, পালা করে আসে। কোন কোন সন্ধ্যায় অন্ধকার ড্রয়িং-রুমে ভারী, প্রায় অসুস্থ বিষণ্ন কান্নার সুরে পিয়ানো বাজে; আর প্রত্যেকটি রুদন্ত ধ্বনিতে আন্না মিখাইলভনার বুক চিরে যায়, ব্যথায় শিউরে ওঠে সে। সবচেয়ে যেটা ভয় করত আন্না মিখাইলভনা, কালে সেটাই হল। শৈশবে যে সব স্বপ্ন পিওতরকে বিচলিত করত, তারাই আবার ফিরে আসতে শুরু করল।

পিওতর ঘুমোচ্ছে, একদিন সকালে ঘরে এসে আন্না মিখাইলভনা দেখল ওর মুখে অদ্ভুত অস্বস্তির ভাব। নিচু চোখের পাতার পিছনে চোখদুটি আধবোজা, বিরস দীপ্তি তাতে; মুখ পাণ্ডুর, উদ্বেগের ছাপ তাতে। আন্না মিখাইলভনা থেমে ওর অস্বস্তির কারণ আঁচ করার চেষ্টায় উৎকণ্ঠিতভাবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু শুধু দেখল যে ওর উত্তেজনা দ্রুত বেড়েই যাচ্ছে, ক্লেশকর প্রয়াসের ভঙ্গীতে মুখের চেহারা ক্রমশ কঠিন হয়ে আসছে।

তারপর হঠাৎ মনে হল কী যেন একটা নড়ে উঠল বিছানার উপরে—সত্যি, না তার কল্পনা শুধু? সূর্যের আলো, শীতের সূর্যের সঙ্কীর্ণ, উজ্জ্বল একটি রেখা আড়াআড়িভাবে জানলা থেকে ঠিক পিওতরের মাথার উপরে দেয়ালটিতে ঘা দিয়েছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হল রেখাটি কাঁপছে—আর দেয়ালের উপরের উজ্জ্বল ছোপটি নেমে এল আরো নিচে। আরো নেমে এল, আরো। আস্তে আস্তে, প্রায় অগোচরে, আলোর রেখাটি পিওতরের আধখোলা চোখের দিকে আসছে। যত কাছে আসছে পিওতরের টান-টান ভাব তত বেড়ে যাচ্ছে।

দোরগোড়ায় আন্না মিখাইলভনা নিশ্চল দাঁড়িয়ে, আলোর সেই জ্বলন্ত বিন্দু থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। দুঃস্বপ্নে যেন, সেটির গতি দেখতে পাচ্ছে, কম্পিত পায়ে পায়ে ক্রমশ এগিয়ে আসছে সেটি তার ছেলের অসহায় চোখের কাছে। পিওতর আরো বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে, টান মুখে সেই ক্লিষ্ট প্রয়াসের ভাব। এবারে হলুদ আলো তার চুল স্পর্শ করল। উষ্ণ উত্তাপ পৌঁছল ওর কপালে। মা ঝুঁকে পড়ল, ছেলেকে আগলাবার সহজাত ঝোঁকে।

কিন্তু—দুঃস্বপ্নে যেন — পাদুটো মাটিতে গাঁথা, নড়তে পারল না সে। এবারে পিওতরের চোখদুটো বিস্ফারিত হল; আর যখন দৃষ্টিহীন মণিতে আলো এসে পড়ল তখন বালিশ থেকে মাথা ওঠালো সে, যেন গ্রহণ করতে চাইছে ওটিকে। ঠোঁটদুটো নড়ে উঠল স্নায়বিক বিক্ষোভে — মৃদু হাসিতে হয়ত; কিম্বা হয়ত কান্নায় কাতরোক্তিতে। আর আবার সেই ক্লিষ্ট প্রয়াসের কঠিনভাব ফিরে এল মুখে।

কিন্তু এবার আন্না মিখাইলভনা তার পক্ষাঘাত কাটিয়ে উঠতে পারল। তাড়াতাড়ি বিছানার কাছে গিয়ে পিওতরের মাথায় হাত রাখল। চমকে উঠে পিওতর জেগে উঠল।

‘কে, মা না কি?’ জিজ্ঞেস করল সে।

‘হ্যাঁ।’

উঠে বসল পিওতর। মুহূর্তের জন্য মনে হল ওর হুঁশ সবটা ফিরে আসেনি। কিন্তু মুহূর্ত পরে ও বলল:

‘আবার একটা স্বপ্ন দেখেছি... আজকাল প্রায়ই দেখি। শুধু... পরে আর মনে করতে পারি না...।’

৬

পিওতরের মনোভাব বদলে গেল, ওর গভীর কিন্তু স্থির বিষণ্ণতার জায়গায় এসেছে অস্থির খিটখিটনির আক্ষেপ। সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্টভাবে বাড়ছে ওর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার অসাধারণ সূক্ষ্মতা। শ্রবণশক্তির প্রখর ক্ষমতা আরো বেড়েছে; আর ওর সমস্ত সত্তা আলোর অনুপ্রেরণায় সাড়া দেয়, এমন কি অন্ধকার হলেও। রাত্রি অন্ধকার, না চাঁদের আলো উঠেছে বুঝতে পারে পিওতর; আর প্রায়ই, সবাই শুয়ে পড়লে উঠোনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরে বেড়ায়, বাক্যহীন বিষণ্ণতায় বিভোর হয়ে, চাঁদের স্বপ্নালু অলৌকিক আলোর রহস্যময় প্রভাবে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে। এ সময় সর্বদাই ওর বিবর্ণ মুখ নীল আকাশে জ্বলন্ত চাঁদের যাত্রাপথের দিকে ফেরানো থাকে; চাঁদের ঠাণ্ডা আলো প্রতিবিম্বিত হয় ওর চোখে।

অস্তগামী চাঁদ, পৃথিবীর দিকে যত আসছে তত আয়তন. বাড়ছে; অবশেষে লাল ঘন কুয়াশার আড়ালে আস্তে আস্তে তুষার-দিগন্তে ডুবে গেল—এ সময়ে কোমল শান্তির ভাব পিওতরের মুখে আসত, ফিরে বাড়ীর ভিতরে চলে যেত।

কী ভাবত এই সব দীর্ঘ রাত্রি ধরে বলা কঠিন। প্রজ্ঞা আর জ্ঞানের আনন্দ আর যন্ত্রণার স্বাদ যারা পেয়েছে, বিশেষ একটি বয়সে তারা প্রত্যেকেই আধ্যাত্মিক সঙ্কটের মুখোমুখি হয়, কেউ বা বেশী, কেউ বা কম করে। জীবনের কার্যকলাপের দোরগোড়ায় থেমে লোকে চারিদিক দেখে, বহির্প্রকৃতিতে নিজের স্থান কোথায়, নিজের অস্তিত্বের অর্থ কী, বহির্জগতের সঙ্গে নিজের কী সম্পর্ক, প্রত্যেকে চেষ্টা করে বুঝতে। কঠিন সময় এটা, অদম্য জীবনীশক্তি যাদের বিনা বিপর্যয়ে এ সময়টা পেরিয়ে নিয়ে যায় ভাগ্য তাদের ভালো। পিওতরের এই আধ্যাত্মিক সঙ্কট আরো কঠিন; 'কীসের জন্য আমরা বাঁচি', সবাই এটা জিজ্ঞেস করে; ওকে তার সঙ্গে যোগ করতে হয় নিজস্ব প্রশ্ন: 'অন্ধ আমি, কীসের জন্য বাঁচবো?' আর এই বিষণ্ন চিন্তাধারার মূলে হানা দেয় আর একটি কিছু: কখনো মেটানো যায় না এমন একটি অভাববোধের প্রায় শারীরিক চাপ। ওর চরিত্রে এ সবের ছাপ পড়ল।

ক্রিসমাসের কিছু আগে ইয়াস্কুলস্কিরা ফিরে এল। এসেই জমিদার-বাড়ীতে দৌড়িয়ে এল এভেলিনা, ড্রয়িং-

রুমে তড়াক্ করে ঢুকে খুসীর উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে জড়িয়ে ধরল আন্না মিখাইলভনাকে, পিওতরকে, আর মাক্সিমকে। ওর চুলে বরফের কুচি চিকচিক করছে, বরফের তাজা আমেজের ঝলক ঘরে এসেছে ওর সঙ্গে। কয়েক মুহূর্তের জন্য পিওতরের মুখ আকস্মিক খুসীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কিন্তু একটু পরেই অবাধ্য বিষণ্ণতায় সে আলো মিলিয়ে গেল।

সেদিন যখন ও আর এভেলিনা একলা, তখন রুদ্ধ স্বরে পিওতর বলল, 'মনে হয় তুমি ভাবো আমি তোমাকে ভালোবাসি?'

'সে বিষয়ে নিশ্চিত আমি', এভেলিনা বলল।

'কিন্তু আমি মোটেই নিশ্চিত নই', বিষণ্ণভাবে ঘোষণা করল পিওতর। 'না, একেবারেই নয়। আগে ভাবতাম পৃথিবীতে সবচেয়ে তোমাকে ভালোবাসি, কিন্তু এখন জানি না তোমাকে ভালোবাসি কি না। সময় থাকতে আমাকে ছেড়ে দেওয়াই সবচেয়ে ভালো, বাইরে তোমাকে যারা ডাকছে তাদের কাছে যাওয়া উচিত।'

'আমাকে সব সময়ে এরকম কষ্ট দাও কেন?' মৃদু ভর্ৎসনাটি না করে এভেলিনা পারল না।

'কষ্ট দিই?' আবার পিওতরের মুখে এল সেই সবাধ্য, স্বার্থপর বিষণ্ণতার ভাব।

'হ্যাঁ, দিই বই কি। কষ্ট দিই তোমাকে। আর সারা জীবন কষ্ট দিয়ে যাবো। তোমাকে যন্ত্রণা না দিয়ে বোধ হয় থাকতে পারি না আমি। সেটা জানতাম না আগে। কিন্তু এখন জানি। আর আমার কোন হাত নেই। জন্মের আগেই যিনি আমাকে অন্ধ করেন তিনিই আমাকে খিটখিটে করেছেন। আমরা সবাই এই রকম — আমরা যারা জন্মান্ধ, আমরা সবাই। আমাকে ছেড়ে দাও, তোমরা সবাই ছেড়ে দাও, আমার কাছে আর এসো না, কেননা তোমাদের ভালোবাসার বদলে আমি শুধু যন্ত্রণা দিতে পারি। চোখে দেখতে চাই আমি। সেটা বোঝো না কেন? দেখতে চাই আমি, আর সে চাওয়ার হাত থেকে নিজেকে ছাড়াতে পারি না। যদি একবার শুধু দেখতে পেতাম মাকে, আর বাবাকে, আর তোমাকে, আর মাক্সিমকে একবার যদি দেখতে পেতাম তাহলে আর কোন ক্ষোভ থাকত না আমার। মনে রাখতাম আমি। সেই স্মৃতিকে আমার অন্ধকার অনাগত ভবিষ্যতে মনে রাখতাম।'

বারবার একগুয়ের মত পিওতর একই চিন্তায় ফিরে আসে। একলা যখন, তখন কখনো এটা, কখনো সেটা নিয়ে অসীম যত্নে নাড়াচাড়া করে দেখে, তারপর সরিয়ে রেখে বসে বসে ভাবে কী কী গুণ তাতে পেয়েছে। বিভিন্ন রঙের জিনিসের উজ্জ্বল গায়ে যে পার্থক্য স্পর্শের মাধ্যমে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় ও টান-টান স্নায়ুর সাহায্যে অস্পষ্টভাবে অনুভব করে, সেগুলো নিয়েও ভাবে সে। কিন্তু এসব তার সংবেদন-কেন্দ্রে পৌঁছয় শুধু পার্থক্যের, শুধু তুলনামূলক প্রত্যয়ে, ধরা, ছোঁয়া, দেখা জিনিসের শারীরিকতা তাতে থাকে না। এমন কি কোন দীপ্ত দিন আর অন্ধকারের তফাৎটা তার কাছে শুধু এই—দীপ্ত আলো কোন রহস্যময় অজানা ধারায় মাথায় প্রবেশ করে তার নানা অন্বেষার যন্ত্রণা বাড়িয়ে দেয়।

৭

ড্রয়িং-রুমে ঢুকে একদিন মাক্সিম দেখলেন পিওতর আর এভেলিনা বসে আছে। এভেলিনাকে বিচলিত দেখাচ্ছে, পিওতরের মুখ বিষণ্ণ। আজকাল নিত্য নতুন

ছুতোয় নিজেকে এবং অন্যদের যন্ত্রণা দেবার শারীরিক প্রয়োজনীয়তা পিওতর বোধ করে যেন।

‘ও বারবার জিজ্ঞেস করে’, এভেলিনা মাক্সিমকে বলল, ‘“লাল ঘণ্টাধ্বনি” বলতে কী বোঝায়। আর ঠিকভাবে আমি বোঝাতে পারি না মনে হচ্ছে।’

‘মুশ্‌কিলটা কী?’ পিওতরকে সংক্ষিপ্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন মাক্সিম।

পিওতর কাঁধ ঝাঁকাল।

‘বিশেষ কিছু নয়। শুধু শব্দেরো যদি রঙ থাকে আর সেটা ত আমি দেখতে পাই না—তাহলে মানেটা দাঁড়ায় যে এমন কি শব্দ পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে আমি শুনতে পাই না।’

‘বাচ্চাদের মত কী যা তা বলছ’, জবাব দিলেন মাক্সিম, এবারে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে। ‘তুমি বেশ ভালো করেই জানো যে ওটা সত্যি নয়। শোনবার ক্ষমতা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী তোমার।’

‘কিন্তু যখন ওটা বলে তখন লোকে কী বোঝায়? কথাটার নিশ্চয় কোন অর্থ আছে।’

এক মুহূর্ত ভাবলেন মাক্সিম, তারপর বললেন,

'ওটা শুধু তুলনার ব্যাপার। তলিয়ে দেখলে শব্দ হল গতি, আলোও তাই। আর সে জন্য দুটোর মধ্যে কিছু মিল থাকতেই হবে।'

'কী ধরনের মিল?' পিওতর আবার জিজ্ঞেস করল। '"লাল ঘণ্টাধ্বনি"—সেটা কী রকম?'

উত্তর দেবার আগে মাক্সিম আবার ভেবে নিলেন।

স্পন্দনের বিজ্ঞান নিয়ে কিছু বলতে পারেন। কিন্তু সেটা পিওতরের প্রশ্নের মনের-মত উত্তর দিতে পারবে না, বুঝলেন মাক্সিম। আর তাছাড়া, শব্দকে আলো এবং রঙের বিশেষণে প্রথমে যিনি বর্ণনা করেন, দুটোর কোনটারই পদার্থপ্রকৃতির বিষয়ে কোন জ্ঞান তাঁর ছিল না; কিন্তু স্পষ্টতই দুটোর মধ্যে একটা মিল তিনি দেখেছিলেন। সে মিলটা কী?

মাক্সিমের মাথায় নতুন একটি ধারণা রূপ নিতে শুরু করল।

'দাঁড়াও, একেবারে স্পষ্টভাবে তোমাকে বোঝাতে পারবো কি না জানি না', বললেন তিনি। 'কিন্তু যা হোক, "লাল" ঘণ্টাধ্বনিটা ধরা যাক। সহরে উৎসবের দিনে অনেক বার শুনেছো ওটা, আমি ওটার বিষয়ে

যা জানি তুমিও জানো। শুধু কথাটা আমাদের এদিকে ব্যবহার করা হয় না, এই যা।'

'দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও!'

তাড়াতাড়ি পিয়ানো খুলে পিওতর বাজাতে শুরু করল। নিচু খাদের কয়েকটি ধ্বনির পটভূমিতে সুদক্ষ আঙুলে বসাল উচ্চ গ্রামের ধ্বনি, আরো মুখর আর সজীব তারা, অগণন সংখ্যা পরম্পরার বিন্যাসে তারা উঠছে আর ভেসে যাচ্ছে; আর উৎসবের দিনে যেমন ঘণ্টার রোলে আকাশ ভরে যায় ঠিক তেমন উঁচুগ্রামে বাঁধা, আনন্দপূর্ণ ঝঙ্কারে ঘর ভরে গেল।

'এই ত!' বললেন মাক্সিম। 'অনেকটা এই রকম। আর আমাদের কেউ তোমার চেয়ে ভালো করে এটা দখলে আনতে পারবে না, যদিও আমাদের চোখ আছে। আর লাল কিছু দেখলেই, আকারে সেটা যথেষ্ট বড়ো হলেই, "লাল ঘণ্টাধ্বনি" শুনে যেরকম হয় প্রায় সেরকম ভাব আমার হয়। ঠিক সমান অস্থির অনুভূতি, ধ্বনিমুখর উত্তেজনা গোছের একটা ভাব। লাল রঙটি পর্যন্ত হামেশা বদলাচ্ছে মনে হয়। রঙের গভীরতা আর তীব্রতা পিছু হটে যায়, আর উপরে, এখানে

সেখানে হালকা ক্ষণিক আভাস, ঢেউ যেন দেখা যায়, দ্রুতভাবে উঠে সমান দ্রুতভাবে মিলিয়ে যায়। আর সব মিলিয়ে আমার চোখে গভীর ছাপ রেখে যায়, আমার চোখে অন্তত।'

'খুব সত্যি', উত্তেজিতভাবে বলল এভেলিনা। 'আমারো ঠিক এরকম হয়। আমাদের টেবিলের লাল চাদরের দিকে কখনো বেশীক্ষণ তাকাতে পারি না আমি।'

'অনেকে আবার উৎসবের ঘণ্টাধ্বনি সহ্য করতে পারে না। হ্যাঁ, মনে হয় মিলের কথাটা আমি ঠিকই বলেছি। আর যখন এ বিষয়ে কথা উঠেছে তখন তুলনাটা আরো বাড়িয়ে বলা যায়। আর এক ধরনের ঘণ্টার শব্দ আছে যেটাকে লোকে প্রায়ই "ঘোর লাল" বলে। আর একটা রঙ আছে, বিশেষ এক ধরনের রঙ, যেটাকে লোকে একই নামে ডাকে। শব্দ আর রঙটি, দুটোই লালের খুব কাছাকাছি—শুধু আরো গভীর, কোমল আর আরো সমান তারা। শ্লেজের কিম্বা গাড়ীর ঘণ্টার শব্দ—প্রথম যখন বাজে তখন তাদের ঠুনঠান আওয়াজ তীক্ষ্ণ, অসমান আর অপ্রীতিকরভাবে কানে লাগে; কিন্তু অনেকক্ষণ বাজলে, সঙ্গীতভক্তদের ভাষায়,

"নিজের সুরে ফিরে আসে তারা", তারা পায় "ঘোর লাল" ধ্বনির প্রকৃতি। ছোট ঘণ্টাগুলোকে সুদক্ষভাবে একসঙ্গে বাজালে গির্জার ঘণ্টাধ্বনির মত একই ভাব পাওয়া যায়।'

আবার বাজাতে শুরু করল পিওতর—ডাকগাড়ী দ্রুতবেগে যাচ্ছে, ঘণ্টার আমুদে ঠুনঠান শব্দ।

'না', মাক্সিম বললেন। 'ওটা একটু বেশী লাল শোনাচ্ছে, আমার মতে।'

'তাই না কি? আচ্ছা, মনে আছে!'

সঙ্গীতের গতি আগের চেয়ে সমান হয়ে এল। চঞ্চল, মুখর উচচ গ্রামে শুরু হয়েছিল, এখন সেটা ক্রমশ মৃদু, নিচু আর গভীর। রুশ ত্রয়কা ধূলোভরা পথে সন্ধ্যায় সুদূর আবছা লোকে ধাবমান, পিয়ানোয় কখনো বাজছে তার ঘণ্টার ধ্বনি, অপ্রখর আর সমান, শ্রুতিকর্কশ কোন শব্দ নেই—ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে মাঠবাটের শান্ত স্তব্ধতায় মিলিয়ে যাচ্ছে ধ্বনির রেশ।

'ঠিক এই রকম!' বললেন মাক্সিম। 'পার্থক্যটা পুরোপুরি ধরতে পেরেছো তুমি। হ্যাঁ, একবার তোমার

মা শব্দের সাহায্যে তোমাকে রঙ বোঝাবার চেষ্টা করেছিল। তুমি নেহাৎ বাচ্চা ছিলে তখন।'

'আমার মনে আছে। কেন তখন সেটা ছেড়ে দিতে বললে তুমি? হয়ত বুঝতে শিখতাম।'

'না', ধীরে ধীরে জবাব দিলেন মাক্সিম। 'ওতে কিছু হত না। তবে আমার মনে হয় অন্তরের গভীরে শব্দ আর রঙের সব সংবেদনের ছাপে সত্যি বিশেষ কোন তফাৎ নেই। ধরো, আমরা বলি ও লোকটা রঙীন চশমায় পৃথিবীকে দেখে। তার মানে এই যে লোকটা আশা আর আনন্দপ্রবণ। ঠিক ঠিক শব্দ বাছাই করে প্রায় একই ধরনের মেজাজ আনা যায়। বলা যায় যে শব্দ আর রঙ একই আবেগের প্রতীক।'

পাইপ ধরাবার জন্য মাক্সিম থামলেন, টানতে টানতে চেয়ে রইলেন পিওতরের দিকে। চুপ করে বসে আছে পিওতর, ব্যগ্রভাবে প্রতীক্ষা করছে বোঝা যায়। মাক্সিম একটু ইতস্তত করলেন। কথা চালিয়ে যাওয়া কি উচিত হবে? দ্বিধা কেটে গেল, আবার কথা বলতে শুরু করলেন, ধীরে ধীরে, অনাবিষ্টভাবে, যেন তাঁর বিচিত্র চিন্তাধারা তাঁকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই।

‘আর জানো, অদ্ভুত নানা কথা মাথায় ঘুরছে আমাদের রক্ত যে লাল. সেটা কি শুধু আকস্মিক কিছু? এই ধরো না কেন, যখন কোন ধারণা আমাদের মাথায় দানা বাঁধে, কিম্বা এমন কোন স্বপ্ন দেখছি যেটা দেখার পরে জেগে কান্নায় কেঁপে উঠি, কিম্বা যখন তীব্র আবেগে আমরা জ্বলছি মনে হয়—তখন সব সময়ে বুকে রক্তের বান ডাকে, জ্বলন্ত লাল ধারায় রক্ত মাথায় ছুটে যায়। আর আমাদের রক্তের রঙ লাল।’

কী যেন ভাবতে ভাবতে পিওতর বলল, ‘আমাদের রক্ত লাল, লাল, আর উষ্ণ।’

‘হ্যাঁ, লাল, আর উষ্ণ। আর সে জন্য লাল রঙ আর যে সব শব্দকে “লাল” বলা যায়, তারা আনে প্রফুল্লতা, আনে সজীবতা। আর আনে প্রবল আবেগের প্রত্যয়, যেটাকে লোকে বলে “উষ্ণ”, জ্বলন্ত, টগবগে। আর একটা কথা: ছবি যাঁরা আঁকেন তাঁরা অনেক সময়ে লালচে রঙকে বলেন “উষ্ণতার” রঙ।’

কিছুক্ষণ পাইপ টানলেন মাক্সিম, নীল ধোঁয়া উঠছে তাঁর চারিদিকে। আবার কথা বলে চললেন মাক্সিম:

‘মাথার উপরে হাত তুলে ঘুরিয়ে আনলে অর্ধবৃত্ত

গোছের হয়, কম বেশী সীমাবদ্ধ সেটা। আচ্ছা, ধরো, তোমার হাত আরো লম্বা, অনেক, অনেক লম্বা। যদি সেটা ঘোরাও তাহলে অনেক, অনেক দূরের অর্ধবৃত্তের মত হবে। মাথার উপরে আকাশের মণ্ডল যেখানে, সেখানে সেটা। অনেক, অনেক দূরে। বিরাট মণ্ডল সেটা, সমান, সীমাহীন আর নীল। এরকম চেহারা যখন আকাশের, তখন আমাদের মন শান্ত, নির্মেঘ। কিন্তু যখন আকাশ ছেয়ে ফেলে মেঘে—সে মেঘ এদিকে ওদিকে যাচ্ছে অস্বস্তিতে, তাদের রেখা বদলাচ্ছে, দানা বাঁধছে না, তখন আমাদের অন্তরের শান্তিও নামহীন অস্থিরতায় ভেঙ্গে যায়। ঝোড়ো-মেঘ আসছে; সে সময় এ ধরনের একটা অনুভূতি তোমার হয় না?'

'হয়। কিছু একটা আমাকে আমূল নাড়া দেয় যেন।'

'ঠিক বলেছো। আর আমরা অপেক্ষা করি মেঘের পিছনে আকাশের গভীর নীল আবার কখন দেখা যাবে। ঝড় বয়ে গেল, নীল আকাশ কিন্তু থেকে যায়। সেটা ভালো করেই জানি বলে ঝড়বৃষ্টি আমরা সহ্য করি। তাহলে আকাশ নীল। আর সমুদ্রও, যখন শান্ত। তোমার মার চোখ নীল, আর এভেলিনারও।'

'আকাশের মত', হঠাৎ কোমল আবেগে বলল পিওতর।

'আকাশের মত। নীল চোখ মানসিক স্বচ্ছতার লক্ষণ, লোকে মনে করে। এবার ধরো, সবুজের কথা। মাটি ত কালো। বসন্তের প্রথম দিকে গাছের গুঁড়িও কালো, মাঝে মাঝে হয়ত বা ধূসর। কিন্তু বসন্তের সূর্য আলো আর উত্তাপ জোগায়, তপ্ত করে তোলে ওদের কালো গা। আর আস্তে আস্তে সবুজে ওদের কালিমা ঢাকা পড়ে। সবুজ ঘাস, সবুজ পাতা। ওদেরো আলো আর উত্তাপ দরকার, কিন্তু খুব বেশী আলো, খুব বেশী উত্তাপ নয়। সেই জন্যই সবুজ জিনিস দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। সবুজ — তার মানে শিশিরস্নিগ্ধ উষ্ণতা। সবুজ শান্ত পরিতৃপ্তির, স্বাস্থ্যের ভাব জাগায় — গভীর আবেগের কখনোই নয় কিন্তু, লোকে যাকে বলে আনন্দ উচ্ছ্বাস, সেটা নয়। কথাগুলো পরিষ্কার বুঝতে পেরেছো?'

'না, বেশী বুঝিনি। যাই হোক, তুমি বলে যাও, দোহাই তোমার।'

'না বুঝলে হয়ত গত্যন্তর নেই। যাই হোক, আরো বলছি। গ্রীষ্মের তাপ যত বাড়ে তত মনে হয় সবুজ জিনিসগুলো নিজেদের জীবনশক্তির প্রাচুর্যে যেন

ভারাক্রান্ত। পাতাগুলো নুয়ে পড়তে শুরু করে। আর যদি বৃষ্টির ঠাণ্ডা জলে গরম না কমে তাহলে সবুজ রঙ একেবারে মিলিয়ে যেতে পারে। কিন্তু তারপর, হেমন্ত আসন্ন হলে ফলগুলো আকার নিতে শুরু করে, ক্লান্ত পাতার নিচে প্রতিদিন ওদের লাল রঙ গভীরতর দেখায়। সূর্যের আলো সবচেয়ে বেশী যেখানে পায়, সে দিকটা সবচেয়ে লাল। মনে হয় বাড়ন্ত জিনিসের গ্রীষ্মকালীন সমস্ত আবেগ, সমস্ত জীবনশক্তি ফলগুলো নিজেদ্রের মধ্যে সংহত করে নিচ্ছে। আর তাহলে এখানেও দেখছো লাল হল প্রবল আবেগের রঙ। আর লাল রঙকে প্রবল আবেগের প্রতীক হিসেবেই ধরা হয়। উচ্ছ্বাস, পাপ, রাগ, প্রচণ্ড ক্রোধ আর প্রতিহিংসার রঙ হল লাল। জনসাধারণ যখন বিদ্রোহে জাগ্রত হয়, তখন নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করে তাদের পতাকার লালে, যাত্রার সময় হাওয়ায়-অস্থির মশালের মত সেটা থাকে ওদের সঙ্গে। কিন্তু, এবারেও ঠিক মত বোঝাতে পারিনি।’

‘কিছু এসে যায় না, তুমি বলে যাও।’

‘হেমন্তের শেষের দিক। ফল পেকেছে। গাছ্ থেকে

পড়েছে মাটিতে, অসহায়ভাবে আছে সেখানে। ওর আয়ু শেষ হয়ে যায়, কিন্তু ভিতরকার বীজ বেঁচে থাকে; আর এই বীজে ইতিমধ্যেই সম্ভাব্যভাবে বেঁচে আছে নতুন গাছ, নতুন পাতার সম্ভারে, অনাগত ফলেফুলে আচ্ছন্ন। বীজ পড়েছে মাটিতে। আর তার ওপরে সূর্য, নিচু আর ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, ঠাণ্ডা মেঘ তাড়িয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে হাওয়া। তীব্র আবেগ শুধু নয়, জীবনের সমস্ত কিছু আস্তে আস্তে অলক্ষিতে ঝিমিয়ে পড়ছে। সবুজ আচ্ছাদন ভেদ করে ক্রমশ কালো মাটির ফাঁকা চেহারা দেখা দিতে লাগল। আকাশের নীলিমা পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তারপর একদিন এই পরাভূত, শান্ত, বিধবা পৃথিবীতে পড়তে শুরু করল কোটি কোটি বরফের আঁশ। অল্পক্ষণ পরে মসৃণ শাদা আর সমান হয়ে গেল পৃথিবী। শাদা হল নীহার-বদ্ধ তুষারের রঙ; ঠাণ্ডা, অনধিগম্য মহাশূন্যে সবচেয়ে উঁচুতে যে মেঘ ভাসছে, তার রঙ; উচ্চতম পর্বত চূড়া, মহান কিন্তু বন্ধ্যা, তার রঙ। নিষ্কাম, শুচি, অনাসক্ত, মহান পবিত্রতা, শাদা হল তার প্রতিরূপ, বন্ধ্যা, ভবিষ্যৎ কোন মানসজীবনের প্রতিরূপ। আর কালো ...'

‘ওটা আমি জানি’, বলে উঠল পিওতর। ‘শব্দ নেই, সাড়া নেই। রাত্রি।’

‘হ্যাঁ, আর সেই জন্য কালো হল দুঃখ আর মৃত্যুর প্রতিরূপ।’

পিওতর শিউরে উঠল।

‘মৃত্যু!’ বিরস গলায় কথাটির পুনরুক্তি করল। ‘তুমি নিজেই সেটা বললে। মৃত্যু। আর আমার কাছে ত সমস্ত পৃথিবী কালো। সব সময়ে, সব জায়গায়!’

‘মোটেই তা নয়’, রুদ্ধ স্বরে মাক্সিম বললেন। ‘শব্দ, তাপ আর গতি কী তুমি জানো। আশেপাশের সবাই তোমাকে ভালোবাসে। অবুঝের মত যে সব গুণকে তুমি ঘৃণা কর তাদের জন্য অনেকেই নিজেদের দৃষ্টিশক্তি দিতে পারেন। কিন্তু নিজের স্বার্থপর দুঃখে তুমি এত আচ্ছন্ন যে...’

‘আর যদি তাই হই?’ তীব্র আবেগে পিওতরের গলা ধরে গিয়েছে। ‘সত্যিই স্বার্থপর দুঃখে আচ্ছন্ন আমি। কী করবো? সেটা কাটিয়ে উঠতে পারি না। সব সময় সেটা বই।’

‘যদি এ কথাটা একবার মাথায় ঢোকাতে পারো যে

তোমার বিপাকের চেয়ে শতগুণে খারাপ অনেক কিছু পৃথিবীতে আছে; যদি বুঝতে পারো যে ভাবে তুমি থাকো, কোন ঝামেলা নেই, সবাই তোমাকে বরাবর ভালোবেসেছে — যদি বোঝো যে পৃথিবীর নানা গণ্ডগোলের তুলনায় তোমার জীবন স্বর্গের মত, তাহলে...'

'না, না', আগেকার মত উচচ আবেগের সুরে, সক্রোধে বলে উঠল পিওতর। 'সত্যি নয় এটা। সবচেয়ে দীন ভিখিরীর সঙ্গে ভাগ্য বদলে নিতে পারি আমি, কেননা সে আমার চেয়ে সুখী। অন্ধদের প্রতি এত অনুকম্পা, একেবারে অর্থহীন সব। প্রচণ্ড ভুল সেটা। অন্ধদের রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া উচিত, ভিক্ষে করে চালাবে তারা। সত্যি বলছি, ভিখিরী হলে আমার দুঃখ কম হত। সকালে ঘুম ভাঙ্গলে অন্নের চিন্তায় সময় কাটবে। ভিক্ষের পয়সা গুণতে থাকবো, সব সময় দুশ্চিন্তা থাকবে — এতে চলবে কী? আর যথেষ্ট মিললে সেটা আনন্দের খোরাক জোগাবে। আর তারপর রাত্রে কোথায় থাকবো সেটা ভাবতে হবে। পয়সাকড়ি যথেষ্ট না মিললে ক্ষিধেয় আর শীতে কষ্ট পাবো। আর সব মিলিয়ে আমার হাতে সময় একেবারেই থাকবে না ... এখন যে-

ভাবে ভুগছি আর কোন যন্ত্রণাই সেভাবে আমাকে ভোগাতে পারবে না।'

'পারবে না বুঝি?' মাক্সিমের কণ্ঠস্বর কঠিন। বিবর্ণ, গম্ভীর এভেলিনা দেখল মাক্সিম তার দিকে তাকিয়েছেন, দৃষ্টিতে অনুকম্পা আর গভীর উদ্বেগ।

'না, কখনো পারবে না। সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত', একগুঁয়ের মত পিওতর উত্তর দিল, নতুন কর্কশ স্বর তার গলায়। 'আজকাল মাঝে মাঝে এমন কি ইয়েগরকেও আমি হিংসে করি, ঘণ্টাঘরের ইয়েগরকে। খুব সকালে ঘুম ভেঙ্গে গেলে ওর কথা মনে হয়, বিশেষ করে যেদিন হাওয়া চলে আর বরফ পড়ে। ভাবি ও ঘণ্টাঘরের সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠছে...

'ঠাণ্ডায়', বললেন মাক্সিম।

'হ্যাঁ, ঠাণ্ডায়। শীতে কাঁপছে, কাশছে। আর বারবার ফাদার পামফিলিকে গালি দিচ্ছে, শীতে গরম কোট একটা ওকে জোগাড় করে দিচ্ছেন না বলে। আর তারপর, যদিও ওর হাত ঠাণ্ডায় জমে গিয়েছে, তবুও দড়ি ধরে সকালের প্রার্থনার জন্য ঘণ্টা বাজাল। আর তখন ভুলে যায় যে ও অন্ধ। কেননা অত ওপরে

প্রত্যেকেরই , অন্ধ হোক না হোক , ঠাণ্ডা লাগবে। কিন্তু আমি , আমি কখনো ভুলতে পারি না যে আমি অন্ধ আর...'

'আর কোন ছুতোয় গালি দেবার মত কেউ নেই তোমার।'

'হ্যাঁ , গালি দেবার মত কেউ নেই। আমার জীবন ভরাতে পারে এমন কিছুই নেই , দৃষ্টিহীনতা ছাড়া আর কিছু নেই। তার জন্য অবশ্য কাউকে দোষ দিতে পারি না—তবে যে কোন ভিখিরী আমার চেয়ে সুখী।'

'হয়ত তাই', কঠোরভাবে বললেন মাক্সিম। 'ও নিয়ে তর্ক করবো না। যাই হোক, তোমার জীবন কঠোরতর হলে হয়ত তুমি আরো ভাল হতে।'

অনুকম্পায় এভেলিনার দিকে আর একবার তাকিয়ে , ক্রাচ তুলে নিয়ে ভারী খটখট আওয়াজে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন তিনি।

এ আলোচনার পর পিওতরের মানসিক অশান্তি আরো বেড়ে গেল , যন্ত্রণাকর সব ভাবনা চিন্তা তাকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করল।

মাক্সিম যে সব অনুভূতির কথা তাকে বলেছিলেন মাঝে মাঝে সফল কোন মুহূর্তে সেগুলো তার হাতড়ে-

বেড়ানো মনের নাগালে আসত, চারিপাশের সম্বন্ধে ওর নিজের যে সব ধারণা, মিশে যেত তাদের সঙ্গে। পৃথিবী দূর, অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত, অন্ধকার আর বিষণ্ণ পৃথিবী। সবকিছু দেখতে চায় ও, কিন্তু শেষ নেই পৃথিবীর। আর উপরে ছড়িয়ে আছে আর একটি অসীমতা। বজ্রের গুরুগুরু ধ্বনির স্মৃতি জাগে, সঙ্গে আসে বিস্তারের, বিপুলতার অনুভূতি। বাজ ডাকা শেষ, কিন্তু কিছু একটা রয়ে গেছে, ওখানে উপরে, সেটা মহিমা আর প্রশান্তির অনুভূতিতে অন্তর ভরিয়ে দেয়। কখনো কখনো এই অনুভূতি প্রায় বাস্তব সংজ্ঞা নেয়—এভেলিনার কিম্বা মায়ের কণ্ঠস্বরে; কেননা ওদের চোখ 'আকাশের মত'। কিন্তু হঠাৎ, কল্পনার অতল গভীরে যে প্রত্যয়টি দানা বেঁধে উঠছিল সেটি অতিরিক্ত সংজ্ঞার চাপে বিনষ্ট হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

এই সব ভাসা-ভাসা কল্পনা যন্ত্রণা দেয় তাকে, পরিতৃপ্তির কণাটুকু আনে না। এত কষ্টসাধ্য প্রয়াসে ধরবার চেষ্টা করে তাদের, তবুও তারা থেকে যায় অস্পষ্ট, হুতাশা ছাড়া আর কিছু আনে না। ওর আর্ত অন্তরের ক্লিষ্ট নানা অন্বেষা, সংবেদনের যে পরিপূর্ণতা থেকে

জীবন তাকে বঞ্চিত করেছে সেটা ফিরে পাবার নিষ্ফল প্রয়াস, তার সঙ্গে সঙ্গে অহোরহ যে গভীর যন্ত্রণা বর্তমান, সেটার উপশম কখনো হয় না।

৮

বসন্ত এসেছে। জমিদার-বাড়ী থেকে প্রায় ষাট ভার্স্ট দূরে, স্তাভরুকোভোর বিপরীত দিকে একটি ছোট সহরে একটি দিব্য ক্যাথলিক আইকন আছে, এ সব ব্যাপারে ওয়াকিবহাল যারা তারা প্রায় সঠিকভাবে এটির অলৌকিক শক্তি নির্ণয় করেছিল। পায়ে হেঁটে এসে নির্দিষ্ট উৎসবের দিনে আইকনটিকে ভক্তি জানালেই 'বিশ দিনের রেহাই' মিলত—অর্থাৎ এ পৃথিবীতে বিশ দিনে কোন পাপ কিম্বা অপরাধ করে থাকলে পরলোকে কোন শাস্তি হবে না। আর তাই প্রতি বছরে বসন্তের প্রথম দিকে বিশেষ একটি দিনে ছোট্ট সহরটিতে সাড়া পড়ে যেত, চেহারাটা এমন বদলে যেত যে চেনা ভার। উৎসবের জন্য বসন্তের প্রথম সবুজ পাতায় আর ফুলে সাজানো হত পুরানো গির্জাটিকে, ঘণ্টার উচচকিত আনন্দের রোলে সারা সহর ভরে যেত। ক্রমাগত জমিদারদের গাড়ীর চাকার ঘর্ঘর

শব্দ, আর পথ আর স্কোয়ার, এমন কি দূরের মাঠবাট পর্যন্ত ভরে যেত পায়ে-হাঁটা তীর্থযাত্রীদের ভিড়ে। তীর্থযাত্রীদের সবাই ক্যাথলিক নয়। আইকনটির খ্যাতি অনেক দূর ছড়িয়েছিল, অর্থডক্স চার্চের অনেক দুঃস্থ আর আর্ত লোকেরাও আসত, তাদের অধিকাংশই সহরবাসী।

অন্যান্য বছরের মত এবারেও উৎসবের বড়ো দিনে গির্জার রাস্তায় অসংখ্য লোকের ভিড়, রঙীন আর বিরাট সে জনসমুদ্র। কাছের কোন পাহাড়ের চূড়া থেকে দেখলে ঠাসাঠাসি করা নানা দলকে মনে হয় একটি জীবন্ত সমষ্টি—রাস্তায় পড়ে আছে বিরাট বাসুকি, জড়, নিঃসাড়—শুধু গভীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ওঠাপড়া করছে ওর নিষ্প্রভ, নানা রঙের আঁস। আর ভিড়াক্রান্ত রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়ে ভিখিরীরা, অন্তহীন দুটি সারি, ভিক্ষার জন্য হাত পেতে আছে।

ক্রাচে ভর দিয়ে মন্থর গতিতে একটি রাস্তা ধরে চলেছেন মাক্সিম সহরের উপকণ্ঠের দিকে। পাশে তাঁর পিওতর, ইওহিমের সঙ্গে চলেছে।

জনতার চীৎকার, ইহুদী ফেরিওয়ালাদের ডাক, চাকার ঘর্ঘর, গির্জার রাস্তার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত

পর্যন্ত উচ্চকিত অট্টরোল আর হৈহৈ ওরা পেরিয়ে এসেছে। এত দূরে সমস্ত আওয়াজ মিলেছে বিরাট, ভারী একটি শব্দের ঢেউ-এ, কখনো উঠছে, কখনো নামছে সেটা, থামছে না কখনো। এখানেও, ভিড় কম হলেও, ক্রমাগত কানে আসছে পায়ের শব্দ, কথাবার্তার গুঞ্জন আর ধূলোভরা রাস্তায় গাড়ীর চাকার খসখস আওয়াজ। একবার ত বলদ গাড়ীর লম্বা একটা লাইন মাঠ থেকে কিঁচকিঁচ করে ওদের পেরিয়ে ঢুকল পাশের একটি রাস্তায়।

দিনটা ঠাণ্ডা, নিরুৎসাহে মাক্সিমের অনুসরণ করতে করতে পিওতর বারবার কোটটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিচ্ছে। রাস্তার কোলাহল অন্যমনস্কভাবে শুনছে ও; কিন্তু এখানেও ওর মন নিষ্ক্রিয় নয়, যে সব ব্যথাময় অন্বেষায় আজকাল সে পীড়িত, তারা এখনো তার মাথায় ঘুরছে।

এই আত্মকেন্দ্রিক নিবিষ্টচিত্ততা ভেদ করে হঠাৎ তার কানে এল নতুন একটি শব্দ—এত জোরে এল যে মাথা সোজা করে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

সহরের প্রান্তে এসেছে তারা, শেষ কয়েকটি বাড়ীর সারির পরে শুরু হয়েছে বেড়ার দীর্ঘ রেখা আর পোড়ো

জমির খণ্ড, আর তারো পরে পথটি চওড়া হয়ে গিয়েছে প্রশস্ত সদর রাস্তায়, খোলা মাঠের মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে সেটা। যেখানে পথটি চওড়া হয়েছে সেখানে একদা কোন ধর্মভীরু লোক পাথরের একটি থাম বসিয়েছিল, তাতে ছিল আইকন আর লণ্ঠন একটি। লণ্ঠনটা অবশ্য কখনো জ্বালানো হত না; কিন্তু হাওয়া লাগলেই সেটা কিঁচকিঁচ করে আঁকড়ায় দুলত। আর থামের নিচে ঠেসাঠেসি করে বসে আছে অন্ধ ভিখিরীর একটি দল, যারা অন্ধ নয় তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় না পেরে ভালো জায়গাগুলো থেকে হটে এসেছে। প্রত্যেকের হাতে কাঠের ভিক্ষাপাত্র; আর মাঝে মাঝে কেউ না কেউ করুণ সুরে বলছে:

'অন্ধকে দয়া করো, দোহাই যীশুর!'

দিনটি ঠাণ্ডা আর ভিখিরীরা সকাল থেকে ওখানে বসে। মাঠ থেকে কনকনে হাওয়া আসছে, ওদের ঢেকে রাখবার মত কিছু নেই। অন্যদের মত ভিড়ের মধ্যে চলাফেরা করে যে হাত-পা গরম করে নেবে তারে উপায় নেই। আর পালা করে সুর করে উচ্চারিত ওদের নিরানন্দ ভিক্ষার প্রার্থনা যুক্তিহীন অব্যক্ত অনুযোগে ভারী, শারীরিক ক্লেশের যন্ত্রণায় আর দুর্বিষহ অসহায়তায়.

ভারাক্রান্ত। দু একটি শব্দ উচচারণ করার পরেই সঙ্কীর্ণ বুক দমে কুলিয়ে উঠতে পারছে না, ভিক্ষার স্বুর পরিণত হচ্ছে ভয়াবহ অস্ফুট চাপা আওয়াজে, বিলম্বিত, কম্পিত দীর্ঘনিঃশ্বাসে মিলিয়ে যাচ্ছে। শেষের ক্ষীণ রেশ রাস্তার কোলাহলে প্রায় চাপা পড়ছে, কিন্তু সেটুকুও কানে গেলে কী বিপুল যন্ত্রণা তার পিছনে সেটা স্তম্ভিতভাবে যে কোন লোক উপলব্ধি করত, প্রায় অবিশ্বাস্য সে উপলব্ধি।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল পিওতর, ব্যথায় মুখ বিকৃত ওর। ভিখিরীদের কাতর ক্রন্দন যেন কোন ভয়াবহ শ্রবণগ্রাহ্য প্রেতাত্মা, ওর সামনে আবির্ভূত হয়েছে।

'ভয় পেলে কেন?' মাক্সিম জিজ্ঞেস করলেন। 'যে সব সৌভাগ্যবান লোকেদের এত হিংসে করছিলে সেদিন, তাদেরি আওয়াজ এটা। অন্ধ ভিখিরীরা ভিক্ষা চাইছে। একটু ঠাণ্ডা ওদের লাগছে, অবশ্য। কিন্তু তোমার মতে সেটা ত ওদের আরো খুসী করা উচিত।'

'ওখান থেকে চলে এসো', মাক্সিমের হাত ধরে বলল পিওতর।

'তাহলে সরে আসতে চাইছো তুমি! অন্য লোকের দুঃখকষ্ট দেখলে তোমার শুধু এই রকম ভাব হয়?

না, একটু দাঁড়াও। তোমার সঙ্গে খুঁটিয়ে আলোচনার ইচ্ছে আমার অনেক দিন, আর যা বলতে চাই তার উপযুক্ত জায়গা এটা। তুমি ত গজগজ করো যে সে সব দিন আর নেই, অন্ধ কিশোররা আর রাত্রির লড়াই-এ কাটা পড়ে না, এই যেমন সেই তরুণ বানদুরিস্ত ইউরকো কাটা পড়েছিল। ঘণ্টাঘরের ইয়েগরের মত তোমার গালি দেবার কেউ নেই বলে তুমি বিরক্ত। আর মনে মনে তুমিও গালি দাও, আত্মীয়স্বজনকে গালি দাও, কেননা ভিখিরীদের জীবনের চরম সুখ থেকে তারা তোমাকে বঞ্চিত করেছে। আর—শপথ করে বলছি—হয়ত তোমার কথাই ঠিক। বৃদ্ধ সৈনিক হিসেবে শপথ করে বলছি, নিজের জীবন যাত্রা বেছে নেবার অধিকার প্রত্যেক লোকের আছে। আর তুমি ত এখন সাবালক। সে জন্য যা বলছি শোনো। আমরা যা ভুল করেছি যদি সেটা শোধরাতে মনস্থির করো; তোমার নিয়তিকে তুড়ি মেরে, আজন্ম যে সব সুযোগ সুবিধা জীবন তোমাকে দিয়েছে সেগুলো ছেড়ে দিতে চাও, এই সব দুর্ভাগাদের মত থাকতে চাও—তাহলে আমি, মাক্সিম ইয়াৎসেঙ্কো, শপথ করছি যে তোমাকে শ্রদ্ধা করবো, সাহায্য আর

সমর্থন করবো। আমি যা বলছি শুনছো, পিওতর ইয়াৎসেঙ্কো? যখন যুদ্ধে আর আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম তখন তোমার এখন যা বয়স তার চেয়ে খুব বড়ো ছিলাম না। মা কেঁদেছিলেন আমার জন্য, তোমার মাও ঠিক তেমনভাবেই তোমার জন্য কাঁদবে। কিন্তু চুলোয় যাক সব, আমি এখনো ভাবি যা করেছিলাম সেটা করার অধিকার আমার ছিল, যেমন তোমারো অধিকার আছে এখন! জীবনে একবারই নিয়তি মানুষকে পথ বেছে নিতে বলে। আর তাই, তুমি একবার বললেই ...'

কথা থামিয়ে ভিখিরীদের দিকে ঘুরে মাক্সিম হাঁকলেন 'ফিওদর কানদীবা, তুমি কি ওখানে?'

'হ্যাঁ, এই খানে', ভাঙ্গা গলার ভিখিরীদের মধ্যে জবাব দিল এক জন। 'আপনি কি মাক্সিম মিখাইলভিচ্?'

'হ্যাঁ। শোনো, যেখানে আসতে বলেছি সেখানে এসো এক সপ্তাহ পরে।'

'আমি সেখানে থাকবো', জবাব দিল ভিখিরী, তারপর আবার অন্য ভিখিরীদের সঙ্গে শুরু করল শেষহীন ভিক্ষা প্রার্থনা।

মাক্সিমের চোখ জ্বলছে। তিনি বললেন, 'এই লোকটির ভাগ্যের আর লোকজনের বিরুদ্ধে গজগজ করার অধিকার আছে। হয়ত কী করে বোঝা বইতে হয় ওর কাছে শিখবে, আর ...'

'এখান থেকে চলুন যাই', বলে উঠল ইওহিম। পিওতরের হাত টেনে ধরে ক্রুদ্ধভাবে মাক্সিমের দিকে তাকালো।

'না', মাক্সিম চেঁচিয়ে উঠলেন সক্রোধে। 'অন্ধ ভিখিরীকে অন্তত একটা পয়সা না দিয়ে কেউ যায় না, বেশী না থাকলে একটি পয়সা অন্তত দেয়। সেটাও না দিয়ে কেটে পড়তে চাইছো না কি? শাপ-শাপান্ত করা, ভরপেটে অন্য লোকের ক্ষিধে নিয়ে ঈর্ষা করা ছাড়া আর কিছু তুমি জানো না!'

মাথা উঁচু করে দাঁড়াল পিওতর, যেন কেউ চাবুক মেরেছে। ব্যাগ বের করে, ঠেসাঠেসি করে বসা ভিখিরীর দলের দিকে এগিয়ে গেল। হাতড়ানো লাঠি সবচেয়ে কাছের ভিখিরীর পায়ে ঠেকল, তার উপরে ঝুঁকে পড়ে কাঠের ভিক্ষাপাত্রটি কোথায় আঁচ করে পিওতর তামার পয়সার গাদায় সাবধানে টাকা রাখল। একটি সুদর্শন

যুবক, ভদ্র ঘরের সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, হাতড়ে ভিখিরীকে ভিক্ষে দিচ্ছে আর ভিখিরীটাও সমানভাবে হাতড়ে সেটা নিচ্ছে, কয়েকটি পথচারী দাঁড়িয়ে পড়ে দৃশ্যটি অবাক হয়ে দেখল।

কিন্তু মাক্সিম হট করে ঘুরে ক্রাচে ভর দিয়ে এগিয়ে গেলেন। মুখ তাঁর আরক্তিম, চোখ জ্বলছে। বোঝা যাচ্ছে ক্রোধের ভীষণ আক্ষেপে তিনি আচ্ছন্ন, যুবা বয়সে এ ধরনের আক্ষেপ তাঁর চেনা-শুনোদের সবায়ের ভালো করে জানা ছিল। তিনি গুরুমশাই-এর মত প্রত্যেকটি কথা ওজন করে, বাছাই করে বলেননি। ভীষণ উত্তেজিত রাগে যা মনে এসেছে তাই বলেছেন। কিন্তু পরে পিওতরের দিকে আড়ভাবে একবার তাকিয়ে ওঁর রাগ কমছে মনে হল। খড়ির মত শাদা দেখাচ্ছে পিওতরকে। ভুরু দুটি প্রায় জোড়া, মুখে গভীর উত্তেজনার ছাপ।

ছোট সহরের রাস্তা ধরে ওরা চলল, ঠাণ্ডা হাওয়ায় ওদের চারিদিকে ধূলোর' ঘুরপাক উঠছে। ওদের পিছনে অন্ধ ভিখিরীরা পিওতরের দেওয়া টাকা নিয়ে ঝগড়া করছে শোনা গেল...।

৯

হয়ত শুধু ঠাণ্ডা লেগেছিল; দীর্ঘকালব্যাপী মানসিক সঙ্কট চরমে পেঁৗছিয়েছিল হয়ত; হয়ত দুটো মিলে— যে কোন কারণেই হোক না কেন, পরের দিন জ্বরের ঘোরে পিওতর ঘরে শুয়ে রইল। বিছানায় ছটফট করছে, মুখ বিকৃত। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে কী যেন শুনছে; আবার মাঝে মাঝে লাফিয়ে উঠে ছোটার চেষ্টা করছে যেন। সহর থেকে ডেকে-আনা বুড়ো ডাক্তার নাড়ী টিপে বসন্তের ঠাণ্ডা হাওয়ার কথা বললেন। গম্ভীর ভ্রূকুটি করলেন মাক্সিম, বোনের দিকে তাকাতে সাহস হল না।

জ্বর ছাড়ছে না। অসুখের চরমাবস্থায় কয়েকদিন পিওতর পড়ে রইল প্রায় মড়ার মত। কিন্তু যৌবনে সামলে ওঠার শক্তি থাকে, সেরে উঠল পিওতর।

একদিন হেমন্তের দীপ্ত সকালে আন্না মিখাইলভনা দেখল উজ্জ্বল সূর্যরশ্মি জানলা দিয়ে ঢুকে পিওতরের বিছানায় পড়েছে।

'পর্দাটা টেনে দাও', বলল এভেলিনাকে। 'সূর্যের আলো—আমার কেমন যেন ভয় হয়।'

এভেলিনা জানলার কাছে যাবার জন্য উঠেছে, হঠাৎ পিওতর বলল, 'না, বন্ধ কোরো না, খোলা থাক জানলাটা।'

অনেক ক্লান্ত দিনের পরে এই প্রথম কথা বলল পিওতর।

ওরা আনন্দে ওর উপরে ঝুঁকে পড়ল।

'শুনতে পারছো তাহলে? আমাকে চেনো?' মা জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ', বলে পিওতর থামল। মনে হল কী যেন মনে করার চেষ্টা করছে। তারপর ক্ষীণকণ্ঠে বলে উঠল, 'এবার মনে পড়েছে!' আর উঠে বসার চেষ্টা করল। 'ফিওদর, সে কি এসেছে?'

উৎকণ্ঠিতভাবে এভেলিনা আর আন্না মিখাইলভনা দৃষ্টি বিনিময় করল। পিওতরের ঠোঁটে আঙুল রাখল আন্না মিখাইলভনা।

'চুপ! তোমার কথা বলা বারণ।'

মায়ের হাত ধরে ঠোঁটের কাছে নিয়ে এসে পিওতর কোমলভাবে অনেকবার চুম্বন করল। চোখ জলে ভরে গেল। আটকাবার চেষ্টা করল না পিওতর, মনে হল কেঁদে আরাম পাচ্ছে।

কয়েক দিন গভীর চিন্তায় চুপচাপ কাটাল পিওতর, কিন্তু বড়ো ঘরে মাক্সিমের পায়ের শব্দ হলেই মুখটা থরথর করে কেঁপে উঠত। সেটা লক্ষ্য করে মেয়েরা মাক্সিমকে বলল যেন রোগীর ঘরে না আসে। কিন্তু একদিন পিওতর নিজেই তাঁকে দেখতে চাইল, একলা দেখা করতে বলল।

বিছানার কাছে এসে পিওতরের হাতে কোমলভাবে হাত বুললেন মাক্সিম। বললেন, 'তোমার কাছে মাপ চাওয়া বাকি আছে মনে হচ্ছে।'

পিওতরও জবাবে মামার হাতে চাপ দিল।

'ব্যাপারটা এখন বুঝেছি', অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে বলল সে। 'আমাকে উচিত শিক্ষা দিয়েছো তুমি, সে জন্য আমি কৃতজ্ঞ।'

'শিক্ষা চুলোয় যাক!' অধৈর্য ভঙ্গী করে মাক্সিম বললেন। 'অনেক দিন গুরুমশাই হয়ে থাকাটা বিচ্ছিরি ব্যাপার। মাথাটা গোবরে ভরে যায় একেবারে। না, সেদিন কিছু শেখাবার কথা ভাবিনি আমি। সেদিন শুধু চটে গিয়েছিলাম, নিজের এবং তোমার উপরে ভয়ানক চটে গিয়েছিলাম।'

'তাহলে তুমি সত্যিই চেয়েছিলে যে আমি…'

'কী চেয়েছিলাম তাতে কী এসে যায়? আর চটে গেলে লোকে কী চায় কে বলতে পারে? আমি শুধু চেয়েছিলাম অন্য লোকের দুঃখকষ্টের কিছুটা ধারণা তোমার হোক। নিজের দুঃখ নিয়ে অত মাথা ঘামিও না।'

এক মুহূর্ত কেউ কথা বলল না।

অবশেষে পিওতর বলল, 'ওদের ভিক্ষের সুর! যখন জ্ঞান ছিল না তখনো একবারও সেটা ভুলিনি। আর ফিওদর, যার সঙ্গে তুমি কথা বললে—ও কী ছিল?'

'ফিওদর কানদীবা। আমার পুরানো আলাপী লোক।'

'ও কি… জন্মান্ধ?'

'আরো খারাপ। যুদ্ধে ওর চোখ জ্বলে গিয়েছিল।'

'আর এখন ও সুর করে গেয়ে ভিক্ষে চেয়ে বেড়ায়?'

'হ্যাঁ, আর একগাদা অনাথ ভাইপোর ভার ওর ওপরে। তবু প্রত্যেকের সঙ্গে হেসে কথা বলে, ঠাট্টা করে।'

'সত্যি?' জিজ্ঞেস করল পিওতর, কী যেন ভাবতে ভাবতে বলল, 'যাই বলো না কেন, সমস্তটাতে কেমন যেন রহস্যের ছাপ আছে। আমার ইচ্ছে করে…'

'কী ইচ্ছে করে বলো ত, লক্ষ্মী ছেলে!'

কয়েক মুহূর্ত পরে বড়ো ঘরে পায়ের শব্দ শোনা গেল, দরজা খুলল আন্না মিখাইলভনা। দুজনের মুখে উৎকণ্ঠিতভাবে চেয়ে ও শুধু বুঝতে পারল যে আলোচনায় দুজনেই বিচলিত, ও আসাতে কথাবার্তা হঠাৎ থেমে গিয়েছে।

জ্বর ছেড়ে যাবার পরে পিওতরের নবীন শরীর তাড়াতাড়ি সেরে উঠল। আরো দু সপ্তাহ পরে হেঁটে চলে বেড়াতে শুরু করল পিওতর।

অনেক বদলে গিয়েছে ও। এমন কি ওর চেহারাও বদলে গিয়েছে মনে হয়; তিক্ত, নিহিত যন্ত্রণার যে প্রক্ষোভ আগে বারবার তাকে পীড়িত করত, এখন সেটা আর চেহারায় নেই। তীব্র আধ্যাত্মিক বিক্ষোভ পরিণত হয়েছে শান্ত গভীর চিন্তার ভাবে, কোমল বিষণ্ণতার ছোপ তাতে।

মাক্সিমের ভয় যে পরিবর্তনটা ক্ষণস্থায়ী হবে, শারীরিক দুর্বলতার ফলে স্নায়বিক বিক্ষোভ একটু শিথিল হয়েছে মাত্র। তারপর একদিন, সন্ধ্যা তখন নামতে শুরু করেছে, অসুখের পর প্রথম পিয়ানোয় পিওতর

বসল আর উপস্থিত-মত বাজিয়ে চলল, উপস্থিত-মত বাজাতে সে বরাবরই পছন্দ করত। শান্ত কোমল বিষণ্ণতা ওর সঙ্গীতে, মেজাজের সঙ্গে খুব খাপ খেয়েছে। তারপর হঠাৎ একসঙ্গে এই শান্ত বিষণ্ণতা ভেদ করে এল অন্ধ ভিখিরীদের একটানা প্রার্থনার প্রথম কয়েকটি ধ্বনি। সুর ভেঙ্গে গেল, হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠল পিওতর, মুখ বেঁকে গিয়েছে, চোখে জল চিকচিক করছে। মনে হল ভিখিরীদের ভাঙ্গা মর্মান্তিক অনুযোগে জীবনের যে সুর-বৈষম্য অত বলিষ্ঠভাবে তার কাছে প্রকাশ পেয়েছিল তার সঙ্গে যুঝবার মত শক্তি তখনো তার হয়নি।

সেদিন সন্ধ্যায় মাক্সিম আর পিওতর আবার অনেকক্ষণ কথা বলল একলা। পরে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটল, আর পিওতরের মনোভাবে আর কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। যে অতি তিক্ত, অতি আত্মকেন্দ্রিক দুঃখ চেতনা তার চিত্তকে গত কয়েক মাস জড় করে রেখেছিল, ওর স্বাভাবিক উদ্যমকে দাবিয়ে রেখেছিল, সেটা চলে গিয়েছে, তার বদলে অন্যান্য অনুভূতি এসেছে মনে হল। কী করতে হবে না হবে,

ভবিষ্যতের নানা জল্পনা-কল্পনা আবার শুরু হল। ওর জীবনীশক্তি ফিরে আসছে, আহত হৃদয়ে আবার রঙ ধরেছে, ঠিক যেমন বসন্তের প্রথম উদ্দাম হাওয়ায় জীর্ণ গাছ্ আবার নতুন জীবনে উচ্ছ্‌ল হয়ে ওঠে…। সেই গ্রীষ্মেই ঠিক করা হল পিওতর কিয়েভে যাবে সঙ্গীত চর্চার জন্য, নাম করা পিয়ানো বাদক একজন তাকে শেখাবেন। সঙ্গে যাবে শুধু মাক্সিমমামা, পিওতর আর মাক্সিম দুজনেই এটা জোর দিয়ে বলল।

## ১০

জুলাই-এর একটি উষ্ণ সন্ধ্যায় দুঘোড়ার ব্রিচ্‌কাটি রাস্তা ছেড়ে স্তেপে ঢুকল, কাছের একটি বনের ধারে রাত কাটল। ভোর হয়ে আসছে, রাস্তা ধরে এল দুটি অন্ধ ভিখিরী, একজন সেকেলে একটা বাদ্যযন্ত্রের হাতল ঘোরাচ্ছে—ফাঁপা চোঙ, হাতল ঘোরানোয় কাঠের একটি দাঁড়ি টান-টান তারে ঘষে ঘষে একটানা বিষণ্ণ গুনগুন ধ্বনির সৃষ্টি করছে। অন্য ভিখারীটি সকালের প্রার্থনা সুর করে বলছে, বয়সের দরুণ ভাঙা গলা, একটু নাকি সুর, কিন্তু শুনতে প্রীতিকর।

রাস্তায় আর একটু দূরে রোদে-শুকানো মাছ্ বোঝাই একদল গাড়ী ঘর্ঘর করে চলেছে। গাড়োয়ানরা শুনল কে যেন অন্ধ ভিখিরী দুটিকে ডাকল, ওরা দেখল যে দুজনে রাস্তা ছেড়ে গেল কয়েকটি ভদ্রলোকের দিকে, বনের ধারে দাঁড়-করানো ব্রিচ্‌কার পাশে গালিচা পেতে বসে তাঁরা বিশ্রাম করছিলেন। কিছুক্ষণ পরে গাড়োয়ানরা একটি কূয়ো থেকে জল তুলে ঘোড়াদের ধোয়াচ্ছে, ভিখিরীরা আবার এসে পড়ল। কিন্তু এবার তিন জন। দলের নেতা প্রতি পদক্ষেপে লম্বা লাঠি দিয়ে রাস্তা ঠুকে দেখছে, বুড়ো সে, মাথায় লম্বা শাদা বাবরি চুল, ঝুলে-পড়া গোঁফ বরফের মত শাদা। কপালে পুরানো অনেক ঘা, খুব পুড়ে গেলে যেমন হয়, চক্ষুকোটর শূন্য। কাঁধে ঝোলানো শক্ত দড়ি একটা দ্বিতীয় ভিখিরীর বেল্ট পর্যন্ত টানা। দ্বিতীয়টি দীর্ঘাকৃতি, বলিষ্ঠ, মুখে অনেক গুটির দাগ, আর মুখের ভাব বিরস, খিটখিটে। দুজনে এগিয়ে চলেছে অভ্যস্ত ভঙ্গীতে, দৃষ্টিহীন মুখ উঁচু করে যেন আকাশে তাকিয়ে জানতে চাইছে গতিপথ। তৃতীয় ভিখিরীটি নবীন, চাষীরা যেমন খরখরে জামাকাপড় পরে অনেকটা সেই রকম নতুন পোশাক তার পরনে। মুখ

তার বিবর্ণ, যেন ভয়ের আভাস মুখের ভাবে। দ্বিধাগ্রস্ত তার গতি। মাঝে মাঝে থামছে, মনে হচ্ছে পিছনের কোন শব্দ শুনছে, তার সঙ্গীদের চলনে বাধা দিচ্ছে।

দশটার মধ্যে বন ছাড়িয়ে অনেক দূর তিনজনে চলে এল—সেখান থেকে দেখলে বনটি দিগন্তে ঝাপসা নীল দাগ একটা শুধু, আর কিছু নয়। ওদের চারিদিকে বিস্তৃত ফাঁকা স্তেপ। কিছুক্ষণ পরে এক ঝাঁক রোদে-উষ্ণ টেলিগ্রাফের তারের ধ্বনি শোনা গেল। বোঝা গেল যে ধূলোভরা রাস্তাটা গিয়ে সামনেই সদর রাস্তায় পড়েছে। সদর রাস্তায় এসে ওরা ডাইনে ঘুরল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পিছন থেকে এল ঘোড়ার খুরের খটখট শব্দ, সদরের পাকা রাস্তায় লোহার চাকার খসখসে আওয়াজ। থেমে রাস্তার একধারে ওরা দাঁড়াল। আবার চোঙের কাঠের দাঁড়িটা ঘষে ঘুরতে শুরু করল বিষণ্ন গুনগুন সুরে, আর ভাঙা বুড়োটে গলা সুর ধরল:

‘অন্ধকে দয়া করো...’ ভিক্ষা প্রার্থনা চলেছে, ভিখিরীদের মধ্যে নবীনতম যে সে গুনগুন ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তারে আঙুল দিয়ে বাজাতে লাগল।

বুড়ো কানদীবার পায়ের কাছে ঠন করে একটি টাকা পড়ল, রাস্তায় গাড়ীর চাকার শব্দ গেল থেমে। বোঝা গেল দাতা দেখতে চায় যে টাকাটা হারিয়ে না যায়। কানদীবা চট করে টাকাটা তুলে নিল, আঙুল দিয়ে সেটা দেখতে দেখতে খুসীতে ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'ভগবান তোমার ভালো করুন', বলল সে, গাড়ীটার দিকে আবার মুখ ঘোরাল। ব্রিচ্‌কায় শুভ্র-কেশ একটি ভদ্রলোক বসে, গঠন তার চওড়া আর চৌকস। একজোড়া ক্রাচ তার পাশে।

নবীনতম ভিখিরীর দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ব্রিচ্‌কায় আসীন বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি। যুবকটি বিবর্ণ কিন্তু ধীর—যদিও এক মুহূর্ত আগে কানদীবার ভিক্ষা চাইবার প্রথম ধ্বনি শুনেই সে তারে তীক্ষ্ণ অস্থির টান দিয়েছিল, করুণ সুরটি ডুবিয়ে দেবার প্রয়াসে যেন। ব্রিচ্‌কাটি চলে গেল। যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ ফিরে ফিরে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি ভিখিরীদের দিকে বারবার তাকালেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই চাকার আওয়াজ দূরে মিলিয়ে গেল। রাস্তায় ফিরে এসে ভিখিরীরা আবার একে একে যাত্রা শুরু করল।

‘তুমি আসাতে আমাদের কপাল ফিরেছে, ইউরি’, কানদীবা বলল। ‘আর তুমি খাসা বাজাও।’

একটু পরে মুখে দাগ যার সে ভিখিরীটি জিজ্ঞেস করল, ‘ভগবানের জন্য তাহলে তুমি পচাইয়েভে যাচ্ছো? মানত করেছিলে বুঝি?’

‘হ্যাঁ’, অস্ফুট কণ্ঠে যুবকটি বলল।

‘ভাবছো দৃষ্টি ফিরে পাবে?’ প্রশ্নটি করা হল তিক্ত হাসির সঙ্গে।

‘কয়েকজনে ত ফিরে পায়’, কানদীবা বলল নরম সুরে।

‘সেরকম কাউকে ত দেখিনি, এত দিন পথে পথে ঘুরছি’, বিরসভাবে বলল সে, মুখে দাগ যার। চুপ করে গেল সবাই, সমানে এগিয়ে চলল। সূর্য ক্রমশ উঁচুতে উঠল, আরো উঁচুতে, রাস্তার সোজা শাদা রেখার পটভূমিতে ভিখিরীদের, আর অনেক দূরে, ব্রিচ্‌কাটির কালো ছায়া। আরো কিছু আগে সদরের রাস্তা দু মুখে গিয়েছে। ব্রিচ্‌কা গেল কিয়েভের রাস্তায়; কিন্তু ভিখিরীরা সদরের রাস্তা ছেড়ে মেঠো পথ ধরল, ওদের গন্তব্য পচাইয়েভ।

কিছুদিন পরেই জমিদার-বাড়ীতে একটি চিঠি পৌঁছল। কিয়েভ থেকে মাক্সিম লিখেছেন যে তিনি এবং পিওতর দুজনেই ভালো আছেন, ঠিক যা চেয়েছিলেন সেইভাবে সব চলছে।

আর ভিখিরী তিনজন পথ ধরে চলল। প্রত্যেকেই এখন একই অভ্যস্ত ভঙ্গীতে হাঁটছে, সবচেয়ে আগে কানদীবা, প্রতি পদক্ষেপে লাঠি দিয়ে মাটি ঠুকে দেখছে। রাস্তাঘাট অলিগলি সবকিছু তার চেনা, মেলা কিম্বা উৎসবের দিনে ঠিক সময় বড়ো বড়ো গ্রামগুলোতেও পৌঁছয়। ওদের ছোট অর্কেস্ট্রার ভাল বাজনা শোনার জন্য লোক জড়ো হয়, আর বুড়ো কানদীবার বাড়িয়ে-দেওয়া টুপিতে ঠুনঠুন করে পয়সাকড়ি পড়ে।

তরুণ ভিখিরীটির দ্বিধাগ্রস্ততা, প্রায় ভীতির ভাব শীগ্‌গিরই চলে গেল, সেটার পরিবর্তে অন্য অনুভূতি এল। রাস্তায় প্রতি পদক্ষেপে নতুন নতুন শব্দ কানে আসছে—বিরাট অজানা পৃথিবীর নানা শব্দ, যে শব্দের জন্য সে শান্ত জমিদার-বাড়ীর অলস ঘুম-পাড়ানো গুনগুন ছেড়েছে। ওর দৃষ্টিহীন চোখ ক্রমশ খুলে যাচ্ছে, বুক চওড়া হচ্ছে, তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তি হচ্ছে আরো তীক্ষ্ণ। ক্রমশ

নিজের সঙ্গীদুটিকে ভালো করে চিনল—দয়ালু কানদীবা আর খিটখিটে কুজ্‌মাকে। চাষীদের কিঁচকিঁচে গাড়ীর বড়ো বড়ো সারির পিছনে ওদের সঙ্গে হেঁটে চলে; খোলা স্তেপে জ্বলন্ত আগুনের পাশে কাটাল অনেক রাত; শুনল মেলা আর বাজারের সোরগোল; মানুষের দুঃখ আর দুর্দশা দেখল, সেটা শুধু অন্ধদের মধ্যে নয়, দেখে তিক্ত ব্যথায় হৃদয় চিরে গেল; আর বললে হয়ত আশ্চর্য লাগবে, নতুন সব অনুভূতি অন্তরে গ্রহণ করল। ভিখিরীদের গান শুনে আর শিউড়ে উঠত না সে। আর যত দিনের পর দিন কাটতে লাগল জীবনের এই বিরাট বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে, অনধিগম্যের জন্য ওর ব্যথাময় তৃষ্ণা তত কমল, স্তব্ধ হয়ে এল। ওর সূক্ষ্ম কানে প্রতিটি নতুন গান আর সুর ধরা পড়ে, যখন ও বাজাত তখন এমন কি কুজ্‌মার বিরস মুখও খুসীর ভাবে নরম হয়ে আসত। পচাইয়েভ যত কাছে আসছে তত ওদের ছোট দল ভারী হচ্ছে।

•

হেমন্তের শেষ দিকে, রাস্তাঘাট বরফের স্তূপে ঢাকা, জমিদার-বাড়ীর তরুণটি হঠাৎ বাড়ী ফিরে এল, সঙ্গে

দুটি অন্ধ ভিখিরী। বাড়ীর সবাই অবাক। লোকে বলল ও পচাইয়েভে গিয়েছিল, আরোগ্যলাভের জন্য কুমারী মেরির আইকনে প্রার্থনা জানাতে। সেখানে যাবে অঙ্গীকার করেছিল।

যাই হোক না কেন, ওর চোখদুটো আগেকার মত পরিষ্কার, আর আগেকার মতই দৃষ্টিহীন। কিন্তু অনেক ঘুরে ওর অন্তর যে আরোগ্যলাভ করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মনে হল যেন ভয়াবহ কোন দুঃস্বপ্ন জমিদার-বাড়ী থেকে চিরকালের জন্য বিদায় নিল…। এতদিন মাক্সিম কিয়েভ থেকে চিঠি লিখতেন, অবশেষে যখন তিনি ফিরে এলেন তখন আন্না মিখাইলভনা তাঁকে দেখেই এই বলে সম্বর্ধনা করল: 'এর জন্য কখনো তোমাকে ক্ষমা করব না, কখনো না!' কিন্তু কথাগুলো কঠোর হলেও আন্তরিক নয়, সেটা ওর দৃষ্টিতেই বোঝা গেল।

হেমন্তের দীর্ঘ সব সন্ধ্যায় পিওতর ওর ভ্রমণের গল্প করত। আর যখন প্রদোষে পিয়ানো বাজাতে বসত তখন নতুন নানা সুরে বাড়ী ভরে যেত, এ ধরনের সুর আগে কখনো বাজায়নি সে।

কিয়েভে যাত্রা পরের বছর পর্যন্ত স্থগিত হল। পিওতরের নানা জল্পনা-কল্পনায়, ভবিষ্যতের নানা আশায় বাড়ীর সবাই মগ্ন রইল...।

# সপ্তম অধ্যায়

১

সেই হেমন্তেই এভেলিনা বাপ-মাকে জানাল যে 'জমিদার-বাড়ী'র অন্ধ যুবককে বিয়ে করবে, সে সিদ্ধান্তের কোন নড়চড় হবে না। মা কাঁদতে শুরু করল; কিন্তু বাবা আইকনের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করল, তারপর ঘোষণা করল যে এটাই, তার মতে, ঈশ্বরের অভিপ্রায়।

বিয়ে হয়ে গেল ওদের, নতুন শান্ত আনন্দে পিওতরের জীবন ভরে গেল। তবু সমস্ত আনন্দের পিছনে কোথায় যেন গুঁড়ি মেরে হানা দিত অস্পষ্ট উৎকণ্ঠা, কখনো সেটা সম্পূর্ণভাবে তাকে ছেড়ে যেত না। এমন কি ওর সবচেয়ে উজ্জ্বল মুহূর্তগুলিতেও ওর হাসিতে লেগে থাকত অবিশ্বাসী বিষণ্ণতার আভাস—যেন ও অনুভব করতে পারছে না ওর সুখের যথার্থ কোন কারণ আছে

কিনা, সত্যি টি ঁকবে কিনা সে সুখ। যখন শুনল যে হয়ত এভেলিনার ছেলে হবে তখন মুখে এল হঠাৎ উৎকণ্ঠার ভাব।

তবুও যেভাবে সময় কাটত আজকাল তাতে আগেকার নিষ্ফল অন্বেষার অবসর আর ওর থাকত না। গভীর পড়াশুনোয়, আর স্ত্রী আর ভাবী সন্তানের জন্য উৎকণ্ঠায় দিন কাটত। আবার কোন কোন মুহূর্তে অন্ধ ভিখিরীদের বিষণ্ন গানের জাগ্রত স্মৃতিতে আর সবকিছু চাপা পড়ে যেত। তখন ও চলে যেত গ্রামের ধারে, সেখানে ফিওদর কানদীবা আর ওর দাগ-দুষ্ট ভাইপোর জন্য নতুন একটা বাড়ী করে দেওয়া হয়েছিল। কানদীবা কব্‌জা বাজাত; কিম্বা হয়ত এটা-ওটা নিয়ে ওরা গল্প করত; আর আস্তে আস্তে পিওতরের মন শান্ত হয়ে আসত, ওর নানা পরিকল্পনা আবার ফিরে পেত ওকে অনুপ্রাণিত করার শক্তি।

আলোর বিষয়ে ওর সংবেদন কমে গিয়েছে, আলো বোঝবার যে আগ্রহ আগে তাকে এত ভুগিয়েছিল সেটা এখন ঢিমে। যে সব শারীরিক শক্তি তাকে এককালে আলোড়িত করত, সুপ্ত এখন তারা, নানা বিচ্ছিন্ন অনুভূতিকে বুদ্ধিগ্রাহ্য অখণ্ডতায় মেলাবার সচেতন প্রয়াসে

সে সব শারীরিক শক্তিকে আর জাগিয়ে তুলত না সে। এইসব নিষ্ফল উদ্যমের জায়গায় এসেছে উজ্জ্বল নানা স্মৃতি, চঞ্চল আশা। তবু কে জানে হয়ত তার অন্তরের শান্তিই তার সত্তার অচেতন নানা প্রক্রিয়াকে বাড়িয়েছে, সাহায্য করেছে মেলাতে সেই সব নিরাকার বিক্ষিপ্ত অনুভূতিগুলিকে যেগুলো তার ইন্দ্রিয় কেন্দ্রে পেঁৗছত সংশ্লেষণের সন্ধানে। আমরা যখন ঘুমোই তখন আমাদের মন প্রায়ই এমন ভাব আর প্রত্যয় সহজে গড়ে তোলে যেগুলো সচেতন প্রয়াসের ফলে কখনো রূপ নেয় না।

২

ঘরটি খুব স্তব্ধ, এই ঘরেই পিওতর জন্মেছিল। একটি শিশুর কান্না শুধু স্তব্ধতা ভাঙছে। কয়েকদিনের মাত্র শিশুটি, আর এভেলিনা তাড়াতাড়ি সেরে উঠছে। কিন্তু মনে হত এ কটি দিনই আসন্ন বিষাদের কোন পূর্ব সূচনায় পিওতরের মন ভারাক্রান্ত।

ডাক্তার এলেন। শিশুটিকে তুলে জানলার খুব কাছে শোয়ালেন। পরদাটা এক ঝটকায় সরিয়ে দেওয়াতে ঘরে এল এক চিলতে উজ্জ্বল আলো। হাতে চোখ দেখবার

যন্ত্র, ঝুঁকে পড়ে ডাক্তার শিশুটিকে দেখলেন। মাথা নিচু করে বসে আছে পিওতর, আগেকার মতই সমান বিষণ্ন আর উদাসীন দেখাচ্ছে ওকে। ডাক্তার কী করছে তার কাছে সব যেন অর্থহীন—যেন আগে থেকেই জানে ফল কী হবে।

'ও নিশ্চয়ই অন্ধ', বারবার বলল পিওতর। 'ও না জন্মালেই ভালো হত।'

নবীন ডাক্তার জবাব না দিয়ে পরীক্ষা করে চললেন। অবশেষে যন্ত্রটি নামিয়ে রেখে বললেন, 'চোখের মণি নড়ছে। বাচ্ছাটা দেখতে পায়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।' ডাক্তারের শান্তপ্রত্যয়ের সুরে ঘর গমগম করে উঠল।

চমকে পিওতর উঠে দাঁড়াল। ডাক্তারের ঘোষণা শুনেছে নিশ্চয়ই। কিন্তু ওর মুখ দেখে মনে হল প্রায় কিছুই বোঝেনি। নিথর দাঁড়িয়ে আছে, জানলার পাটে একটি কম্পিত হাতে ভর দিয়ে, ঊর্ধ্বমুখ, বিবর্ণ, কেমন যেন টান ভাব।

অসাধারণ একটি উত্তেজনার ঘোরে সে এতক্ষণ ছিল—নিজের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রায় অচেতন, কিন্তু শরীরের প্রতি রক্তকণা ছিল প্রত্যাশায় চঞ্চল কম্পমান।

তার চারিদিকে অন্ধকার, সে বিষয়ে সে সচেতন। আলাদা করে সেটাকে বোধ করছে ও, বোধ করছে তাকে ঘিরে অন্ধকারের উপস্থিতি, তার অসীম বিস্তার। তাকে চাপ দিচ্ছে সে অন্ধকার, আর ওর কল্পনাশক্তি চেষ্টা করছে সেটাকে আয়ত্তে আনতে, সেটার সঙ্গে যুঝতে। তমসার পথ রোধ করে সে দাঁড়িয়ে, যেন এই অভেদ্য অন্ধকারের উত্তাল সমুদ্র থেকে নিজের সন্তানকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে।

ডাক্তার যখন নিঃশব্দে তৈরী হচ্ছিলেন তখন ওর মনের অবস্থা এ রকম। গত কয়েক মাস সে অস্বস্তি বোধ করে এসেছে অবশ্য—কিন্তু আজকের মুহূর্ত পর্যন্ত আশার ক্ষীণ টুকরো সর্বদাই বেঁচে ছিল। এখন সব স্নায়ু জ্যাবদ্ধ, বিপর্যয়ের সন্ধিক্ষণে উদগ্র আর্ত ভয়ে আচ্ছন্ন; আশা মিলিয়ে যাচ্ছে, পিছিয়ে যাচ্ছে অন্তরের গভীরতম স্থানে। আর তারপর হঠাৎ কয়েকটি কথা, 'বাচ্ছাটা দেখতে পায়!'—আর তার মেজাজ বদলে গেল; ভয় পরাজিত, আশা জীবন্ত। যেন ক্ষিপ্র আলো ভেঙে পড়ল ওর একাগ্র প্রত্যাশায়, যে প্রত্যাশায় সমস্ত সত্তা এতক্ষণ আচ্ছন্ন ছিল। আমূল ওলটপালট একটা, দারুণ পরিবর্তন

একটা, ওর ছায়াচ্ছন্ন অন্তরে হানা দিল, চোখ-ঝলসানো বিদ্যুৎ অন্ধকার রাত্রে যেমন চমকায়। ঠিক তেমন করে কথাগুলো, ডাক্তারের সংক্ষিপ্ত কথাগুলো যেন তার মাথায় পুড়ে জ্বলন্ত পথ করে নিল। ভিতরে গভীরে কোথাও আলোর টুকরো ঝলসালো আর সত্তার গভীরতম নিভৃত লোক পর্যন্ত আলোয় আলো হয়ে উঠল। পিওতরের অন্তরে সব কিছু কাঁপতে লাগল। সমস্ত শরীর কাঁপছে, টান-টান তারে হঠাৎ আঘাত করলে যেমন কাঁপে।

আর তারপর, এই বিদ্যুৎচমকের পর—হঠাৎ নানা অদ্ভুত ছবি এল চোখের সামনে, যে চোখ জন্মের আগে থেকেই দৃষ্টিহীন। এটা কী আলো, না শব্দ? জানে না পিওতর। শব্দ এটা, প্রাণবন্ত, এ শব্দের আকার আছে, প্রভায় বইছে এটি, আলোর মত। আকাশের উঁচু মণ্ডলের মত দীপ্ত এই শব্দ; সূর্যের জ্বলন্ত গোলকের মত মহিমায় গড়িয়ে যাচ্ছে সেটা; সবুজ স্তেপভূমির গুঞ্জনের মত কুলকুল আর তরঙ্গিত এই শব্দ; বাগানের স্বপ্নালস বীচের শাখার মত দুলছে।

প্রথম মুহূর্তের অভিজ্ঞতা এটি; আর এই মুহূর্তের নানা বিশৃঙ্খল অনুভূতিই শুধু তার মনে ছিল। পরে যা হল সব ভুলে যায় পিওতর। কিন্তু পরে ও বলত,

জোর দিয়ে বলত যে প্রথম মুহূর্তের পরের নিমেষ কটিতে ও দেখতে পেয়েছিল।

কী দেখেছিল, কী করে, সত্যিই দেখেছিল কিনা, সেটা বলা যায় না। অসম্ভব এটা, অনেকে মত দিল। কিন্তু পিওতর জোর দিয়ে বলত যে ও দেখেছিল, দেখেছিল আকাশ আর পৃথিবী, মা'কে, স্ত্রীকে আর মাক্সিমকে।

কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল পিওতর, অত্যন্ত স্তব্ধ, ওর মুখ উঁচু, উজ্জ্বল। ওর মুখের ভাব এত অদ্ভুত যে সবাই ফিরে ওর দিকে তাকাল, সবাই চুপ করে গেল। ওকে দেখে সবায়ের মনে হল যে জানলার কাছে যে দাঁড়িয়ে আছে সে পিওতর নয়, যে পিওতরকে তারা এত ভালোভাবে চেনে, সে পিওতর নয়। অন্য কেউ, অচেনা আগন্তুক কেউ। ওদের পরিচিত পিওতর অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। রহস্যের জাল সহসা নেমে এসে ওকে আড়াল করেছে।

আর তার আড়ালে কয়েক মুহূর্তের জন্য পিওতর একলা — যে রহস্য হঠাৎ ঘিরেছে তাকে, একলা মুখোমুখি তার। পরে, অভাব একটা ঘুচেছে শুধু সেটির

অনুভূতি রয়ে গিয়েছিল, আর রয়ে গিয়েছিল তার অদ্ভুত বিশ্বাস যে এই সব মুহূর্তগুলিতে সে দেখতে পেয়েছিল।

সেটা সত্যি কি সম্ভব?

এটা কি সম্ভব যে তার নানা অস্পষ্ট, আবছা আলোর বোধ বা অনুভূতি, দিনের উজ্জ্বল আলোয় পেঁৗছবার এককালীন কম্পিত টান-টান আবেগ তার, কোন অজানা পথ ধরে তার মনের অন্ধকার গভীর নিভৃত লোকে পেঁৗছয়, আর এই সব অস্পষ্ট অনুভূতি এখন, আবেশের মুহূর্তে তার, যেমন করে হোক তার মনের সামনে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতায় জাগ্রত হল?

আর তার অন্ধ চোখ দেখল নীল মহাশূন্য, আর উজ্জ্বল সূর্য, আর স্বচ্ছ নদী, আর তার পাশে টিলা, যেখানে শৈশবে কত ভুগেছে, কতবার কেঁদেছে সে। আর তারপর পুরানো মিল আর নক্ষত্রখচিত রাত্রি, কত যন্ত্রণা পেয়েছে সেই সব রাত্রে, আর স্তব্ধ বিষণ্ন চাঁদ। হ্যাঁ, আর ধূলোভরা মেঠো রাস্তা, সদর সড়কের সোজা রেখা; গাড়ীর দঙ্গল, তাদের লোহার চাকায় পড়েছে

সূর্যের আলো ; আর রঙীন জনতার ভিড়, তাদের মধ্যে ও অন্ধ ভিখিরীদের গান গেয়েছিল।

কিম্বা হয়ত তার মাথায় এসেছিল অদ্ভুত উদ্দাম নানা স্বপ্ন—কেউ কখনো দেখেনি এমন সব পাহাড়ের ছবি, আর অদ্ভুত সমতল ভূমি, আর অবাস্তব নদীর পারে দোদুল্যমান আশ্চর্য সব গাছ, দুলছে তারা কম্পিত কোন সূর্যের প্রখর আলোয়, যে সূর্যকে অগণন পূর্বপুরুষেরা ওর হয়ে দেখেছিল?

কিম্বা হয়ত অন্ধকার মনের গভীরে সেগুলি দানা-না-বাঁধা অনুভূতি মাত্র, যে গভীরের কথা মাক্সিম বলেছিলেন, যে গভীরে আলো আর ধ্বনি সুখ কিম্বা দুঃখের, আনন্দের কিম্বা যন্ত্রণার সমতুল্য প্রতিক্রিয়া জাগায়?

আর পরে ওর যা মনে ছিল, সেটা কি ওর অন্তরে ক্ষণিকের জন্য ধ্বনিত সেই সঙ্গীত মাত্র—উচচকিত ঐকতান, যাতে একসূত্রে বাঁধা পড়েছিল ওর জীবনের সমস্ত অনুভূতি, প্রকৃতির প্রতি ওর আসক্তি, ওর উষ্ণ ভালোবাসা।

কে বলতে পারে?

শুধু রহস্যটির আবির্ভাব আর তিরোভাবের কথা ওর মনে ছিল—সেই চরম মুহূর্ত, যখন শব্দ আর আকার সংঘাতে, কম্পনে, শিহরণে, অস্পষ্টতায় মিশে এক হয়ে গেল, টান-টান তার যেমন কেঁপে উঠে স্তব্ধ হয়ে যায়; প্রথমে উচচকিত, মুখর, তারপর মৃদু থেকে মৃদুতর, প্রায় শোনা যায় না; অন্তহীন ঢালু বেয়ে কিছু যেন নামছে, অতল অন্ধকারে গড়িয়ে যাচ্ছে।

ঢালু বেয়ে নামল সেটা, শোনা গেল না।

অন্ধকার, আর স্তব্ধতা। সে অন্ধকারে তখনো ভাসা-ভাসা কল্পমূর্তি দানা বাঁধার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাদের আকার নেই, শব্দ নেই, বর্ণ নেই। শুধু—অনেক, অনেক নিচে কোথাও, একটি সুরের পর্দার পরিষ্কার প্রকম্পন অন্ধকার চিরে গেল। তারপর সে শব্দও শূন্যতায় বিলীন।

আর তখনি অভ্যস্ত শব্দের মাধ্যমে ঘরের জীবন হঠাৎ তার কানে এল। মনে হল ঘুম থেকে উঠছে ও। কিন্তু তবুও দাঁড়িয়ে রইল ওখানে, আনন্দে দীপ্ত, মায়ের আর মাক্সিমের হাতে চাপ দিচ্ছে।

'তোমার কী হয়েছিল?' উৎকণ্ঠিতভাবে মা জিজ্ঞেস করল।

'কিছু না। শুধু... আমার মনে হচ্ছে... দেখেছিলাম, তোমাদের সবাইকে। আমি... আমি... স্বপ্ন দেখছি না ত?'

'আর এখন?' রুদ্ধশ্বাসে মা জিজ্ঞেস করল। 'আর এখন? মনে পড়ছে কিছু? মনে পড়বে?'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল পিওতর।

'না', চেষ্টা করে বলল। 'না। কিন্তু কিছু এসে যায় না তাতে। কারণ... কারণ ও সবকিছু এখন ওকে দিয়েছি, বাচ্চাটাকে। আর... আর সবাইকে।'

পা টলে উঠল, জ্ঞান হারাল পিওতর। মুখ অতিশয় বিবর্ণ, কিন্তু নিদারুণ কোন অভাব মুক্তির আনন্দে তখনো উদ্ভাসিত।

# উপসংহার

তিন বছর কেটে গেল।

কিয়েভ মেলায় অনেক লোক জমেছে, নতুন আশ্চর্য একটি সুরকার বাজাবে সে দিন। অন্ধ সে, কিন্তু তার সঙ্গীত প্রতিভা আর জীবন নিয়ে অদ্ভুত নানা গল্প প্রচলিত। লোকে বলে সম্ভ্রান্ত বংশে ওর জন্ম, কিন্তু অন্ধ ভিখিরীর দল শৈশবে ওকে চুরি করে নিয়ে যায়, তাদের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ও ঘুরে বেড়ায়, শেষে একদিন একটি বিখ্যাত অধ্যাপক হঠাৎ ওকে দেখে ফেলে ওর আশ্চর্য প্রতিভা আবিষ্কার করেন। অন্য লোকে বলে যে ও নিজেই ঘর ছেড়ে রোমান্টিক কোন কারণে ভিখিরীদের সঙ্গে জুটেছিল। যাই হোক না কেন, প্রেক্ষাগৃহে সেদিন তিল ধারণের জায়গা নেই, আর আদায়-পত্র পূরোপূরি হয়ে গিয়েছে (টাকাটা জনহিতৈষণায় খরচা হবে, ঠিক কী উদ্দেশ্যে সেটা শ্রোতৃমণ্ডলীর জানা নেই)।

মঞ্চের উপরে একটি যুবক আসাতে রঙ্গালয় স্তব্ধ হয়ে গেল। ওর মুখ পাণ্ডুর, চোখ কালো আর সুন্দর। চোখদুটো যদি অনড় না হত, আর একটি সোনালী-চুল মহিলা —ওর স্ত্রী বলল অনেকে—ওর হাত ধরে যদি না নিয়ে আসত তাহলে বিশ্বাস করা শক্ত হত যে ও দৃষ্টিহীন।

অবিশ্বাসী সমালোচক একজন প্রেক্ষাগৃহে ফিসফিস করে বলল, 'মনে এমন গভীর দাগ ও কাটে কেন বুঝতে পারছি। ওর চেহারাটাই ত নাটকীয়!'

সত্যিই সেটা। সুরকারের পাণ্ডুর মুখ, ধ্যানমগ্ন একাগ্রতার ভাব, অনড় চোখ, ওর সমস্ত চেহারাই অসাধারণ, অসামান্য কিছুর প্রত্যাশা জাগায়।

আমাদের এই দক্ষিণ এলাকার লোকেরা সবাই দেশজ সুর ভালোবাসে আর এমন কি এই পাঁচমিশেলী মেলার শ্রোতৃমণ্ডলীও প্রথম থেকেই সুরকারের অকপট বাজনায় অভিভূত হল। কোন বাঁধা গৎ সে বাজাল না, ওর মনে আর প্রাণে যা আসছে শুধু তাই বাজাল। আর ওর তখনকার-মত রচনা সব জীবন্ত হয়ে উঠল প্রকৃতির প্রতি আবেগপূর্ণ অনুরাগে, লোক সঙ্গীতের প্রত্যক্ষ যত উৎসের

সঙ্গে সূক্ষ্ম যোগসূত্রে। সুরেলা বর্ণাঢ্য সঙ্গীত প্রেক্ষাগৃহ ভরিয়ে দিল—কখনো স্তবের উদাত্ত, সান্দ্র ধ্বনিতে উঠছে, কখনো ক্ষীণ হয়ে আসছে কোমল, ভাবুক বিষণ্ণতায়। মাঝে মাঝে বাজছে বজ্রনির্ঘোষ, গুরুগুরু শব্দে আকাশ পেরিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে মহাশূন্যে; কখনো বা কোমল স্তেপ—কবরের প্রাচীন ঢিবির উপরে ঘাস দুলছে, মনে আনছে বহু দূর অতীতের ঝাপসা স্বপ্ন।

শেষ ধ্বনিটি মিলিয়ে যেতে উন্মত্ত করতালিতে বিরাট প্রেক্ষাগৃহ ফেটে পড়ল। মাথা নিচু করে বসে রইল অন্ধ সুরকার, অবাক হয়ে অট্টরোল শুনছে। কিন্তু আবার হাত তুলল, পিয়ানোর চাবিতে হাতদুটো নেমে আসাতে প্রেক্ষাগৃহ নিস্তব্ধ হয়ে গেল এক নিমেষে।

ঠিক এই সময়ে মাক্সিম এলেন। শ্রোতাদের মুখ দেখলেন সাগ্রহে! অগণন মুখে একই ভাব, আবেগে, একাগ্র আগ্রহে সবায়ের দৃষ্টি অন্ধ সুরকারের উপরে নিবদ্ধ।

বসে বসে শুনছেন মাক্সিম, শুনছেন প্রত্যাশায়। এই সঙ্গীতের পিছনে যে ইতিহাস সেটি তার মত প্রেক্ষাগৃহের আর কেউ জানে না।

তাঁর ভয়, উপস্থিত-মত রচিত যে সঙ্গীত এত স্বচ্ছন্দে, অনিবার্য শক্তিতে, সুরকারের অন্তরের গভীর থেকে উৎসারিত হচ্ছে, যে কোন মুহূর্তে সেটি হঠাৎ ভেঙ্গে আসতে পারে ব্যথা আর যন্ত্রণায় ভরা জিজ্ঞাসার সুর, বাদকের অন্তরের নতুন কোন ব্যথার ছাপ থাকবে তাতে, আগে অনেক বার ত এরকম হয়েছে। কিন্তু বেজেই চলল, ক্রমশ উঠছে, বাড়ছে আর শক্তি সঞ্চয় করছে সে সঙ্গীত, একীভূত আচ্ছন্ন শ্রোতাদের হর্তাকর্তাবিধাতা সে সঙ্গীত।

মাক্সিম শুনছেন, আর ক্রমশ স্পষ্টভাবে খুব-চেনা একটি কিছু তিনি আলাদা করে ধরতে পারলেন।

হ্যাঁ, তাই। রাস্তার সোরগোল। বিরাট একটি ঢেউ গড়িয়ে আসছে—উজ্জ্বল, বজ্র গম্ভীর, জীবন্ত একটা ঢেউ গড়িয়ে আসছে, হাজার হাজার টুকরো টুকরো ঝিকিমিকি শব্দে সেটা ভেঙ্গে পড়ছে; কখনো জোরালো হয়ে উঠছে, আবার ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে দূর, বিরামহীন গুনগুনে—শান্ত, আবেগহীন, নিরাসক্ত, উদাসীন।

আর হঠাৎ মাক্সিমের বুক ভারী হয়ে এল। আবার, আগেকার মত, সঙ্গীতে এসেছে অনুচ্চ কাতর ধ্বনি।

হঠাৎ এল সে কাতর ধ্বনি, ভরাল সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ, আবার গেল মিলিয়ে। আবার এল জীবনের মুখর কোলাহল, ক্রমশ স্পষ্ট, উজ্জ্বল, জোরালো — সচল, স্ফুলিঙ্গময়, আনন্দিত, আলোক পূর্ণ।

না, এটা ব্যক্তিগত স্বার্থপর দুঃখ, অন্ধ যন্ত্রণা আর বেদনার পুরানো সেই কাতর ধ্বনি নয়। মাক্সিমের চোখে জল এল। আর আশেপাশের সবায়ের চোখেও জল, তিনি দেখলেন।

'ও দেখতে শিখেছে, সত্যি কথা সেটা, ও দেখতে শিখেছে', ফিসফিস করে মাক্সিম নিজেকে বললেন।

জীবন্ত, চঞ্চল, আনন্দে-ভরা, আর স্বচ্ছন্দ, স্তেপের হাওয়ার মত মুক্ত নানা সুরে, জীবনের উচচকিত, বহুমুখী আলোড়নের শব্দে, আকাঙ্খাপূর্ণ আর গম্ভীর নানা লোকসঙ্গীতে বার বার, ক্রমশ বর্ধমান বিস্তারে আর শক্তিতে ফিরে আসছে মর্মান্তিক একটি সুর।

নিঃশব্দে মাক্সিম সায় দিলেন, 'ঠিক, ঠিক। আনন্দ আর উৎসবের সময় এটাকে পেরিয়ে যেও।'

আর একটি মুহূর্ত, তারপর অন্ধ ভিখিরীদের গান শুধু — বিরাট প্রেক্ষাগৃহে মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতাদের মনে তার অমোঘ একাগ্র প্রভাব।

'অন্ধকে দয়া কর, যীশুর নামে ভিক্ষা দাও!'

কিন্তু শুধু ভিক্ষাপ্রার্থনা এটা নয়, রাস্তার হট্টগোলে চাপা-পড়া করুণ আর্তনাদ নয়। বিগত দিনে এর তিক্ত যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে পিওতর পিয়ানো থেকে দূরে থাকত, শব্দটি মনে পড়লে মুখ বিকৃত হয়ে যেত, সে সব দিনের সমস্ত কিছু এতে নিহিত। এখন অন্তরের সেই যন্ত্রণাকে সে জয় করেছে, আর এর সত্যের গভীর মর্মান্তিক শক্তিতে সমস্ত শ্রোতাদের হৃদয় জয় করেছে সে। উজ্জ্বল দিনের পটভূমিকায় ঘোর অন্ধকার রাত্রির মতো এই আর্তনাদ, আনন্দের চরম মুহূর্তে দুঃখের কথা মনে করিয়ে দেয়।

প্রেক্ষাগৃহের শ্রোতাদের উপরে বাজ ফেটে পড়েছে যেন। প্রত্যেকের বুক কাঁপছে, যেন সুরকারের ক্ষিপ্র আঙুল তাদের হৃদয়ের তারে টান দিচ্ছে। সঙ্গীত থেমে গেল, কিন্তু শ্রোতারা বসে রইল অনড়ভাবে। মৃত্যুর মত স্তব্ধতায় প্রেক্ষাগৃহ ভরে গেল।

মাথা নিচু করে মাক্সিম মনে মনে বললেন:

'সত্যিই দেখতে শিখেছে ও। আগেকার সেই যন্ত্রণা, সেই অন্ধ স্বার্থপর অনারোগ্য যন্ত্রণার জায়গায় ওর অন্তরে

এসেছে সত্যিকারের জীবন উপলব্ধি। অন্য লোকের সুখদুঃখ জানতে পেরেছে ও। দেখতে শিখেছে ও, আর এখন, যাদের ভাগ্য ভালো তাদের মনে করিয়ে দিতে পারবে দুর্ভাগাদের কথা ...।'

বৃদ্ধ সৈনিকের মাথা আরো আনত হল। তাহলে তিনিও পৃথিবীতে তাঁর কাজ করেছেন। বিফলে যায়নি তাঁর জীবন। এই বার্তা তাঁকে দিল আজকের সঙ্গীত— এই বলিষ্ঠ চিত্তজয়ী সঙ্গীত, প্রেক্ষাগৃহ ভরে গিয়েছে সেই সঙ্গীতে, শ্রোতাদের মন বিজিত।

আসরে অন্ধ সুরকারের প্রথম আবির্ভাব এইভাবে হল।

১৮৮৬—১৮৯৮

